শিক্ষা সংস্কৃতি রাজনীতি

ড. আব্দুস সাত্তার

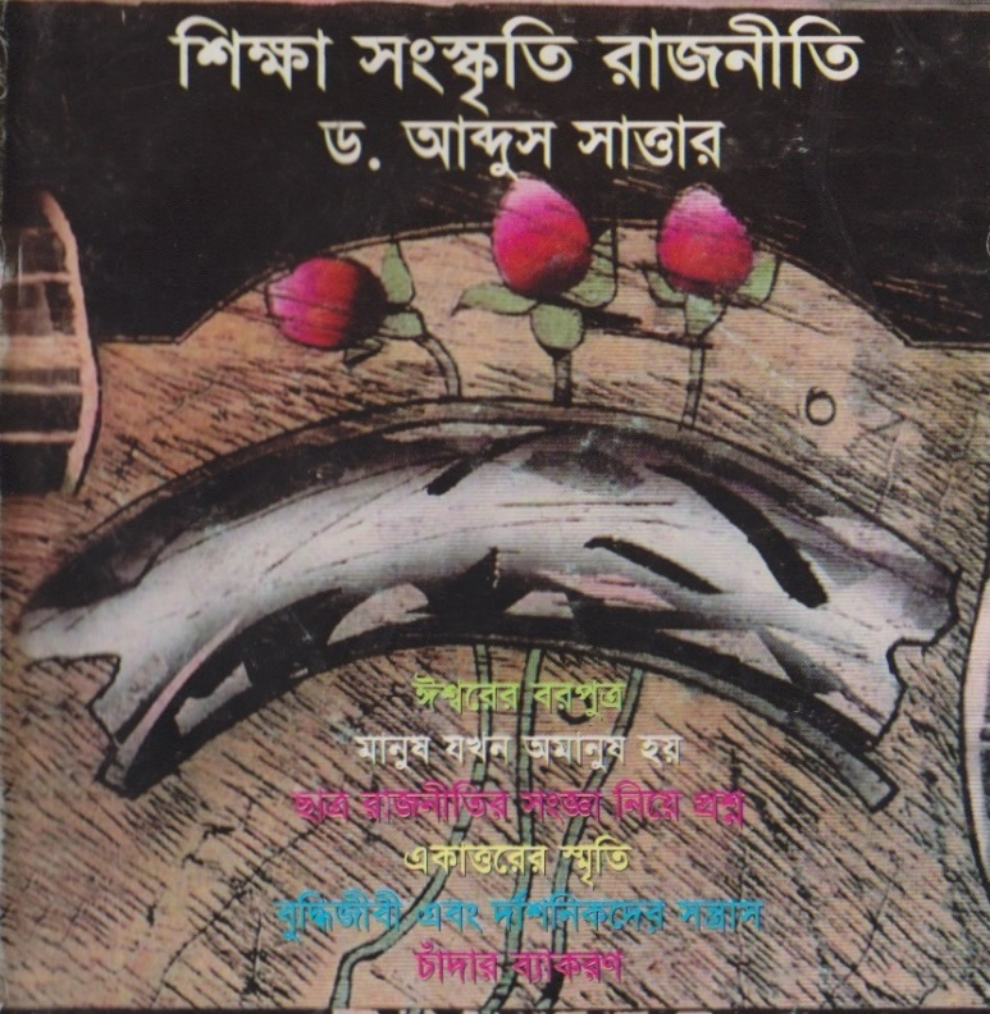

ঈশ্বরের বরপুত্র

মানুষ যখন অমানুষ হয়

ছাত্র রাজনীতির সংজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন

একাত্তরের স্মৃতি

বুদ্ধিজীবী এবং দার্শনিকদের সন্ত্রাস

চাঁদার ব্যাকরণ

শিক্ষা সংস্কৃতি রাজনীতি

ড. আব্দুস সাত্তার
প্রাবন্ধিক, শিল্পকলা বিশ্লেষক,
গবেষক, কলাম লেখক এবং
প্রফেসর, চারুকলা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কন্টেম্পোরারী কনসেপ্ট

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১. মানুষ যখন অমানুষ হয় ১
২. ঈশ্বরের বরপুত্র ৪
৩. সৎ ও অসৎ মানুষের কড়চা ৭
৪. বৈধ ও অবৈধের স্বরূপ ১১
৫. প্রধানমন্ত্রীর উপযুক্ত শিক্ষা ১৪
৬. প্রসঙ্গ একুশে ও স্বাধীনতা পদক ১৮
৭. ধ্বংসের রাজনীতি এবং কপট বুদ্ধিজীবী ২০
৮. ধনোৎপাদন এবং নারীর বহির্মুখীনতা ২৫
৯. চাঁদার ব্যাকরণ ২৯
১০. বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাই নকলবাজ ছাত্র তৈরীর জন্য দায়ী ৩৪
১১. ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি শিক্ষার অন্তরায় ৪০
১২. ছাত্র রাজনীতির সংজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন ৪৪
১৩. শিক্ষক রাজনীতির কুফল ৪৮
১৪. বাংলাদেশের রাজনীতি ও শিক্ষা ৫২
১৫. শিক্ষক আছেন, গুরু নেই ৫৬
১৬. বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস জাতীয় সমস্যা,
উপাচার্যের পদত্যাগ এর সমাধান নয়। ৬০
১৭. দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবীদের সন্ত্রাস ৬৪
১৮. বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস এবং একজন পত্র লেখক ৬৮
১৯. সূর্যাস্ত আইনের পোস্টমোর্টেম ৭৪
২০. গণতন্ত্র এবং সংবাদপত্রের সম্পর্ক ৮১
২১. সমঝোতার পথই শ্রেয় ৮৪
২২. একাত্তর স্মরণে ৮৮
২৩. রাজনীতি ও সন্ত্রাসবাদ ৯২
২৪. কোরবানীর গোস্তঃ সামাজিক ও রাজনৈতিক উপাখ্যান ৯৮
২৫. বরফ গলছেনা তাই ১০২

www.pathagar.com

২৬. প্রধানমন্ত্রীকে সতর্ক থাকতে হবে ১০৬
২৭. সব দল কিছু মৌলিক বিষয়ে
সিদ্ধান্ত নিতে পারে ১১১
২৮. স্বৈরতন্ত্র নয় গণতন্ত্রেই মুক্তি ১১৫
২৯. নেতা-নেত্রী দলকেই ভালবাসেন
দেশকে নয় ১২১
৩০. পুলিশ ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা ১২৫
৩১. রক্তপিপাসু কাক ১২৯
৩২. সুমহান আত্মোৎসর্গ ১৩২
৩৩. জাতির দুর্দিনে বাঁশি-লাঠির উত্থানঃ
অন্ধকারে আশার আলো ১৩৫
৩৪. তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন পরিচালনার জন্য নয়,
দেশ পরিচালনার জন্য হোক ১৪০
৩৫. এই শয়তানদের বিচার হবে কি? ১৪৫
৩৬. শুদ্ধ-সচেতন পাঠক এবং
বাংলাবাজার পত্রিকা ১৪৯
৩৭. গণতন্ত্রের নামাবলি গায়ে ১৫৩
৩৮. যানজটের যন্ত্রণা ১৫৭
৩৯. লেখকের আত্মগ্লানি ১৬০
৪০. বাংলাদেশের রাজনীতি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার
এবং একজন অধ্যাপকের অভিমত ১৬৩

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পূর্বাভাষ

বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনা পেরিয়ে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সৃষ্ট মহা বিদ্যালয়ের যে স্বপ্নাবিষ্ট আঙ্গিনায় আমি প্রবেশ করি সেই আঙ্গিনায় পঠনপাঠনের প্রায় পুরোটাই সম্পন্ন করতে হয়েছে রঙ-তুলির মাধ্যমে। রঙ-তুলির নান্দনিক শিক্ষার পাশাপাশি সামান্য যেটুকু পড়া লেখা করতে হয়েছে তাও রঙ-তুলির মাধ্যমে সৃষ্ট শিল্পকলা সম্পর্কিত। ফলে শিল্পকলার নান্দনিক জগতেই আমার বসবাস। কিন্তু এই বসবাসের ক্ষেত্রটি নান্দনিক রসে রসসিক্ত ছিলনা কখনই। ছিলনা শান্ত, স্নিগ্ধ কিংবা নির্বিঘ্ন। দেশের রাজনীতিবিদ, শিল্পী, সাহিত্যিক, এবং বুদ্ধিজীবী সমাজের ভদ্রবেশী মানুষদের আদর্শহীনতা, নৈতিকতা বিবর্জিত কর্মকাণ্ড, ভ্রষ্টাচার, মিথ্যাচার, বিভ্রান্তি সৃষ্টি, শিল্প-সংস্কৃতি-শিক্ষার ক্ষেত্র দখলের নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা, রাজনৈতিক দলের স্তাবকতাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণে একাগ্রচিত্তে শিল্পাঙ্গনে নিমগ্ন থাকা সম্ভব ছিলনা। এছাড়া মহান ভাষা আন্দোলনের পরম্পরাগত কর্মকাণ্ড, একাত্তরপূর্ব দুর্বার গণ-আন্দোলন, একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড, রাজনৈতিক হত্যা, সন্ত্রাসী গডফাদারদের উত্থান, চাঁদাবাজি, ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি, শিক্ষাঙ্গনের আবনতি এবং সন্ত্রাসসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিক্রিয়াজনীত কারণে অন্তর জগতে যে অন্তরদহন অনুভব করেছি তা প্রকাশ করবার প্রয়োজনে নিরন্তর পথ খুঁজেছি, কিন্তু আমার যে রঙ-তুলির শিক্ষা, সেই শিক্ষার সাহায্যে আমার অন্তরের অনুভূতিগুলোকে প্রকাশ করা সম্ভব ছিলনা বিধায় রঙ-তুলির পাশে কলমকেও স্থান দিতে হয়েছে। সাহায্য নিতে হয়েছে কলমের। রঙ-তুলির সাহায্যে যা প্রকাশ করা সম্ভব তা রঙ-তুলিতে, এবং রঙ-তুলিতে যা প্রকাশ করা সম্ভব নয় তা কলমের সাহায্যে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি।

বাংলাদেশের প্রগতিশীল সংবাদপত্র হিসেবে পরিচিত দৈনিক

www.pathagar.com

সংবাদ-এর চিঠিপত্র কলামের মাধ্যমে লেখক হিসেবে আমার যাত্রা শুরু। এর পর শিল্পের নন্দনতত্ত্ব ও শিল্পকলার সঙ্গে সম্পর্কিত বহু বিষয়ে প্রবন্ধ এবং রাজনৈতিক কলাম লিখেছি দেশের জনপ্রিয় দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকা, দৈনিক বাংলা, দৈনিক বাংলার বাণী, দৈনিক মানব জমিন, দৈনিক ভোরের কাগজ, দৈনিক দিনকাল, দৈনিক খবরসহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। এসকল পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ ও কলাম লিখবার কারণে পাঠকদের পক্ষ থেকে প্রশংসা ও প্রশংসাপত্র যেমন পেয়েছি তেমনি পেয়েছি মৃত্যুর হুমকিও। কিন্তু তার পরেও কলমের ব্যবহার অব্যাহত রেখেছি। আমার সীমিত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার আলোকে দেশের নির্ভীক ও নিরপেক্ষ দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলোর মধ্য থেকে প্রধানত রাজনৈতিক কলাম সমন্বয়ে এই গ্রন্থ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই গ্রন্থ প্রিয় পাঠকদের যদি সামান্যতমও চিন্তার খোরাক যোগাতে পারে, বিন্দুমাত্রও যদি উপকারে আসে তাহলে আমি আমার এ প্রচেষ্টাকে স্বার্থক মনে করবো।

যে সকল দৈনিক ও অন্যান্য পত্রপত্রিকা আমার প্রবন্ধ এবং কলাম প্রকাশ করেছে সেই সকল দৈনিক ও অন্যান্য পত্রপত্রিকার সম্মানীত সম্পাদক, প্রকাশক, এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ।

চারুকলা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
নভেম্বর - ২০০১

ড.আব্দুস সাত্তার

www.pathagar.com

উৎসর্গ

পরলোকগত

আহমদ ছফার উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

মানুষ যখন অমানুষ হয়

এক সময় ছিল যখন দেশে সুখ ছিল। মানুষের মনে মায়া মমতা ছিল। মানুষ একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। বয়োজ্যেষ্ঠদের মান্যগণ্য করবার ক্ষেত্রে ছোটদের মাঝে আদব লেহাজ ছিল। খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ ও কৃষকদের মনে আনন্দ-ফুর্তি ছিল। মাঠে ঘাটে কাজ করে দিন শেষে ঘরে ফিরবার সুন্দর আকাঙ্ক্ষা ছিল। প্রকৃতি ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী, জারি-সারিতে মুখরিত ছিল। নদী, নালা, খাল, বিল অফুরন্ত পানিতে টইটুম্বুর ছিল। স্রোতস্বিনী নদীবক্ষে ময়ূরপঙ্খী নৌকা ও বজরা ছিল। রুই, কাতলা, চিতল, বোয়াল, কৈ, মাগুরসহ হরেক রকম সুস্বাদু মাছ ছিল। বিল, ঝিল, পুকুর, দিঘী প্রভৃতি শাপলা ও পদ্ম ফুলের মদির গন্ধে ভরপুর ছিল। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারাসহ জানা অজানা অগণিত ফলবৃক্ষে পরিপূর্ণ ছিল। দোয়েল, কোয়েল, ডাহুক, ঘুঘু এবং এমনি শত স্বভাবের চোখ জুরানো মন ভুলানো বহু বর্ণিল পাখির কল কাকলিতে প্রকৃতি মুখরিত ছিল। হাতি, ঘোড়া, বাঘ, ভাল্লুক, শিয়াল, শকুন এমনি নানা জাতের জীবজন্তু ছিল। গেরস্থের ছিল গোলা ভরা ধান, ক্ষেত ভরা ফসল। ছিল ছোট বড় সকল মানুষের মন জুড়ে সুন্দর স্বপ্ন। অথচ কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল এখন আর তার হিসেব মেলানো যায় না। অতীতের সেই সুমধুর স্বপ্নের দিনগুলির কথা ভাবতে গেলে বুকের গভীরে লুকিয়ে থাকা একরাশ চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না।

বাংলার শেষ স্বাধীন নাবাব সিরাজ-উদ-দৌলার নির্মম পতনের পর ইংরেজরা এলো। তারা আবার চলেও গেল। ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান হলো। রাজা, জমিদারদের সমাজ ব্যবস্থা বিলুপ্ত হলো। তারও পরে হাজার হাজার মা-বোনের উজ্জত আর এক সাগর রক্তের বিনিময়ে একাত্তরে পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ হলো। পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে আমরা আবারও স্বাধীন হলাম। স্বাধীন হলাম অনাবিল প্রশান্তি আর একরাশ সুখের আশায়। শান্তির আশায়। কিন্তু ফিরে পাওয়া গেল না ফেলে আসা অতীতের সেই সুখ ও স্বপ্নের দিনগুলি। ফিরে পাওয়া গেল না মায়া মমতায় জড়ানো, প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ মানুষের সেই আবেগাপ্লুত অনুভূতিগুলো। ফিরে পাওয়া গেল না প্রকৃতির সেই উদার বিশালতাকে। এখন প্রকৃতিতে বৃক্ষ নেই , বন উজার। পশু পাখির কলকাকলি নেই, বিরাণ বনভূমি। নদ-নদী, খালে-বিলে পানি নেই, সমতল মরুভূমি। অথচ হৃদয় জোড়া আশা ছিল- শোষণহীন স্বাধীন বাংলার মাটিতে সোনা ফলবে। দেশ মাতার মুখের ভাষা 'বাংলা' সকল মানুষের সেতুবন্ধনরূপে ঐক্য গড়বে। উর্দু-বাংলার সংঘাতের মতো মানুষে মানুষে থাকবে

www.pathagar.com

না বিভেদ। থাকবে না সংঘাত। জাতি হিসেবে বাঙালি বিশ্ব দরবারে সসম্মানে প্রতিষ্ঠা পাবে। কিন্তু জাতি সে সম্মান পেল না। পেল না, কারণ মানুষ মানুষ রইল না। ভাগাড়ের মৃতদেহ শিয়াল শকুনে খুবলে খুবলে খাবার মতো এক শ্রেণীর অসৎ অর্থলিপ্সু মানুষ বৈদেশিক সাহায্য ও যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের সীমিত সম্পদ আত্মসাত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলো। সাধারণ মানুষ হলো বঞ্চিত। জাতির ললাট কলঙ্কিত হলো তলাবিহীন ঝুড়ির অপবাদে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের শত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। অপবাদ ঘুচলো না। বরং সপরিবারে বঙ্গবন্ধু নিধনের কারণে অকৃতজ্ঞ জাতি হিসেবে অতিরিক্ত অপবাদ যুক্ত হলো। রাজনৈতিক ও সামাজিক সংঘাত আর সন্ত্রাস বেড়েই চললো। এক সময় গোটা জাতি স্বৈরাচারের কবলে নিপতিত হলো। সন্ত্রাস, সংঘাত, খুন, রাহাজানি, ছিনতাই ও ধর্ষণের ঘটনায় দেশের চেহারা বদলে গেল। এর সাথে যুক্ত হলো লুণ্ঠনের নতুন কৌশল। শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠার উছিলায় নামে-বেনামে ব্যাংকের অর্থ লোপাটের প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হলো। রাঘব বোয়ালদের গর্দানের মাংস বৃদ্ধি পেল। দালাল, ফড়িয়া ও মধ্যস্বত্বভোগীদের কপাল ফিরলো। রাতারাতি অনেকে গাড়ি-বাড়ি ও আগাধ সম্পদের মলিক হলো। পক্ষান্তরে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ ও কৃষকশ্রেণী বঞ্চিতই রইল।

নব্বইয়ে জাতি স্বৈরাচার মুক্ত হলো। কিন্তু পূর্বের দুষ্টক্ষত রয়েই গেল। এবং সেই ক্ষত কোন কোন ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেল। অবৈধ উপায়ে আদম ব্যবসা, আদম পাচার বেগবান হলো। শেষ পর্যন্ত ভদ্রবেশী, উচ্চ শিক্ষিত, সমাজের ত্রাতারূপী লায়নদের দ্বারা বিদেশে আদম পাচারের মত অবিশ্বাস্য কেলেংকারির ঘটনাও ঘটলো। এবং এসবের মধ্য দিয়ে দেশের সার্বিক আইন শৃংখলার ক্ষেত্রে যে ধস নেমেছে, উপর মহলের কেতাদুরস্ত পোশাকে আবৃত সুন্দর ও ভদ্র চেহারার মানুষদের মধ্যে যে অনৈতিকতা এবং লোভ লালসা বাসা বেঁধেছে, ক্ষমতা, অর্থ, প্রতিপত্তি ও উচ্চাভিলাষ তাদেরকে যে অমানুষে পরিণত করেছে তাও অধিক মাত্রায় সুস্পষ্ট হলো। অস্পষ্ট রইলো না যে, প্রতিপক্ষের সন্ত্রাস মোকাবেলায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল সন্ত্রাসীদের লালন পালন জোরদার করেছে। দলে এবং দলীয় প্রধানদের আশীর্বাদে সন্ত্রাসীদের অনেকেই পশু শক্তিকেও হার মানিয়েছে। পরিণতিতে পুলিশ প্রশাসনের সদস্যদের দ্বারা শতাব্দীর জঘন্যতম ঘটনা ঘটেছে দিনাজপুরে। ইয়াসমীন নামের নিরীহ কিশোরীকে মানুষরূপী কয়েকজন উর্দি পরিহিত নরপশু ধর্ষণের পর হত্যা করেছে। ঢাকার রাজপথে হরতালের দিন সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নামধারী উন্মাদের দ্বারা বিবস্ত্র হয়েছেন বাবার বয়সী অফিসগামী মানুষ। ঘটনা এখানেই থেমে থাকেনি। যাকে বিবস্ত্র করা হয়েছে তিনি সরকারি চাকুরে না কি বেসরকারি এ বিষয়ে গবেষণায় লিপ্ত হয়েছেন নির্লজ্জ জ্ঞানীগুণীর দল। ভাবখানা এমন যেনো সরকারি না হয়ে থাকলে অফিসগামী ব্যক্তিটিকে বিবস্ত্র করা এমন কোন দোষের হয়নি। অনেকেই বিষয়টিকে আন্দোলনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে দেখেছেন। সরকারি কিংবা বেসরকারি চাকুরে হিসেবে দেখেছেন। যারা এভাবে দেখেছেন তারা বিবস্ত্র ব্যক্তিটিকে মানুষ হিসেবে দেখেননি। যেমন মনুষ হিসেবে দেখা হয়নি দিনাজপুরের কিশোরী ইয়াসমীনকেও। তাকে

www.pathagar.com

ধর্ষণ এবং হত্যা করবার পরও মানুষরূপী শয়তানের দল ক্ষান্ত হয়নি। তারা মৃত ইয়াসমীনকে পতিতা প্রমাণের লক্ষ্যে নাটকের মহরা পর্যন্ত দিয়েছে। প্রমাণ করতে চেয়েছে ইয়াসমীন পতিতা। সুতরাং পুলিশদের দ্বারা বলাৎকার এবং হত্যা করা তেমন দোষের কিছু হয়নি। পতিতারাও যে মানুষ, এই সমাজেরই সৃষ্ট মানুষ এবং তাদেরও যে মান-সম্মান আছে, তাদেরকে ইচ্ছে করলেই যে জনসমক্ষে এনে হেয় করা যায় না তা অপরাধীরা স্বীকার করতে চায়নি। তারা প্রমাণ করতে চেয়েছে পতিতা পুলিশের গাড়িতে উঠলে তাকে ধর্ষণ করা পুলিশের নৈতিক দায়িত্ব হয়ে পড়ে। কারণ তারাতো মানুষ নয়, পতিতা।

অপরাধ যারা করে এবং অপরাধীদের যারা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সহায়তা করে আইন এবং ধর্মীয় দৃষ্টিতে তারা সকলেই অপরাধী। সুতরাং যারা অন্যায় অপরাধকে দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন এবং সমর্থন করেন তারা প্রকারান্তরে অন্যায়কারীদের উৎসাহিত করেন এবং নিজেরাও নিজেদেরকে অন্যায় আবর্তে জড়িয়ে ফেলেন। যারা কাজটি করেন তারা পাল্টা প্রতিশোধ নিতে অন্যায়কারীদের অধিকমাত্রায় উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে মহিলা কমিশনার জলি কবিরদের মতো সম্মানিত নাগরিকদের লাঞ্ছিত হতে হয়। ইয়াসমীন হত্যার প্রতিবাদকারীদের জীবন দিতে হয়।

অন্যায় ও অন্যায় প্রবণতা পৃথিবীর সকল দেশেই রয়েছে। তবে অনেক দেশেই অন্যায় অপরাধের বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ আছে, যা বাংলাদেশে নেই। প্রয়োগ নেই, কারণ তা করতে হলে নিজ দলের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধেই করতে হয়। যা কোন দলই চায় না। আর চায় না বলেই আজ সমাজের সর্বস্তরে মানবতার চরম পরাজয় আর পশু শক্তির উত্থান। মানুষের অমানুষ হওয়া আর এই পশু শক্তিতে বলীয়ান হওয়ার বিষয়টিকে গ্রিক দার্শনিক এনাকসাগোরাস মরমে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই হয়তো মানুষকে জীবজন্তুর চেয়ে বেশি একটা মূল্য দিতে চাননি। তার মতে মানুষ আর জন্তু-জানোয়ারে (প্রাণীতে) বিরাট কোন পার্থক্য নেই। দু'টি হাত আছে বলেই মানুষ অন্য প্রাণী থেকে উন্নত। কিন্তু দার্শনিকের এই যুক্তি নির্ভুল নয়। কারণ দু'টি হাতের জন্যই মানুষ আজ নিকৃষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে। যে হাত ছিনতাই, লুণ্ঠন, হত্যা, আর সভ্যতাকে বিবস্ত্র করে সেই হাতের অধিকারী মানুষ পশুর চেয়ে কোনভাবেই উন্নত হতে পারে না। ২৬-৯-১৯৯৫।

www.pathagar.com

ঈশ্বরের বরপুত্র

শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং বুদ্ধিজীবী প্রত্যেকেই প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের বরপুত্র। কারণ তারা ঈশ্বরের অনুগৃহীত। কারণ তারা সকলেই সুন্দরের সাধক। তারা কল্যাণের উপাসক। তারা দেশের নিরহংকার, নির্লোভ, নিষ্কলুস, নির্দলীয় এবং সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঈর্ষণীয় সমাজের সম্মানীত সদস্য। তারা পবিত্রতা, সরলতা, উদারতা, স্বাতন্ত্র ও মুক্তচিন্তায় স্ব স্ব ক্ষেত্রে অনন্য সাধারণ। সকল ক্ষেত্রে সকল বিষয়ে স্বাধীন সত্তাই তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য যা তাদের জীবনীশক্তিও বটে। যাবতীয় বিষয়ে ঈশ্বরের এই বরপুত্রগণ নিজ নিজ বিচার বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক চিন্তা-চেতনা ও বিশ্লেষণে জাতিকে অগ্রগতির পথে, সুখ,সমৃদ্ধি ও শান্তির পথে পরিচালিত করেন। রাজনৈতিক সংঘাত, সন্ত্রাস, অসততা, জাতিগত ও ধর্মগত বিভেদ, বর্ণ বিভেদ, বিশৃঙ্খলা তথা জাতীয় যে কোন দুর্যোগময় মুহূর্তে স্বাধীনভাবে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলায় জাতিকে সঠিক পথ নির্দেশ করে থাকেন। সমস্যার সঠিক সমাধানে সহায়তা করেন। প্রয়োজনে অত্যন্ত কঠোর ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রেও সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকেন। সৃজনশীল চিন্তা-চেতনা, মুক্তবুদ্ধি, নির্দলীয়, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন চরিত্রই এদের প্রধান শক্তি। কারও রক্তচক্ষু কোন প্রকার লোভ-লালসা, কোন মহলের প্ররোচণা, এমন কি কোন দলীয় প্রলোভনই এই বরপুত্রদেরকে আদর্শচ্যুত করতে পারে না। তাদের স্বাধীনতা হরণ করতে পারে না। এসকল কারণে এদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা জাতির 'সর্বোচ্চ শিখরে। সকল শ্রেণীর নাগরিকদের শীর্ষে এদের অবস্থান। সততা, বিশ্বস্ততা ও মৌলিক অবদানই তাদের এই অবস্থানকে সুদৃঢ় করে। উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মর্যাদায় তাদেরকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে। কারণ তারা তাদের মনোজগতের বিচিত্র ভাব ও ভাবনাগুলোকে স্ব স্ব মাধ্যমে প্রকাশ করে দেশের রত্নভাণ্ডারকে কানায় কানায় পূর্ণ করে তোলেন। এ জন্যে যে কোন দেশে তারা সোনার ছেলে, হিরের টুকরো এমনি বহু বিশেষণে বিশেষিত হয়ে সমগ্র জাতির গর্বরূপে পরিচিত হন। এই হচ্ছে শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং বুদ্ধিজীবীদের চিরাচরিত স্বাভাবিক চিত্রের প্রকৃত রূপ। অথচ আজকের স্বার্থপরতা আর হানাহানির যুগে চিত্রের সেই স্বাভাবিক রূপটি বদলে গেছে। বিস্ময়করভাবে চিত্রে এসেছে বিকৃতি। দরিদ্র-পীড়িত উন্নয়নশীল বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই বিকৃতি আশংকাজনক পর্যায়ে অবস্থান করছে। এই বিকৃতিজনিত কারণে বিকৃত সমাজের বরদ হৃদয় সন্তানেরা লোভ,

www.pathagar.com

লালসা আর সুবিধাবাদের দ্বারা আক্রান্ত ও পরাজিত আজ। নিজ সত্তাকে বিকিয়ে দিয়ে মন্ত্রিত্ব, দূতাবাসের সদস্যপদ, শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিকানা, বিদেশ ভ্রমণের অদম্য আকাঙ্ক্ষা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ আসন লাভের বাসনা, আমদানি-রফতানি লাইসেন্স প্রাপ্তি, শিল্প সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গন দখলের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান পদে আসীন হওয়াসহ আন্যান্য সুযোগ সুবিধা লাভের আশায় পবিত্র আত্মাকে তারা কলুষিত করছেন পদে পদে। সর্বোপরি এই সমস্ত আকাঙ্ক্ষার দ্বারা তাড়িত হয়ে বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ছেন তরা। এমনকি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় অবস্থান গ্রহণের মধ্যদিয়ে নিষ্কলুস আত্মার শক্তি, স্বাধীন সত্তা ও নিরপেক্ষতাকে জলাঞ্জলি দিচ্ছেন। রাজনৈতিক দলের দলীয় প্রধানের আশীর্বাদ লাভের আশায়, আস্থা ভাজন হওয়ার আশায় অনেকেই আজ স্তাবকে পরিণত হতে পছন্দ করছেন।

এক সময় ছিল যখন বিভিন্ন দলের নেতা, নেত্রী ও কর্মীরা নিজেদের দুঃসময়ে জাতীয় দুর্যোগময় মুহূর্তে পরামর্শ লাভের আশায় শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের শরণাপন্ন হতেন। হিতোপদেশ ও পরামর্শ লাভে তারা নিজেদেরকে ধন্য মনে করতেন। অথচ বর্তমান সমাজে ঘটছে সম্পূর্ণ উল্টো ঘটনা। এখন শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং বুদ্ধিজীবী তথা ঈশ্বরের বরপুত্রদের সিংহভাগই ওঁৎ পেতে বসে থাকেন কখন কোন উছিলায় নেতা-নেত্রীদের সান্নিধ্যে যাওয়া যায় সেই আশায়। কে কার আগে যাবেন, কে কার চেয়ে অধিক প্রিয়পাত্র হতে পারেন সেই প্রতিযোগিতায় মত্ত থাকেন তারা। সৌভাগ্যবশত স্তাবক, প্রতিযোগীদের সাথে নেতা-নেত্রী যদি করমর্দন করেন, অন্যথায় নিদেনপক্ষে যদি কুশল জিজ্ঞেস করেন তাহলে তারা জন্ম স্বার্থক মনে করেন এবং নেতা-নেত্রীর পক্ষে স্তুতিবাক্য আওড়াতে নির্লজ্জভাবে কলম ধরেন। বহমান নদীর স্রোতধারার মতই সেই কলমের গতি। এমনিভাবে তারা বিশেষ বিশেষ দলের গৃহপালিত স্তাবকে পরিণত হন। ফলে তাদের এহেনো স্তাবকী স্বভাব একটি সুস্থ, সুন্দর ও সুখী জাতির ললাটে কালিমা লেপন করে। জাতির সার্বিক উন্নয়নের পথকে কন্টকীত করে। তাদের দলীয় আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো ক্রমান্বয়ে সমাজকে পঙ্গু করে ফেলে। বিভিন্ন পক্ষকে পরস্পরের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণু করে তোলে। অহেতুক বিবৃতি ও পাল্টা বিবৃতি প্রদানে উৎসাহিত করে এবং পরস্পরের প্রতি কুৎসা রটনায় উদ্বুদ্ধ করে। ফলে দেশের সাধারণ মানুষ এমনকি রাজনৈতিক অঙ্গনের অনেকেই এদের স্তাবকী স্বভাব ও স্বার্থপরতার কারণে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠে। শুধু তাই নয় এই মহলের গৃহীত পদক্ষেপসহ যে কোন বিষয়ে তাদের ভূমিকাকে সন্দেহের চোখে দেখে থাকে। কারণ এদের কর্তাভজা স্তাবকী দুর্বল স্বাভাবের সুযোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং তাদের আশীর্বাদপুষ্ট গোষ্ঠী দেশের সর্বত্র স্বৈরতান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক আগ্রাসনের বিস্তার ঘটায়। দলীয় ক্ষুদ্র স্বার্থে প্রকাশ্যে লুটতরাজ ও হত্যাকাণ্ড ঘটায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সর্বত্র বিভেদ সৃষ্টি করে। সরলপ্রাণ ছাত্র ও তরুণ সমাজকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করে তাদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দিয়ে বিপথগামী করে। সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে খণ্ড বিখণ্ড করে। ব্যাংকের অর্থ আত্মসাত

www.pathagar.com

করে দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে। স্বনামে বেনামে দেশের অর্থ সম্পদ কুক্ষিগত করে। ঘুষ ও চাঁদাবাজির প্রসার ঘটায়। মেধার পরিবর্তে চাটুকারদের প্রাধান্য দেয়। জীবনরক্ষাকারী ওষুধে ভেজাল দিয়ে সমগ্র জাতিকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়। জাতির এইরূপ দুরবস্থা সত্ত্বেও স্তাবকে পরিণত হওয়া ঈশ্বরের বরপুত্রগণ নিজ নিজ দলীয় স্বার্থে নিশ্চুপ থাকেন এবং স্বদলের অন্যায় অপরাধ আড়াল করে অন্য দলের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রকাশে তৎপর হন। ফলে নির্দলীয়, নিরপেক্ষ সচেতন সাধারণ নাগরিকদের কাছে তারা নিন্দিত হন। তাদের নির্লজ্জ স্তাবকী নিন্দনীয় স্বভাব ও ভূমিকার কারণে জাতীয় জীবনে দেখা দেয় চরম নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা। যা প্রকৃত অর্থে সমাজের জন্যে কোন মঙ্গল বয়ে আনে না। সুতরাং সমাজের, দেশের ও দেশের মানুষের মঙ্গলার্থে, সকলের কল্যাণার্থে প্রয়োজন মুক্ত, স্বাধীন নিরপেক্ষ, তেজোদ্দীপ্ত ও সাহসী শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী সমাজ । নেতা-নেত্রী বা কোন দলের নয়, জাতির অহংকার ও গর্বই হবে যাদের একমাত্র পরিচয়। যারা হবেন একান্তই ঈশ্বরের নির্ভেজাল বরপুত্র। ২৯-১০-১৯৯৫।

www.pathagar.com

সৎ ও অসৎ মানুষের কড়চা

লেখাটি অসমাপ্ত রেখে আমি ঢাকা ছেড়ে গিয়েছিলাম নাটোরে। নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম থানায় আমার গ্রামের বাড়ি। নগরবাড়ীর যানজট হেতু ফসলের ক্ষেত মাড়িয়ে, বনজঙ্গল ও খানাখন্দক পেরিয়ে রাস্তায় উঠে তবে যেতে হল গন্তব্যে। প্রথম রাজশাহী, তারপর গ্রামের বাড়ি। ছিলাম তিনদিন। ঢাকার অসহনীয় পরিবেশ ছেড়ে বাড়ি গিয়ে মন আরও অধিক মাত্রায় অস্থির হল। কারণ গ্রামের অবস্থা রাজধানী ঢাকার চেয়েও অধিক অসহনীয় মনে হল। সেখানে কয়েকটি সেন্টারে নির্বাচন নির্বিঘ্ন ও সুষ্ঠুভাবে হয়েছে এবং কয়েকটি সেন্টারে নির্বাচন নির্বিঘ্নে হতে পারেনি বলে জানা গেল। এই নির্বাচন এবং ব্যক্তিগত আক্রোশকে কেন্দ্র করে বিরোধী এবং ক্ষমতাসীনদের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে সেই বিরোধই হচ্ছে অস্থিরতার কারণ। অস্থিরতার কারণ আমার নিজের পরিবারও। কারণ পরিবারের একপক্ষ আওয়ামী লীগ, অন্যপক্ষ বিএনপি। অর্থাৎ নিজ ঘরেই সংঘর্ষ। গ্রামেগঞ্জে এমন পরিবারের অভাব নেই, এমন পাড়ার অভাব নেই যেখানে ভাইয়ে ভাইয়ে, চাচা-ভাতিজায়, পিতা-পুত্রে কিংবা আত্মীয়ে-আত্মীয়ে বিরোধ নেই। আর এই বিরোধকে আরও অধিক মাত্রায় রক্তক্ষয়ী বিরোধে রূপ দিয়েছে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতা। এই অস্থিরতা সৃষ্টির যারা হোতা তারা যদি ভেবে থেকে থাকেন এই অস্থিরতার মধ্যদিয়ে দেশে শন্তি প্রতিষ্ঠা হবে, অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে তাহলে বলতে দ্বিধা নেই তারা ভুল করছেন। একাত্তরে পরাজিত পাক হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের ভূখণ্ড ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ায় আর কোন সংঘাত কিংবা সমস্যা হয়নি। কিন্তু ছিয়ানব্বইয়ে তেমনটি হবার সম্ভাবনা নেই। কারণ এখানে কোন চিহ্নিত শত্রুপক্ষ নেই। ছিয়ানব্বইয়ের অস্থিরতা ভাইকে ভাইয়ের শত্রুতে পরিণত করছে। এখানে বাংলা উর্দুতে কোন শত্রুতা নেই। বাংলাকে বাংলার শত্রুতে পরিণত করা হচ্ছে এবং শত্রুতা সমাজ জীবনে চিরস্থায়ী রূপ নিচ্ছে। যার ভয়াবহতা থেকে অস্থিরতা সৃষ্টিকারী নায়করাও রেহাই পাবে না। ক্ষমতার লোভে যে আগুন গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে সে আগুন সোনার বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করবে। এখনই সচেতন না হলে এ আগুন প্লেগের মতই গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করে ছাড়বে।

গ্রামের বাড়ি অবস্থানের তিন দিনের মধ্যে দুটো দিনই বড়াইগ্রাম ও গুরুদাসপুর থানার বিরাট এলাকা ঘুরে বেড়িয়েছি। উদ্দেশ্য রাজনৈতিন পরিস্থিতির ভয়াবহতা নিরূপণ এবং একই সাথে ঐতিহাসিক স্থাপত্যকর্মের নিদর্শন সন্ধান। পোয়ালশুরা, সিধুলী, আগ্রান

www.pathagar.com

এবং লক্ষ্মীপুর নামক স্থানে বেশকিছু নিদর্শন রয়েছে বলেও তথ্য পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে পরবর্তীতে সবিস্তারে লিখবার আশা রইল। এই তথ্য সন্ধানকালে যে বিস্তীর্ণ এলাকা মাড়াতে হয়েছে তার সর্বত্রই বিপুল ফসলের সমারোহ লক্ষ্য করেছি। ক্ষেতভরা ফসল এলাকার মানুষের হৃদয়কে আন্দোলিত করলেও রক্তক্ষয়ী রাজনৈতিক সংকট তাদের মুখের হাসি কেড়ে নিয়েছে। বিবদমান দলগুলোর সৃষ্ট সংকট নিরসনে এলাকার নির্দলীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে ভূমিকা রাখতে অনুরোধ করলে তারা সবিনয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করে বললেন-এ বিষয়ে কোন কিছু বলা নিরাপদ নয়। বললেন সৃষ্ট সংকটের কাছে সাধারণ মানুষ এতটাই অসহায় যে, তারা মুখ খুলতে সাহস করে না। নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে তারা ঘরকেই বেছে নিয়েছে। এই বক্তব্য থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, বর্তমান আন্দোলনের সাথে সাধারণ মানুষের কোন সম্পর্ক নেই। জনগণ তাদের সাথে রয়েছে বলে প্রতিদিন রাজনৈতিক দলগুলো যে গলাবাজি করছে তার সাথে বাস্তবের কোন মিল নেই। সাধারণ মানুষ এমনকি রাজনৈতিক দলের শান্তিপ্রিয় সমর্থকরাও এখন এই ধ্বংসাত্মক রাজনীতির বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করেছে। তাদের মতে, সকলেই সীমা অতিক্রম করেছেন কিন্তু কোন সমাধান দিতে পারেননি। সময় এসেছে রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী ও কর্মীদের এ কথা জানিয়ে দেবার যে, আপনাদের অফুরন্ত অর্থের অজ্ঞাত উৎস থাকলেও আমাদের নেই। আপনাদের মত গায়ে বাতাস লাগিয়ে মিছিল, মিটিং হরতাল, ভাংচুর প্রভৃতিতে অংশ নিয়ে মহাসুখে থাকবার মত অবস্থা আমাদের নেই। আপনাদের অমানবিক ও হঠকারী কার্যকলাপের দরুন আমাদের পেট পিঠের অস্থি সংলগ্ন হয়েছে। আমাদের চোখের ঘুম হারাম হয়েছে। আমরা আহার চাই। নিরপেক্ষ ভোটের মাধ্যমে অসৎ ও মতলববাজদের ক্ষমতায় পাঠিয়ে জনগণের কোন লাভ নেই। দেশের জন্যে, দেশের মানুষের জন্যে নির্ভেজাল সৎ মানুষ চাই। কোন রাজনৈতিক দলেই যাদের কোন অস্তিত্ব নেই। নেই যে তা প্রমাণ করেছেন নেতা-নেত্রী এবং কর্মী নিজেরাই। তারা পরস্পরকে অক্রমণের মধ্যদিয়ে, স্বৈরাচার, স্বধীনতা বিরোধী, মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠনকারী, রাজাকার, লুটেরা, খুনী, চোর প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করে নিজেরাই নিজেদেরকে অসৎ ও অযোগ্য প্রমাণিত করেছেন। আর এ জন্যেই আজ তত্বাবধায়ক সরকারের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। নিজেরাই প্রমাণ করেছেন তারা সততার সাথে নির্বাচন পরিচালনা করবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। যদি তাই হয় তাহলে এই অসৎ ও অযোগ্য নেতা-কর্মী, যারা সাধারণ নির্বাচন করবার যোগ্যতা রাখেন না তারা কোন যোগ্যতায় দেশ চালাবেন? নাকি দেশ চালানোর জন্যে সততা কিংবা যোগ্যতার কোন প্রয়োজন হয় না? চোর, লুটেরা, স্বৈরাচার, রাজাকারসহ অসৎ লোকগুলো কোন মন্ত্রবলে ক্ষমতায় গিয়ে সাধু হয়ে যাবেন? যাদের দ্বারা দেশের এবং দশের কোন কল্যাণ সম্ভব নয়, সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে তাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেশের কিংবা দেশের মানুষের কি লাভ হবে? দল, দলের নেতা-নেত্রী এবং কর্মীদের অসৎ রেখে শুধু নির্বাচনে সততা দেখিয়ে কোন লাভ নেই। তাতে বরং ক্ষমতা ও সততার অপচয় এবং অপব্যবহারই হয়। অপচয় এবং অপব্যবহারের এই দেশে প্রকৃত অর্থে সৎ মনুষের বড়ই অভাব। অভাব

www.pathagar.com

শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, এ অভাব দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, সংস্কৃতি, শিক্ষা, অফিস, আদালদ সর্বত্র। ব্যবসায়ী মহল ব্যবসার নামে ব্যাংকের অর্থ লোপাট করছে, খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দিয়ে মানুষকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষা পদ্ধতি এবং শিক্ষার মান নেমেছে আশংকাজনক পর্যায়ে। এখন অর্থের বিনিময়ে পাসের সার্টিফিকেট পাওয়া যায় এবং সেই ভুয়া সার্টিফিকেট দিয়ে বড় বড় চাকরিও পাওয়া যায়। এক এবং একাধিক ৩য় বিভাগ পেয়েও সর্বোচ্চ মেধার বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি এবং পদোন্নতি দুয়েরই অধিকারী হওয়া যায়। যে সংবাদপত্রকে সত্যের বাহন বলা হয় সেই সংবাদপত্রও এখন আর সত্যের বাহন নয়, অসুস্থ, অসৎ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্লজ্জ মুখপত্র মাত্র। পত্রপত্রিকার লেখকগণ এখন আর ভাব কিংবা ভাষার ক্ষেত্রে আদর্শের কিংবা শালীনতার কোন তোয়াক্কা করেন না। যে যত বেশি কুৎসিত ও অশ্রাব্য ভাষায় লিখতে কিংবা প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে প্রবন্ধ রচনা করতে পারেন কিংবা প্রবন্ধের মাধ্যমে উস্কানি দিতে পারেন তাকে তত বেশি তুখোড় ও জনপ্রিয় লেখক হিসেবে মান্যগণ্য করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেটধারী কলাম লেখক অধ্যাপক পুলিশের কর্মকাণ্ডের নিন্দা প্রকাশার্তে যে কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ করেন সেই বাক্য অশিক্ষিত অর্ধ শিক্ষিত পুলিশের কর্মকাণ্ডে এবং তাদের ব্যবহৃত অশালীন ভাষাকেও হার মানা। ফলে অধ্যাপক আর পুলিশে কোন পার্থক্য থাকে না। পুলিশ আর পণ্ডিত মিলেমিশে একাকার হয়ে যান। একাকার হয়ে যান বিভিন্ন অফিসের পিয়ন, অর্দালি এবং অফিসারগণও। একাকার হয়ে যান তখন যখন তারা ঘুষ খান। পিয়নের কাছে ফাইল নড়বে না, বলবে বড় সাহেবদের খুশি করতে হবে। বড় সাহেবদের কছেও ফাইলের কাজ হবে না, বলবেন গরীব পিয়নদের খুশি করতে হয়। পারস্পরিক সমঝোতায় তারা এমনিভাবেই একে অপরকে খুশি করে থাকেন। ফলে বড় সাহেবদের মত পিয়নদেরও বহুতল ভবনসহ অগাধ অর্থ সম্পদ হয়। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতিষ্ঠিত এই সমস্ত দুষ্টচক্র বহাল রেখে শুধু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্বাচন দিয়ে যে সমাজ পরিবর্তন করা যাবে না, সমাজের মানুষের যে কল্যাণ করা যাবে না সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে কি? মনে রাখা প্রয়োজন দুধ যত শুভ্রই হোক দুধ রাখবার পত্র যদি মলিন হয়, অপরিস্কার কিংবা অপবিত্র হয় তাহলে তাতে দুধ রাখলে তার শুভ্রতা মলিন হতে, অপবিত্র হতে বাধ্য। মোলিনতা থেকে রক্ষা করতে দুধের পাত্রকে নির্মল করতে হয়। সুতরাং রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রী, কর্মীসহ দেশ উন্নয়নে নিয়োজিত সকল স্তরের মানুষদের অসৎ রেখে শুধু নির্বাচন সুষ্ঠু করে লাভ নেই। নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করবার প্রয়োজনে সর্বাগ্রে তাদেরকে সৎ ও নিষ্ঠাবান করবার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারই হচেছ তার উৎকৃষ্ট প্রক্রিয়া। আমি বাংলাবাজার পত্রিকাতেই গত ২৫/১০/৯৪ তারিখে লিখেছিলাম তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন পরিচালনার জন্য নয়, দেশ পরিচালনার জন্য হোক। লিখেছিলাম- বর্তমানে গোটা দেশের শাসন ব্যবস্থার সর্বত্রই যেভাবে ঘুণে ধরেছে এবং ভেতরে ভেতরে কুরে কুরে খেয়ে যেভাবে জাতির পুরো কাঠামোকে দুর্বল করে ফেলেছে এবং সব মিলিয়ে সমগ্র জাতির যে নাজুক অবস্থা হয়েছে তাতে এই মুহূর্তেই

www.pathagar.com

জাতির জন্যে প্রয়োজন এমন এক সরকার যে সরকারের সদস্যবৃন্দ হবেন আক্ষরিক অর্থেই সৎ, বিদ্যা-বুদ্ধিতে তীক্ষ্ণ, ব্যক্তি জীবনে নির্লোভ, নিরপেক্ষ এবং অতি অবশ্যই নির্দলীয়। যাদের থাকবে না কোন ছাত্রফ্রন্ট, থাকবে না কোন যুবফ্রন্ট, থাকবে না কোন অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী ও লাঠিয়াল বাহিনী, থকবে না দালাল বাহিনী। যার ফলে এই সরকারের পক্ষে সহজেই দূর করা সম্ভব হবে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অসঙ্গতি। পুনর্গঠিত করা সম্ভব হবে ঘুনে ধরা দুর্বল রাষ্ট্রীয় কাঠামোগুলো। প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে জাতীয় আদর্শ ও ন্যায়নীতি। যে নীতি ও আদর্শের দীক্ষা নেবে রাজনৈতিক দলসমূহ এবং তাদেরই নিজস্ব-প্রচেষ্টায়, নিজেদের উদ্যোগেই পরিচালিত হবে সাধারণ নির্বাচন। প্রতিষ্ঠিত হবে সকলের আকাঙ্ক্ষিত সুন্দর, সুস্থ ও আদর্শবাদী রাজনৈতিক সরকার। সুতরাং আগের মত আবারও বলি দলমত নির্বিশেষে দেশের সকল স্তরের মানুষ যখন সৎ ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন তখন এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারকেই কয়েকটি টার্মের জন্যে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হোক। জাতির প্রকৃত কল্যাণের জন্যে এইটিই প্রকৃষ্ট উপায়। ১৭-৩-৯৬।

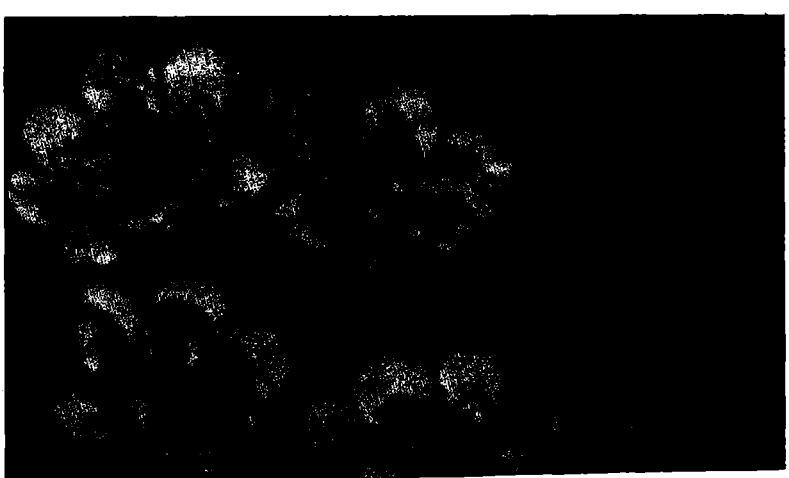

www.pathagar.com

বৈধ ও অবৈধের স্বরূপ

বিধিমত, বিধানসম্মত, কিংবা আইনসিদ্ধ বিষয়গুলো 'বৈধ' বলে পরিচিত। ঠিক এর বিপরীত বিষয়গুলো অর্থাৎ শাস্ত্র বিরুদ্ধ, নীতি বিরুদ্ধ, আইন বহির্ভূত বা বেআইনি বিষয়গুলো অবৈধ বলে স্বীকৃত। অবৈধ বিষয়গুলো জনসাধারণের জন্যে পরিত্যাজ্য। তবে অবৈধ অনেক বিষয় আছে যেগুলোকে বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৈধ করা হয়। যেমন আগ্নেয়াস্ত্র। আগ্নয়াস্ত্র যে কেউ ব্যবহার করতে পারে না। তবে লাইসেন্সের মাধ্যমে অনেকেই আবার তা ব্যবহার করবার অনুমতি পায়। অর্থাৎ লাইসেন্সের মাধ্যমে নিষিদ্ধ কিংবা অবৈধ বিষয়কে বৈধতা দেয়া হয়।

লাইসেন্সের অর্থ হচ্ছে বিশেষ বিশেষ অস্ত্র, ব্যবসা ও বৃত্তি গ্রহণে সরকারি অনুমতি এবং নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি রাখবার ও ব্যবহার করবার অনুমতি দুই-ই। বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে গেলে দুর্ভাবনায় পড়তে হয়। নিষিদ্ধ অথচ তা রাখা এবং ব্যবহার করবার অনুমতি! পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এমন অনেক কিছু আছে যা অবৈধ হওয়া সত্ত্বেও বৈধ। যেমন পতিতাবৃত্তি। এই বৃত্তিতে যারা নিয়োজিত তারা সর্বত্রই পতিতা হিসেবে চিহ্নিত। অবশ্য অতি সম্প্রতি বেইজিং বিশ্ব নারী সম্মেলনে অন্য শ্রমিকদের মত তাদেরকেও শ্রমিকরূপে স্বীকৃতি দিয়ে 'যৌন শ্রমিক' নামকরণের মাধ্যমে পেশাটির সম্মান বৃদ্ধি করবার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে নামের পরিবর্তন ঘটলেও আইনের দিকটি একই রয়েছে। অর্থাৎ পেশাটি অবৈধই রয়ে গেছে। এই অবৈধতার কারণে পতিতা বা যৌন শ্রমিকদের সরকারি লাইসেন্স গ্রহণ করতে হয় এবং এই লাইসেন্স প্রাপ্তির মাধ্যমেই তারা সৌভাগ্যের অধিকারী হয়। আর যারা লাইসেন্সপ্রাপ্ত নয় তারা সরকার এবং সমাজের চোখে অবৈধ বলে বিবেচিত হয় এবং রাষ্ট্রযন্ত্র ও পুলিশের হয়রানির শিকারে পরিণত হয়। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহর এবং এলাকার ভাসমান পতিতা সম্পর্কে প্রায়ই পত্রপত্রিকায় প্রতিবেদন লক্ষ্য করা যায়। কখনো কখনো সচিত্র প্রতিবেদনও প্রকাশিত হতে দেখা যায়। যাদের কোন লাইসেন্স নেই তারা শহর ও সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থেকে গোপনে পতিতাবৃত্তির কাজ চালিয়ে যায়। অনেক সময় সাধারণ হোটেল ও বিউটি পার্লার নামের কোন কোন প্রতিষ্ঠানে কাজটি করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধৃত হয়। কারণ তারা লাইসেন্স ধারী নয়। দেশের বিত্তবানদের আশীর্বাদপুষ্ট হয়েও ঢাকার আকাশচুম্বী ব্যয়বহুল অত্যাধুনিক কনকর্ড টাওয়ারে বিলাসবহুল জীবনযাপনকারী দেহ ব্যবসায়ী সুন্দরী ফারাহদেরকেও

www.pathagar.com

পুলিশের কবলে পড়তে হয়। কারণ তারাও লাইসেন্সধারী নয়। অথচ সরকারি লাইসেন্স নিলেই সমাজের দৃষ্টিতে এহেনো গর্হিত কাজও বৈধ হয়ে যায়। কিন্তু মাজার বিষয় হচ্ছে লাইসেন্সের মাধ্যমে এই বৈধতার সার্টিফিকেট নেবার দায়িত্ব শুধু মেয়েদের। অথচ কে না জানে তথাকথিত গর্বিত পুরুষ প্রবরদের ছাড়া পতিতাদের যৌন ব্যবসা অচল। অর্থাৎ এই ব্যবসার ক্ষেত্রে পুরুষরাও সমঅংশীদার, অথচ তাদেরকে লাইসেন্স নিতে হয় না। সর্বকালে সর্ববিষয়ে অবৈধ কাজ করেও তারা বৈধ এবং সমাজে দণ্ডমুণ্ডের পবিত্র কর্তাব্যক্তিরূপে পরিগণিত।

মদ বা প্রমত্তকর রসের ব্যবসা ও তা পান করা পতিতাবৃত্তির মতই আর একটি অবৈধ কর্ম। কিন্তু পতিতাবৃত্তির মত ঢলাওভাবে অবৈধ ঘোষিত নয় সকল দেশে। এমন অনেক দেশ আছে যে দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে খোলা বাজারে মদ বা প্রমত্তকর রস বিক্রির সুব্যবস্থা আছে। সিংহভাগ মুসলিম দেশে খোলামেলা বিক্রি এবং পানের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর পর এ বিষয়ে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল বলে জানা য়ায়। শুধু তাই নয়,তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার রমনার রেসকোর্স ময়দানে ঘোড় দৌড়ের মাধ্যমে জুয়া খেলার যে প্রচলন ছিল তাও বন্ধ ঘোষণা করেছিল, যা আজও বন্ধ রয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে প্রমত্তকর রস পানের উপর আরোপিত বিধিনিষেধ তুলে নিয়ে লাইসেন্সের মাধ্যমে তার ব্যবসা এবং পান বৈধ করা হয়। দেশের নামি-দামি ক্লাব, রেস্টুরেন্ট এবং হোটেলে প্রমত্তকর রস পানের অবারিত ব্যবস্থা আছে। দেশের উঠতি বয়সের নব্য ধনিক শ্রেণীসহ অনেকেই আজ নামি-দামি ক্লাবের সদস্য। আধুনিক, অত্যাধুনিক এবং অতি প্রগতিশীলতার নিদর্শন রঙিন টিভি, ভিসিআর, ডিস, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, কর্ডলেস টেলিফোন, বিলাসবহুল গাড়ি, বাড়ি এবং বাড়ির মিনিবারের মতই এই সদস্যপদ এখন অনেকের কাছেই জরুরি। নিজে প্রমত্তকর রস পান করা এবং বন্ধুদের পান করানো বর্তমান সমাজব্যবস্থায় সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের প্রতীক হিসেবে স্বীকৃত। যারা এহেন ক্লাবসহ বিভিন্ন পানশালার সদস্য তাদের অনেকেই দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, দলের সদস্য কিংবা প্রধান। তাদের সিংহভাগই দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তারাই দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের কলকাঠি নাড়েন। লাইসেন্সের জোরে এই সকল পানাসক্ত ভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গ সমাজের উঁচুতলা থেকে কখনো কখনো সমাজ দুষণের বিষাক্ত বিষবাষ্প ছড়িয়ে মধ্যযুগীয় অন্ধকার আনয়ন করেন। সেই অন্ধকারে আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির নামে পানাসক্ত সদস্যবৃন্দ সভ্যতা ভব্যতা বিবর্জিত আচার-আচরণে মত্ত হয়ে জীবন উপভোগ করেন। লটারির মাধ্যমে আংটি কিংবা গাড়ির চাবি বদল করে তারা পরস্পরের স্ত্রী সম্ভোগের মত অবৈধ ও অনৈতিক কর্মসাধনের মধ্যদিয়ে তথাকথিত উঁচুতলার গর্বিত সংস্কৃতির চর্চা করে থাকেন বলেও দেশ-বিদেশের পত্রপত্রিকায় সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এই সংস্কৃতিসেবী প্রমত্তকর রসের রসিক প্রবররা টালমাটাল অবস্থায় পথে নামলেও তাদের সালাম ঠুকে সসম্মানে বড়ি পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। অথচ সমাজের নিচু তলার সাধারণ মানুষদের কেউ

www.pathagar.com

কাজটি করলে ডাণ্ডাপেটা করে হাজতে ভরা হয়। এদের সঙ্গে রাস্তার কুকুরের মত আচরণ করা হয়। কারণ এদের এবং কুকুরের কোন লাইসেন্স থাকে না। লাইসেন্স থাকে না বলে মাঝে মধ্যেই রাস্তার কুকুর মেরে গাড়ি ভরতে দেখা যায়। যে কুকুর বছরের পর বছর কোন পরিবারে লালিত পালিত হয়। বিপদে-আপদে সাহায্য করে থাকে। রাত্রি জাগরণের মধ্যদিয়ে বাড়িকে চোর-ডাকাতের কবল থেকে রক্ষা করে থাকে। কেবল লাইসেন্স থাকে না বলে বেওয়াশি কুকুরের সাথে সেগুলোকেও হত্যা করা হয়। অথছ লাইসেন্সধারী হলে কোন কুকুরের কেশাগ্রও স্পর্শ করা যায় না। সুতরাং লাইসেন্সবিহীন মদ্যপান ও লাইসেন্সবিহীন কুকুরের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। তবে সমাজের এমন অনেক মানুষ আছে যাদের এসব বিষয়ে লাইসেন্স না থাকলেও তাদেরকে সকলে সমীহ করে চলে। সমীহ করে চলে কারণ তারা সমাজের উঁচুতলার মানুষ। তারা গড ফাদার । এই গড ফাদারই বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশে সর্বময় কর্তার ভূমিকা পালন করে থাকে। তারা সর্বত্র সন্ত্রাস ছড়িয়ে দিয়ে লুটপাটে অংশগ্রহণ করে। তারা ক্ষমতার অভ্যন্তরে কিংবা আশ্রয়ে থেকে দেশের সুষ্ঠু সবল কাঠামোগুলো একের পর এক ধ্বংস করে ফেলে। সুবিধাদান ও অর্থের বিনিময়ে এক শ্রেণীর অসৎ ও লোভী শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের জী হুজুরে পরিণত করে তাদের সহানুভূতি ও সমর্থন আদায় করে নেয়। এমনিভাবে সব বিষয়ে ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় তাদের কাছে সরকার এবং সমাজ জিম্মি হয়ে পড়ে। যা দেশের জন্যে মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সেই ইঙ্গিত প্রদান করছে। সুতরাং চূড়ান্ত বিপর্যয়ে নিপতিত হবার পূর্বে সকলের সাবধান হওয়া প্রয়োজন। ৫-৭-১৯৯৭।

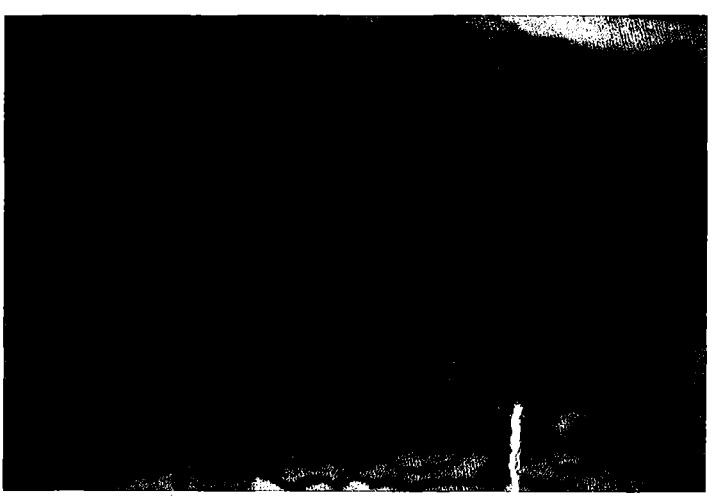

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রীর 'উপযুক্ত শিক্ষা'

'স্বাধীন' এবং 'স্বৈর' এই শব্দদ্বয়ের মর্মার্থ নিরূপণের ক্ষেত্রে লক্ষ্যযোগ্য যে, স্বাধীন শব্দটির অর্থ হচ্ছে- বাধাহীন, মুক্ত, স্বচ্ছন্দ ইত্যাদি। এবং স্বৈর শব্দের অর্থ হচ্ছে- স্বাধীন, স্বেচ্ছাচার, অসংযত, উচ্ছৃঙ্খল ইত্যাদি। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, স্বাধীন এবং স্বৈর শব্দ দুটি একে অপরের অঙ্গীভূত। অর্থাৎ এর অর্থ আপেক্ষিক। অর্থাৎ পরিমাণ নির্ভর। যেমন সঠিক মাত্রায় লবণ ব্যবহার খাদ্যবস্তুকে সুস্বাদু করে। আবার সেই লবণের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার খাদ্যবস্তুকে বিষে পরিণত করে। ঠিক এমনই। সঠিক মাত্রায় স্বাধীনতা স্বাধীনতার মর্যাদা পায়। আবার মাত্রাতিরিক্ত স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতায় পর্যবসিত হয়। সুতরাং বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, স্বাধীনতা একই সঙ্গে স্বাধীনতা এবং স্বেচ্ছাচারিতা, উভয়ই। এদের স্ব স্ব অর্থ মাত্রানির্ভর। 'শিল্প' শব্দটি যেমন একই সাথে চারুকলা এবং কারখান। কিন্তু তাই বলে চারুকলাকে কারখানা বলে চালানো যায় না। যদি কেউ চারুকলাকে কারখানা বলে চালাতে চান তাহলে তাকে সুস্থ মস্তিষ্ক, স্বাভাবিক জ্ঞানের অধিকারী, যুক্তিবাদী কোনভাবেই আখ্যায়িত করা যাবে না। বরং বলা সঙ্গত হবে যে, তিনি মস্তিষ্কহীন, বিকৃত মস্তিষ্কসম্পন্ন, নির্বোধ, উন্মাদ ইত্যাদি।

স্বাধীনতাকে যথাযথভাবে অনুধাবন করতে হলে এর পরিপূরক 'নিয়ম' শব্দটির কথা সব সময়ই মনে রাখতে হবে। যা মানুষকে প্রথা, পদ্ধতি, প্রণালী, আইন, অভ্যাস, বিধান, সংযম, ইন্দ্রিয় দমন, শাস্ত্রবিহিত কৃচ্ছ্রসাধন, সংযত আচরণ প্রভৃতি বিষয়ে সচেতন করে এবং একই সাথে স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে। 'নিয়ম' এমন একটি শব্দ যা স্বাধীনতার প্রকৃত চিত্র-চিত্রণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। একটি দেশ স্বাধীন হওয়ার অর্থ এই নয় যে, সেদেশে কোন নিয়ম কানুন থাকবে না, কোন আইন থাকবে না, কোন শাসক থাকবে না, থাকবে না কোন শাসন, কোন শিষ্টাচার। বরং যে দেশে এই বিষয়গুলি পূর্ণরূপে বিদ্যমান সেই দেশই প্রকৃত অর্থে স্বাধীন এবং সভ্য। সুতরাং নারী স্বাধীনতা শাসন, নিয়ম, এবং শিষ্ঠাচারের পথ ধরেই এগোতে হবে। নারী স্বাধীনতা মানে বলগাহীন স্বাধীনতা নয়। নয় উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ও রুচিহীন পোশাক পরিধান। যেকথা বাংলাদেশের নারী মুক্তি আন্দোলনের অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী কবি বেগম সুফিয়া কামালের অনুভূমিতেও প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন 'মেয়েদের মুক্তি মানে পর্দা ফেলে শুধু ঘর থেকে বাইরে বেরুবার মুক্তি নয়, তাদের আত্মার মুক্তি, চিন্তার মুক্তির কথা ভাবতে হবে। স্বীকৃতি আদায় করতে

www.pathagar.com

হবে তাদের কর্মের' (বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র '৯৪ বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তব্যের অংশ)। নারী স্বাধীনতা ও নারী অধিকার আন্দোলন স্বামীর সহমরণ থেকে নারীকে রক্ষা করবে, সামাজিক কুসংস্কার থেকে মুক্ত করবে, রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করবে, সামাজিক বৈষম্য ও নির্যাতন থেকে রক্ষা করবে, নারী ও পুরুষের সম্পর্ক স্থাপন করবে, এটিই সাবার কাম্য।

গত ৮ মার্চ '৯৪ বিশ্ব নারী দিবস পালিত হয়েছে। পালন করেছে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় মহিলা সংস্থা, বাংলাদেশ মহিলা ফোরাম, এমনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল, আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন কমিটিসহ দেশের ছোট বড় ১২০টি অন্যান্য নারী সংগঠন। 'নারীর অধিকার মানবাধিকার' এবং 'শরীর আমার সিদ্ধান্ত আমার' এই সমস্ত শ্লোগান সংবলিত ব্যানার ও ফেস্টুন হাতে মহিলারা মিছিল করেছেন। বক্তৃতা করেছেন। বিবৃতি দিয়েছেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এই বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষে বলেছেন-"বাংলাদেশের অধিকাংশ নারী উপযুক্ত শিক্ষা ও সচেতনতার অভাবে পশ্চাৎপদ রয়ে গেছে এবং নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।"

নারী নির্যাতনের কারণ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী উপযুক্ত শিক্ষা এবং সচেতনতার অভাবকে দায়ী করেছেন। আমরা জানি সমাজের সর্বত্র উন্নয়নের জন্য শিক্ষা একটি অপরিহার্য শর্ত। তবে নারী অধিকার এবং নারী স্বাধীনতার ক্ষেত্রে শিক্ষা কতটা কার্যকর তা সঠিক করে বলা কঠিন। কারণ বিশ্বের এমন কোন দেশ নেই যেখানে নারী নির্যাতন নেই। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বিশ্বের অন্যমত অগ্রগামী ও উন্নত দেশ, শীর্ষস্থানীয় দেশ, স্বপ্নের দেশ আমেরিকার কথাই ধরা যাক। সে দেশেও নারী নির্যাতন রয়েছে। বলা যায় আশঙ্কাজনকভাবেই রয়েছে। ১৯৮৫ সালে আমি যখন আমেরিকায় (নিউইয়র্কে) তখন প্রায় প্রতি সপ্তাহেই গভীর রাতে আমার ঘুম ভাঙ্গত হেল্প, হেল্প, হেল্প বলে সাহায্য চাওয়া কোন না কোন মেয়ের বুকফাটা আর্তচিৎকারে । কখনো কখনো পথচারী থাকলেও কেউ এগিয়ে যেতনা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে। যেতনা প্রাণের ভয়ে। এইটি মাত্র একটি রাস্তার করুণ কাহিনী। সুতরাং পুরো দেশে যে এর কি ভয়াবহরূপ তা সহজেই অনুমেয়। আমেরিকার মত উদার ও সেক্স ফ্রি দেশের এই করুণ পরিণতি থেকে উগ্র নারীবাদীদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। কারণ শিক্ষা ও জরায়ুর স্বাধীনতাও সে দেশের নারীদের শান্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশের দিকে তাকালেও দেখা যাবে শিক্ষিত ও উচ্চ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই সমস্যা বিদ্যমান। দেখা যাবে শিক্ষিত স্বামীর হাতে সবসময় নির্যাতিত এবং নিহত হচ্ছে শিক্ষিত স্ত্রীরা। তাহলে দেখা যাচ্ছে শিক্ষাই এর একমাত্র সামাধান নয়।

প্রধানমন্ত্রীর দেয়া বাণীর দুটি বিশেষ শব্দ এক্ষেত্রে লক্ষ্যযোগ্য। শব্দ দুটি হচ্ছে- 'উপযুক্ত' এবং 'শিক্ষা'। অর্থাৎ অশিক্ষা কুশিক্ষা নয়, 'উপযুক্ত শিক্ষা'। শিক্ষাকে হতে হবে নারীর অধিকার এবং নারী স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করবার উপযুক্ত। সে শিক্ষা স্কুল,

www.pathagar.com

কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেও হতে পারে। এই উপযুক্ত শিক্ষাই হতে পারে নারী ও পুরুষের মাঝে সুসম্পর্ক গড়ে তুলবার সহায়ক শক্তি। হতে পারে মূল মন্ত্র।

উপযুক্ত শিক্ষা কি? কোথায় এ শিক্ষা পাওয়া যাবে? কে শিক্ষা দেবে? এক্ষেত্রে এরূপ বহুবিধ প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক। এ বিষয়ে বুদ্ধিজীবী সমাজ এবং বিজ্ঞ পণ্ডিতেরাই উপযুক্ত সমাধান হয়ত দিতে পারবেন। তবে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয়েছে উপযুক্ত শিক্ষার পূর্বে সর্বাগ্রে নারী পুরুষ সকলের মাঝে উদারমনস্কতা, সহনশীলতা ও মূল্যবোধের যে চেতনা তার উন্মিলন ঘটানো প্রয়োজন। অন্যথায় কোন প্রচেষ্টাই সুফল বয়ে আনবে না। কারণ অশিক্ষিত সমাজেই শুধু নয়, শিক্ষিত সমাজ এমনকি উচ্চ ডিগ্রীধারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, তাঁর ছোট্ট ছেলেটি সারাটা দিন কোথায় কোথায় ঘুরছে তিনি তার কোন খোঁজই করছেন না। অথচ নষ্ট হবে ভেবে স্কুল কলেজে পড়ুয়া মেয়েকে স্কুল কলেজের বাইরের সময়টিতে ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রাখছেন সারাক্ষণ। ছেলেত দূরের কথা তার সমবয়সী কোন মেয়ের সাথেও মিশতে দেন না। আবার এও দেখা যায় যিনি আজীবন সকলকে শাড়ী পরে খাঁটি বাঙালি হওয়ার উপদেশ দিচ্ছেন তার নিজের মেয়েই সে উপদেশ পছন্দ করছে না। চুলে বব ছেঁটে সালোয়ার-কামিজ বা শার্ট-প্যান্ট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখা যায় যিনি মিটিং ও মিছিলে নারী স্বাধীনতা এবং নারীর অধিকার দাবী করছেন তিনিই তার বাড়ীর কাজের মেয়েটির উপর নির্যাতন করছেন। এই হচ্ছে আমাদের সমাজের বাস্তব চিত্র। সুতরাং প্রয়োজন এহেন স্ববিরোধী মানসিকতার পরিবর্তন। এবং তারপর উপযুক্ত শিক্ষার উৎস সন্ধান। যার জন্য যেতে হবে প্রকৃতির কাছে। হতে হবে প্রকৃতিবাদী। গ্রহণ করতে হবে প্রকৃতিগত শিক্ষা। যেখানে কোন কৃত্রিমতা নেই। যেখানে স্ত্রী ও পুরুষের সম্পর্ক গড়তে কৃত্রিম শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। নেই কোন উপদেশ বাণী। নেই কোন ছলচাতুরী। আছে শুধু সম্পর্ক এবং শুধুই নির্ভেজাল মধুর সম্পর্ক। স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত সম্পর্ক।

আমরা যখন প্রকৃতির দিকে তাকাই তখন অনেক প্রাণী আমাদের দৃষ্টিকে নানাভাবে আকৃষ্ট করে। গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি প্রাণীর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বিশেষ বিশেষ সময় স্ত্রী-পুরুষের মিলনক্ষণে ক্ষণিক সম্পর্ক গড়ে উঠলেও এদের কোন পারস্পরিক সম্পর্কের সংসার নেই। যে কারণে পরবর্তী সময়ে স্ত্রী প্রাণীকেই বাচ্চা লালন পালন ও ভরণপোষণের সর্বময় দায়িত্ব পালন করতে হয়। বাচ্চারা মাতৃস্নেহে লালিত হয় বলে মাতৃ পরিচয়ই এদের প্রধান পরিচয়। যার সঙ্গে পশ্চিমী সভ্যতার নারী-পুরুষের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আবার টুনটুনি, বাবুই, ঘুঘু এবং শান্তির প্রতীকরূপী পায়রার দিকে তাকালে দেখা যায় ভিন্ন দৃশ্য। এদের মধ্যে রয়েছে সংসার, রয়েছে স্নেহ, মায়া, মমতা ও ভালবাসা। রয়েছে গভীর সম্পর্ক। যা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব মানবীর মধ্যেও অনেক ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। পায়রা-পায়রী বা কপোত-কপোতীর মাঝে যে মধুর সম্পর্ক, সমঝোতা, কর্ম উদ্দীপনা, কর্মকুশলতা বিদ্যমান তা সত্যিকার অর্থেই অনুকরণযোগ্য। বাসা নির্মাণ, ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফুটানো, বাচ্চা লালন পালন সর্বক্ষেত্রেই এদের মধ্যে

www.pathagar.com

রয়েছে পরস্পরের প্রতি নির্ভেজাল সহযোগিতা। এই মধুর সম্পর্ক গড়বার জন্য তাদের বিদ্যাপীঠে শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন হয়নি। তাদের কারও স্বাধীনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হয়নি কোন সংগঠনের। প্রয়োজন হয়নি বিশেষ দিবস পালনের, মিছিলের। প্রয়োজন পড়েনি কোন আইনী শাসনের। এ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে প্রকৃতিগত নিয়মে। পারস্পরিক সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও শ্রদ্ধাবোধের এই মধুর সম্পর্কই হচ্ছে উপযুক্ত সম্পর্ক। আর এই শিক্ষাই হচ্ছে উপযুক্ত শিক্ষা। যে শিক্ষায় জবরদস্তি নেই, প্রতিহিংসা নেই, ধর্মীয় গোঁড়ামি নেই, কুসংস্কার নেই, রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা নেই, ঘটা করে লোক দেখানো দিবস পালন ও বক্তৃতা নেই। আছে কেবল উভয় পক্ষের সুন্দর সম্পর্ক নির্মাণের পবিত্র অনুভূতি বা উপযুক্ত ব্যবস্থা। গ্রামে গঞ্জে শিক্ষিত অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের মধ্যে এই শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়াই হবে প্রধান কাজ।

নারী ও পুরুষ সৃষ্টিকর্তার এক অপূর্ব সৃষ্টি। এই সৃষ্টিতে কোন বিভেদ নেই। আছে সুন্দর সমন্বয় ও আকর্ষণীয় সম্পর্ক। এই উপমহাদেশে ব্রাহ্মণ্যবাদ, রাজ-রাজরা, জমিদার ও জোতদার শ্রেণীর অনেকে নারীকে বাহুবলে ভোগ করেছে। পরিণত করেছে ভোগের সামগ্রীতে। এদের দ্বারা নারী হয়েছে অত্যাচারিত, নিগৃহীত। হয়েছে অপমানিত। অত্যাচারী চরিত্রের এই বিষবাষ্প থেকে আজও আমরা মুক্ত নই। সুতরাং সামাজিক বৈষম্য, বর্ণবৈষম্য, শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টিকারী, নারী ও পুরুষে বিভেদ সৃষ্টিকারী অসৎ মানুষের কুচক্র থেকে এই সম্পর্ককে রক্ষা করতে হবে। নারী ও পুরুষের সামাজিক সুসম্পর্ক গড়া এবং একে রক্ষা করা কেবল বিশেষ বিশেষ সংগঠনের দায়িত্ব নয়। এ দায়িত্ব সমাজের সকল স্তরের মানুষের। সকল দায়িত্বশীল মানুষের। ৫-৪-১৯৯৪।

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ একুশে ও স্বাধীনতা পদক

'First class first Gold Medalist' এই বাক্যটি বাল্যকালে সমাজের সাধারণ মানুষদেরকে উচ্চারণ করতে শুনেছি। অত্যন্ত গর্বের সাথে, সম্মানের সাথে তারা এটি উচ্চারণ করতেন। শিক্ষা জীবনে যারা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারতেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাদেরকে স্বর্ণপদকে ভূষিত করবার মধ্য দিয়ে সম্মানিত করলে সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে First class first Gold Medalist বলা হতো। যারা পদক পেয়ে সম্মানিত হতেন দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ তাদেরকে এক নজর দেখতে যেতেন বলেও অনেককে বলতে শুনেছি। সে সময় পদক এবং পদক প্রাপ্তদের যে মূল্য ছিল, যে মর্যাদা ছিল তা আজ আর নেই বললেই চলে। সে কালে পদক প্রদানকারী সংস্থা মেধার প্রতি সম্মান যেমন জানাতেন তেমনি মেধার অধিকারী সম্মানিত ব্যক্তিও প্রাপ্ত সম্মানের মর্যাদা রাখতে সদা সচেষ্ট থাকতেন। তাদের কাজকর্ম, আচার-আচরণ, কথাবার্তা, চালচলন ও আদব-কায়দায় মানুষ অভিভূত হতেন। মনে মনে অনেকেই এমনই একজন মেধাবী সন্তান কামনা করতেন। ভাবতেন এমন একজন সন্তান পেলে তার সে সন্তান বংশগৌরব বৃদ্ধি করবে। সন্তানের কারণে তিনিও হবেন সম্মানিত। কিন্তু এখন বাংলাদেশের চিত্র ঠিক এর উল্টো। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও শিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এখনও পদক দেওয়া হয়। তবে তার জন্যে পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বিশেষ কোন অবদান রাখবার খুব একটা প্রয়োজন হয় না। বিশেষ অবদান কিংবা কৃতিত্ব ছাড়াই এখন জাতীয় সম্মান লাভ করা যায়। অর্থের বিনিময়ে, দলবাজির বিনিময়ে, নকলের বিনিময়ে স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধা এবং পাশের সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। নকলের অবাধ উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার বর্তমান যুগে প্রকৃত মেধা মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। অসৎ ও নকলবাজরাই বিভিন্নভাবে বর্তমান সমাজের সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করবার মধ্য দিয়ে সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রীয় সম্মানও জুটে যাচ্ছে তাদেরই কারো কারো ভাগ্যে। ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা পদক পেয়ে যাচ্ছেন তারা যে তা মেধার স্বীকৃতি হিসেবেই পাচ্ছেন তেমনটি আজ আর ভাবা যাচ্ছে না। এটাও আজ দিবালোকের মতই স্পষ্ট যে, ক্ষমতাসীন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের একান্ত অনুগত যারা, স্তাবক যারা, ভাঁড় যারা তাদেরই মধ্য থেকে কেউ না কেউ পাচ্ছেন পদকগুলো। তবে এর যে ব্যতিক্রম একেবারেই নেই তা নয়, কিন্তু ব্যতিক্রমীদেরকে কেউ আর বিশ্বাস করতে পারছেন না। কারণ অসৎ স্তাবক ও ভাঁড়দের সংখ্যাধিক্যের কারণে ব্যতিক্রমীরা হারিয়ে যাচ্ছেন। আর এ কারণেই জনগণ প্রায় সকলকেই

www.pathagar.com

এক পাল্লায় মাপতে শুরু করেছেন। ফলে যারা এ সম্মান পান তাদের সিংহভাগই নানাবিধ সমস্যা, দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সংকোচে ভুগেন। সম্মান প্রাপ্তির আনন্দের পরিবর্তে নিরানন্দে থাকেন। জনগণ তাদেরকে কিভাবে গ্রহণ করছেন, তাদের নিয়ে কি ভাবছেন এ সকল চিন্তায় উদ্বিগ্ন থাকেন। এমনি একজনের সাথে দিন কয়েক পূর্বে কথা হচ্ছিল। তিনি এবার একুশে পদক পেয়েছেন। কিন্তু পদক-প্রাপ্তির পর থেকেই তিনি বিষন্নতায় ভুগছেন। অভিনন্দন জানালে মন খুলে তার জবাব দিতেও পারতেন না। একদিন একান্তে বসে মনোবেদনার কথা ব্যক্ত করলেন তিনি। বললেন যে, 'পদক আমার জন্যে কাল হয়েছে। আমি যেনো সবার শত্রুতে পরিণত হয়েছি'। তার এহেনো ধারণার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন যে, তার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী (যিনি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার কাছের মানুষ) তাকে বলেছেন যে, পদক পাওয়ায় তার (যিনি পদক পেয়েছেন) প্রতিষ্ঠানের সবাই বিরূপ সমালোচনা করছেন। বলেছেন অনেক বেশি অবদান রেখেছেন, বিদেশ থেকেও জাতির জন্যে সম্মান কুড়িয়ে এনেছেন এমন অনেক গুনি ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের ডিঙ্গিয়ে পদক দেওয়াতেই সমালোচনা হচ্ছে। সমালোচনা আরো অনেকের ক্ষেত্রেই হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। সমালোচকদের একই বক্তব্য-এখন আর পদকের কোনো মান-মর্যাদা নেই। বলছেন- যারা পদক দেন তারা নিজেদের স্বার্থের কথা ভেবেই দেন। জাতির কথা ভেবে দেন না। দিলে এমন সমালোচনা হতো না।

ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহের শেষ প্রান্তে একুশে পদক নিয়ে কথা হচ্ছিল শিল্পী মুর্তজা বশীর-এর সাথে। স্থানীয় একটি হোটেলের আর্ট গ্যালারিতে তাঁর একক পদর্শনী চলাকালে এ প্রসঙ্গে আলাপের এক পর্যায়ে তিনি স্বাধীনতা পদক নিয়ে কথা বলেন। তিনি বলেন যে, 'গেল বছর এ পদক আমার পাবার কথা ছিল, কিন্তু দেশের একজন খ্যতিমান প্রবীন শিল্পী গুরুতর অসুস্থ হওয়ায় আমার পরিবর্তে অসুস্থ শিল্পীকে স্বাধীনতা পদক দেয়া হয়, কিন্তু আমি তাতে কিছু মনে করিনি। তবে এবার যদি স্বাধীনতা পদক আমাকে না দেয়া হয় তাহলে এ পদক আর গ্রহণ করবো না। পদক দিতে চাইলেও আমি তা প্রত্যাখ্যান করেবো'। যতদূর জানা গেছে এবারও স্বাধীনতা পদক মুর্তজা বশীর-এর ভাগ্যে জুটছে না। কারণ বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী দলের একান্ত অনুগত এবং বশীর-এর তুলনায় যার অবদান অতি নগণ্য এবং যার কাজের মৌলিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠে এমন একজনকে স্বাধীনতা পদক দেয়া হচ্ছে বলে পত্রপত্রিকায় আগাম খবর পরিবেশন করা হয়েছে। সুতরাং এ খবর যদি সত্যি হয় তাহলে বলতেই হবে যে, মুর্তজা বশীর যথার্থ সিদ্ধান্তই নিয়েছেন এবং অদূর ভবিষ্যতে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন, সমাজসচেতন প্রবীণ শিল্পী মূর্তজা বশীর-এর অনুরূপ সিদ্ধান্ত আরো অনেকেই নেবেন। ২৬-৩-২০০০।

www.pathagar.com

ধ্বংসের রাজনীতি এবং কপট বুদ্ধিজীবী

'সেদিন আমার মনে এই একান্ত কামনা জাগছিল যে, মহাত্মাজী নিজের চারদিকে দেশের বিচিত্র শক্তিকে আহ্বান করবেন দেশের বিচিত্র সেবার কাজে। কারণ দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য পূর্তকার্য, বাণিজ্য-এই কর্তব্যগুলিকে প্রবল বলে অকৃত্রিম নিষ্ঠার সঙ্গে চালনা করাই যথার্থ দেশকে লাভ করা, জয় করা। সকলে মিলে কেবল চরকায় সূতো কাটায় দেশ চিত্তের সম্পূর্ণ উদ্বোধন হ'তে পারেই না।'

সুপ্রিয় পাঠক, উপরের উদ্ধৃতিটুকু বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। আজ থেকে ৬১ বছর পূর্বে আমেরিকা ইউরোপ ভ্রমণকালে মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর যে অনুভূতি হয়েছিল সেই অনুভূতি ব্যক্ত করে তিনি প্রবাসী সম্পাদককে কথাগুলো লিখেছিলেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পূর্তকার্য এবং বাণিজ্য প্রভৃতি জনকল্যাণকর ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ না নিয়ে শুধু চরকা ঘুরিয়ে দেশ কিংবা দেশের মানুষের যে মন জয় করা যাবে না প্রকারান্তরে তিনি সেকথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের লক্ষ্মীছাড়া রাজনীতির এই বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের মত দেশহিতৈষী এবং জনকল্যাণকামী পণ্ডিতের বড়ই অভাব। যারা জাতির সঙ্কটকালে দিগ্‌দর্শন দিতে পারেন। তবে আত্মবিক্রীত, ধিকৃত এবং পরশ্রীকাতর পণ্ডিতদের অভাব নেই দেশে, যারা সঙ্কট এবং সন্ত্রাসকে উস্কে দিতে অদ্বিতীয়। যারা অসুস্থ রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে বিবৃতির পর বিবৃতি দিতে অতুলনীয়। আমাদের দেশের আত্মবিক্রীত এহেনো পণ্ডিতেরা যে কেবল চরকা ঘুরানোর পক্ষের-নির্লজ্জ সমর্থক তা বলাই বাহুল্য। এবং ধংসাত্মক রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ক্ষমতালিপ্সু রাজনীতিবিদদের 'ক্ষমতার চরকা' ঘুরানোর প্রতি সমর্থনদানই তাদের একমাত্র কাজ। তারা সাহস করে রবীন্দ্রনাথের মত বলতে পারেন না যে, চরকা ঘুরিয়ে দেশের এবং দশের কল্যাণ করা যায় না। তার সাথে দেশের সার্বিক উন্নয়নের দিগ্‌দর্শন থাকা চাই। বলতে পারেন না যে, ক্ষমতার চরকা ঘুরিয়ে ক্ষমতার পালা বদল এবং ক্ষমতার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গের উদর স্ফীত করা ছাড়া জাতীয় জীবনে সাধারণ মানুষের কোন কল্যাণ করা যায় না।

আজ বাংলাদেশে রক্তক্ষয়ী হানাহানির যে ধ্বংসাত্মক আন্দোলন চলছে এতে সাধারণ মানুষের কল্যাণ কোথায়? বাংলা একাডেমীর বই মেলার অনুষ্ঠান তথা একুশের অনুষ্ঠান না হলে শেখ হাসিনা কিংবা খালেদা জিয়া কে কতটা লাভবান হন জানি না। তবে জাতির এবং জনগণের যে বিরাট ক্ষতি একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

www.pathagar.com

অধ্যাপক জনাব মনসুর মুসাকে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক হবার কারণে পিটিয়ে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অল্পের জন্য তিনি প্রাণে বেঁচেছেন। বিভিন্ন স্থানে অনেককে লাঞ্ছিত করে দিগম্বর সাজিয়ে বাঙালির শত বছরের, হাজার বছরের শুভ্র সভ্যতার ঐতিহ্যকে কলংকিত করা হচ্ছে। অসভ্য বর্বর জাতি হিসেবে চিহ্নিত করে বাঙালি জাতির লালিত গৌরবকে ভূলুণ্ঠিত করা হচ্ছে। জানি না এতে উস্কানিদাতা বুদ্ধিজীবী, পণ্ডিত এবং রাজনীতিবিদরা নিজেদেরকে কতটা গৌরবান্বিত মনে করছেন। জানি না এর মধ্য দিয়ে তারা জাতিকে কিভাবে মহিমান্বিত করছেন। করছেন সুসংগঠিত ও সমৃদ্ধ। যে আন্দোলনে রাজনৈতিক দলগুলোর সুস্পষ্ট কর্মসূচি নেই, যে আন্দোলনে জাতীয় উন্নয়নের কোন ঘোষণা নেই, যে আন্দোলনে জাতির সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির কোনরূপ প্রস্তাবনা নেই, সেই আন্দোলন নিছক ক্ষমতালাভের আন্দোলন ছাড়া যে আর কিছু নয় তা শুধু দেশে নয় বিদেশের কাছেও সুস্পষ্ট হয়েছে। সম্প্রতি বিশ্বের পত্রপত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, 'বর্তমান সঙ্কটের প্রধান কারণ দু'নেত্রীর মধ্যে ঘৃণা ও শত্রুতা' (বাংলাবাজার পত্রিকা, ১৯/২/৯৬)। এই ঘৃণা এবং শত্রুতা যে ক্ষমতাকে কেন্দ্র করেই বেড়ে উঠেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিভিন্ন দলের পারস্পরিক ঘৃণা কিংবা শত্রুতার ক্ষেত্রে বাঙালি, বাংলাদেশী, স্বধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ, মুক্তিযোদ্ধা, রাজাকার, ঘাতক দালাল, পাকিস্তানের দালাল, ভারতের দালাল, মৈত্রী চুক্তি, গোলামী চুক্তি প্রভৃতি জনকল্যাণবিহীন কর্মকাণ্ডও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। সম্প্রতি শেষোক্ত বিষয় অর্থাৎ ভারত-বাংলাদেশের ২৫ বছর মেয়াদী চুক্তি নিয়ে আবার পত্রপত্রিকা এবং দু'নেত্রী, সোচ্চার হয়েছেন। যে বিষয় নিয়ে বিভিন্ন দল ও মহল বিগত ২৫ বছর যাবত বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত রয়েছে। এই চুক্তির পক্ষে-বিপক্ষে যেমন চুলচেরা বিশ্লেষণ হয়েছে তেমনি অবার বাড়াবাড়িও হয়েছে অনেক বেশি। বেড়েছে তিক্ততা। শেষ মুহূর্তে এসে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা বলছেন- তার দল ক্ষমতায় গেলে এ চুক্তি আর নবায়ন করবে না। বিএনপি প্রধান খালেদা জিয়া বলছেন- তার দল নির্বাচনে বিজয়ী হলে গোলামী চুক্তি নাবায়ন করবে না। চুক্তি যদি মৈত্রী চুক্তিই হবে তাহলে সেই চুক্তি নবায়ন না করবার ক্ষেত্রে শেখ হাসিনা এত উৎসাহী কেন? এই চুক্তি নবায়ন না করা হলে কিংবা নবায়ন করা হলে তাতে জনগণের কি লাভ কিংবা কি ক্ষতি তিনি তা বলেননি। বলেননি এই চুক্তির কারণে গত ২৫ বছরে দেশ ও জনগনের কি ক্ষতি হয়েছে। পক্ষান্তরে খালেদা জিয়াইবা মৈত্রী চুক্তিকে কেন গোলামী চুক্তি বলছেন তারও কোন ব্যখ্যা দেননি। একথা কোথাও স্পষ্ট করে বলেননি যে, শেখ মুজিব এবং ইন্দিরা গান্ধী স্বাক্ষরিত চুক্তিকেই গোলামী চুক্তি বলছেন নাকি গোলামী চুক্তি বলে প্রকৃতই কোন চুক্তি রয়েছে। বললে সমগ্র জাতি উপকৃত হতো। উপকৃত হতাম আমি নিজেও। কারণ আমার একটি প্রবন্ধে গোলামী চুক্তির কথা উল্লেখ করায় নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি আমি নিজেও । জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে তাই এই বিতর্কিত বিষয়ের সমাধান জরুরি মনে করি। কারণ জিয়াউর রহমান, এরশাদ এ বিষয়ে জাতিকে অন্ধকারে

www.pathagar.com

রেখে দিয়েছন। অন্ধকারে রেখেছেন শেখ মুজিবও।

শেখ মুজিব চেয়েছিলেন বাংলাদেশ প্রকৃতই একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বাধীন অস্তিত্ব নিয়ে সামনের দিকে সসম্মানে এগিয়ে যাক। কিন্তু ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নীতি নির্ধারক, শক্তিশালী আমলা গেষ্ঠী চেয়েছিল বাংলাদেশ সর্বক্ষেত্রেই ভারতের অনুগামী হোক। অর্থাৎ নিজের অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে ভারতের আজ্ঞাবহ দেশে পরিণত হোক। কিন্তু শেখ মুজিব তৎকালে লাহোর ইসলামি সম্মেলনে যোগদান করায় দিল্লি বেজায় নাখোশ হয়। করণ শেখ মুজিব স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করুক এটা দিল্লি চায়নি। অন্যদিকে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত রমনার মন্দিরটি পুনঃনির্মাণ সংক্রান্ত ইন্দিরা গান্ধীর আবেদনটি বঙ্গবন্ধুর সরকার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় দিল্লি অখুশি ছিল (তথ্য দেশ পত্রিকার)। ফলে বঙ্গবন্ধু 'জাতীয়তাবাদী' নীতি ও স্বাধীন সত্তার অনুসারী হওয়ায় ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন নীতি নির্ধারক ডি পি ধর, পররাষ্ট্র সচিব টি এন কল এবং গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর পরিচালক রমানাথ কাও মিলে মুজিবের বিরুদ্ধে একটি ব্লু-প্রিন্ট তৈরী করেন। যাতে উল্লেখ রয়েছে-ভাসানীর সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধু ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসাম নিয়ে একটি বাংলাভাষী বৃহৎ রাষ্ট্র গঠনের নেতৃত্ব দিতে পারেন। এই তথ্য সংবলিত ব্লু-প্রিন্ট মিসেস গান্ধীকে প্রভাবিত করে। ফলে তখন থেকেই প্রকৃতপক্ষে ভারত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিমাতাসুলভ আচরণ শুরু করে এবং পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে চাকমা ইস্যু, গঙ্গার পানি প্রদান বন্ধ, পুশইন এবং বাংলাদেশ বিরোধী আন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে থাকে। এ তথ্য পুরাতন হলেও ঢাকার একটি বহুল প্রচারিত দৈনিকে বিগত ৭/১০/৯৫ তারিখে সবিস্তারে প্রকাশিত হয়েছে।

উপরে উল্লিখিত তথ্যে শেখ মুজিবের সাহসী ও স্বাধীন ব্যক্তিত্বপূর্ণ চরিত্রের যে প্রকাশ ঘটেছে তাতে গোলামী চুক্তির কোন প্রভাব লক্ষ্য করা য়ায় না। তবে আওয়ামী লীগ সরকারের 'রক্ষী বাহিনী' গঠনকে অনেকেই গোলামী চুক্তির ফসল বলে চিহ্নিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। কারণ অপ্রকাশিত চুক্তির (যাকে গোলামী চুক্তি বলা হয়) প্রথম শর্তেই এর উল্লেখ রয়েছে। এই চুক্তির প্রথম শর্তে বলা হয়েছে যে, ভারতীয় সমরবিদদের তত্ত্বাবধানে আধাসামরিক বাহিনী গঠন করা হবে। গুরুত্বের দিক হতে এবং অস্ত্রশস্ত্রে ও সংখ্যায় এই বাহিনী বাংলাদেশের মূল সামরিক বাহিনী হতে বড় ও তাৎপর্যপূর্ণ হবে। এরপর পর্যায়ক্রমে বলা হয়েছে- ২. ভারত হতে সমরোপকরণ, অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করতে হবে এবং ভারতীয় সমরবিদদের পরামর্শানুযায়ী তা করতে হবে। ৩. ভারতীয় পরামর্শেই বাংলাদেশের বর্হিবানিজ্য কর্মসূচি নির্ধারণ করতে হবে। ৪. বাংলাদেশের বাৎসরিক ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ভারতীয় পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। ৫. বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতির অনুরূপ হতে হবে। ৬. ভারত-বাংলাদেশ চুক্তিগুলি ভারতের সম্মতি ব্যতীত বাতিল করা যবে না। ৭. ডিসেম্বরে পাক-ভারত যুদ্ধের পূর্বে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ভারতীয় বাহিনী যে কোন সময় যে কোন সংখ্যায় বাংলাদেশের

www.pathagar.com

অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারবে এবং বাধাদানকারী শক্তিকে চুরমার করে অগ্রসর হতে পারবে। এ জাতীয় আরও একটি অপ্রকাশিত গোপন চুক্তি রয়েছে বলে অনেকেই দাবি করে থাকেন। এই সমস্ত চুক্তির সন্ধান পাওয়া যায় পূর্ববাংলা সাম্যবাদী দল (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) এর মুখপত্রে 'গণশক্তি'তে । সন্ধান পাওয়া যাবে প্রবীন সাংবাদিক মাসুদুল হকের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' ও 'সিআইএ' নামক গ্রন্থে। যার শেষাংশে বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতা জনাব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী স্বাক্ষরিত যে সাক্ষাৎকার রয়েছে তাতে বলা হয়েছে 'প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার' নাকি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে একটি সাত দফা চুক্তি করে। এই চুক্তি ছিল বংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পরিপন্থি। ১৯৮৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর জনাব হুমায়ুন রশীদ এই সাক্ষাৎকার দেন বলে পত্রপত্রিকায় উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া তথ্য রয়েছে ফয়জুর রহমান সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'মুখপত্র' নামক পত্রিকাতেও (২৭/৮/১৯৭২)। তথ্য রয়েছে অলি আহাদ লিখিত 'জাতীয় রাজনীতি (১৯৪৫-১৯৭৫)' গ্রন্থেও। এই গ্রন্থে উল্লেখ আছে-প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ এবং তাঁর সরকার ভারতে অবস্থানকালে সাত দফা গোপন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন (পৃঃ ৫৩২)। জনাব হুমায়ুন রশীদ এর সাক্ষাৎকারে উল্লেখ রয়েছে যে, প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম গোপন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন এবং স্বাক্ষরের পরমুহূর্তেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সুতরাং উল্লেখিত বিভিন্ন তথ্যানুযায়ী একথা স্পষ্ট যে, ভারত বাংলাদেশের মধ্যে একটি নয়, দু'টি গোপন চুক্তি রয়েছে এবং এ সকল চুক্তি নিয়ে গত ২৫ বছর যাবত বিরূপ ও বিভ্রান্তিকর সমালোচনা হয়েছে। যাকে ভোটের পাল্লা ভারি করবার একটি অপকৌশল হিসেবে অনেকেই মন্তব্য করেছেন। মন্তব্য করেছেন আমাদেরই সুহৃদ এবং সহকর্মী অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক। তিনি গত ১১ ফেব্রুয়ারি '৯৬ বাংলাবাজার পত্রিকায় বলেছেন -'আমি বহুবার বলেছি এবং আবার বলছি, পঁচিশ বছরের গোলামী চুক্তি কথাটা একটা জঘন্য প্রতারণামূলক উক্তি মাত্র। কে বিশ্বাস করেছে এই প্রতারণামূলক উক্তিতে।' এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন সহকর্মী অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেনও। তিনি ১৪ ফেব্রুয়ারি '৯৬ তারিখে বাংলাবাজার পত্রিকায় লিখেছেন '..গোপন চুক্তির ধারাগুলো কি? পঁচিশ বছর ধরে গোপন চুক্তিটিকে প্রকাশ করা গেল না কেন? ..আমার মত সাধারণ কিন্তু অনুসন্ধিৎসু মানুষ খুবই কৃতজ্ঞ হতো, যদি প্রধানমন্ত্রী গোপন চুক্তিটি সর্বসমক্ষে উপস্থাপন করতেন।'

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন, জাতির সার্বিক কল্যাণের জন্যই বিষয়টির নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে জাতিকে বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি দেয়া অত্যন্ত জরুরি। অপনি যখন বার বার গোলামী চুক্তির বিষয়টি উত্থাপন করেছেন তখন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বিষয়টি সুস্পষ্টকরণের দায়িত্বও প্রধানত আপনারই। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত উপরে উল্লিখিত তথ্য সংবলিত চুক্তিই যদি গোলামী চুক্তি হয় এবং এই চুক্তিকেই যদি আপনি গোলামী চুক্তি হিসেবে উল্লেখ করে থেকে থাকেন তাহলে এর বাস্তবতা কিংবা বৈধতা সম্পর্কে জাতিকে অবহিত করা প্রয়োজন। যদি এর বাস্তবতা

www.pathagar.com

কিংবা বৈধতা না থেকে থাকে সে বিষয়েও সুস্পষ্ট ঘোষণা দেয়া প্রয়োজন। ঘোষণা দেয়া প্রয়োজন বিরোধী দলীয় নেত্রী এবং আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ হাসিনারও। ঘোষণা দেয়া প্রয়োজন, তিনি কেন মৈত্রী চুক্তি নবায়নের বিরুদ্ধে সে বিষয়ে। প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাব ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা যেমন ধর্মীয় বিধান, প্রতিবেশী দেশেসমূহের সঙ্গেও তেমনি সদ্ভাব ও বন্ধুসুলভ সম্পর্ক রাখাটাও জরুরি মনে করি। সদ্ভাব ও সম্পর্কোন্নয়নের ক্ষেত্রে মৈত্রী চুক্তি যদি সহায়ক হয়, উভয় দেশের জন্য পারস্পরিক শ্রদ্ধার হয়, সমমর্যাদাসম্পন্ন হয়, সর্বোপরি দেশ ও জনগণের জন্য কল্যাণকর হয় তাহলে সেই চুক্তি নাবায়নে এতো অনীহা কেন? ২৫-২-১৯৯৬।

www.pathagar.com

ধনোৎপাদন ও নারীর বহির্মুখীনতা

জন্মগতভাবে নারী এবং পুরুষের সম্পর্ক নিবিড়। এই কারণে তারা একে অপরের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ একের অভাবে অন্য অসম্পূর্ণ। অচল। সন্তান উৎপাদন, লালন-পালন, ঘর-সংসার, সংসারের আয় উন্নতি এবং সুখ-শান্তির সমস্ত কিছুই নির্ভর করে তাদের পারস্পরিক সুন্দর সম্পর্কের উপর। কিন্তু এই সুন্দর সম্পর্ক নির্ভর করে উভয়ের পরিকল্পনা, কর্ম সমন্বয়, সমঝোতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার উপর। সংসার জীবনে কে কোথায় কর্ম ব্যস্ত থাকবে, কে কি কাজ করবে, কতটুকু করবে, সবই নির্ভর করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বা অন্তর্দর্শীর উপর। গৃহাভিমুখীনতা কিংবা গৃহাসক্ততা স্বাভাবিক স্বভাব হলেও নারীর একটি বিরাট অংশ যে আদিকাল থেকেই বহির্মুখী ছিল তার প্রমাণ ইতিহাসে রয়েছে। জীবন এবং জীবিকার প্রয়োজনেই সে সময় নারীরা বহির্মুখী হয়েছিল এবং এখনও হচ্ছে। হচ্ছে ধনোৎপাদনের লক্ষ্যে। তবে নারীর মহির্মুখীনতা এবং ধনোৎপাদনে অংশ গ্রহণের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে স্বামীরূপী পুরুষের কর্মক্ষমতাহীনতা, অলসতা, কর্মবিমুখতা, এবং যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হওয়া। তবে এ ক্ষেত্রে শিক্ষারও যে একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে তাও লক্ষ্য করা গেছে। আমাদের উপমহাদেশের কিংবা অখণ্ড ভারতের দিকে দৃষ্টি ফেরালেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। শিক্ষা এবং ধনোৎপাদনের ক্ষেত্রে মুসলমান নারীরাও যে পিছিয়ে ছিলেননা তার প্রমাণ কুমারী লইতা নজমুদ্দীন এবং আমিনা খাতুন। কুমারী লইতা নজমুদ্দীন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীনীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন, এবং পরীক্ষায় তিনি যত নম্বর অর্জন করেছিলেন তার পূর্বে আর কেউ তত নম্বর অর্জন করতে সক্ষম হননি। অপর পক্ষে উকীল আব্দুস সালামের পত্নী আমেনা খাতুন যশোরের সাধারণ নির্বাচনে কমিশনার নির্বাচিত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে বাংলাদেশের ইতিহাসে তিনি প্রথম মহিলা কমিশনার। এছাড়া শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-সাহিত্য, সংগীতে হিন্দু সম্প্রদায়ের রমণীদের যারা বিশেষ অবদান রেখেছিলেন তাদের মধ্যে শ্রীমতি নীলিমা দত্ত, শ্রীমতি প্রভাময়ী, শ্রীমতি বিশিনী জাগাসিয়া, শ্রীমতি সীতাবাঈ, শ্রীমতি চন্দ্রাবর্তী লখনপাল-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসকল তথ্যসমূহ ১৩৪১ সাল অর্থাৎ ৬৬ বছর পূর্বে প্রকাশিত 'প্রবাসী' পত্রিকার।

শুধু শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই নয় ব্যবসা-বানিজ্য, চিকিৎসা, কল-কারখানা এবং ক্ষেত-খামারেও নারীরা পূর্ব থেকেই কর্মরত আছেন। উপ-জাতীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়

www.pathagar.com

এবং দরিদ্র পরিবারের নারীরা ক্ষেত খামারে পুরুষের পাশাপাশি, সমান তালে কাজ করে চলেছেন। মৃৎশিল্প নির্মাণের ক্ষেত্রেও নারীরা পুরুষের পাশাপাশি সমদক্ষতার পরিচয় দিয়ে আসছেন। বর্তমানে কর্মজীবী তথা ধনোৎপাদনে রত নারীর সংখ্যা বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের সর্বত্র বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে কল-কারখানা, অফিস আদালত, স্কুল কলেজ, পুলিশ প্রশাসনসহ প্রায় সর্বত্রই নারী ধনোৎপাদনে ব্যস্ত রয়েছেন। প্রয়োজনের তাগিদে তারা এসকল কর্ম ক্ষেত্র বেছে নিয়েছেন। তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার দিকে তাকালেও দেখা যাবে যে, সে দেশের নারীরা তখনই ধনোৎপাদনে বাধ্য হয়েছেন, কিংবা ধনোৎপাদনের অধিকার পেয়েছেন যখন পুরুষরা যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত থেকেছেন। সোভিয়েত রাশিয়াসহ পশ্চিমা দেশে নারী স্বাধীনতার কথা বলা হলেও প্রকৃত অর্থে নারীরা স্বাধীন ছিলেন না। এসকল দেশে বিশেষ করে সোভিয়েত রাশিয়ায় নারীদেরকে বিশ্বযুদ্ধই স্বাধীনতা দান করেছে। 'জার' এর আমলে নারী জাতিকে যে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হতো, নরীর প্রতি পুরুষেরা যে পাশবিক আচরণ করতো তার কোন পরিবর্তনই হতো না যদিনা পুরুষরা ধনোৎপাদনের পরিবর্তে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতো। সুতরাং নারী স্বাধীনতার ক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন যুদ্ধ যে নারীদের জন্য আশীর্বাদ ছিল সে কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তবে এ যুদ্ধ অবাধ যৌনাচারের জন্যও কম দায়ী নয়। যুদ্ধ যেমন নারীকে স্বাধীন করেছে তেমনি তাদের অবাধ যৌনাচারেরও সুযোগ করে দিয়েছে। কারণ যুদ্ধাবশান হলেও ধনের অধিকারী নারী কিংবা ধনোৎপাদনে সক্ষম নারী আর কখনো পুরুষের অধীনতা মেনে নেয়নি। কর্মক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি অবস্থান করতে গিয়ে তারা নিজেদেরকে পুরুষের সমকক্ষ ভেবেছেন এবং যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের পছন্দের পুরুষকে বেছে নিয়েছেন কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, এবং ইচ্ছেমত তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবার মত স্বাধীনতাও ভোগ করেছেন। এই অবাধ যৌনাচার এবং যৌনাচারজনীত কারণে সৃষ্ট উচ্ছৃঙ্খলতার হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে সরকার রাষ্ট্রীয়ভাবে অবাধ মেলামেশাকে সমর্থন দিয়েছে। আর একারণেই নারী পুরুষের অবাধ মেলা-মেশার ফসল শিশু সন্তানকে রাষ্ট্রীয়ভাবে লালন পালনের নিশ্চয়তা দিয়েছে। অপরপক্ষে সন্তানের জন্মদানের ক্ষেত্রে দায়ী নারী-পুরুষকে স্বামী-স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছে (প্রবাসী, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৪১, পৃ. ৪০৪)।

সোভিয়েত নারীদের অবাধ মেলামেশার ফলশ্রুতিতে গোড়ে ওঠা যৌনাচারের উচ্ছৃঙ্খলতাকে সরকারীভাবে সমর্থন দেবার কারণে, রাষ্ট্রনীতির ছদ্মাবরণে আড়াল করবার কারণে অবাধ যৌনাচারের বিষয়টি বিশ্ববাসীর নজরে প্রকটভাবে ধরা পড়েনি। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার সাথে সাথে নারীদের যৌনাচারের বিষয়টি বিশ্বময় দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়েছে। নারীদের পথে পথে প্রকাশ্যে খদ্দের সংগ্রহের সচিত্র প্রতিবেদন বিশ্ববাসিকে হতবাক করেছে। শুধু তাই নয় অবাধ যৌনাচারের কারণে সে দেশে জীবন সংহারক 'এইডস' যে মহামারী রূপ ধারণ করতে চলেছে সে সংবাদও বিশ্ববাসীকে শংকিত করেছে। অথচ জাপানের দিকে তাকালে দেখা

www.pathagar.com

যাবে সে দেশের নারীরাও বহুকাল পূর্ব থেকেই ধনোৎপাদনের উদ্দেশ্যে বহির্মুখী হয়েছেন। কিন্তু সামাজিক সম্পর্ক তথা পরিবারকে তারা অটুট রেখেছেন। পরিবারের আর্দশ ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ন রেখেছেন। তারা পিতৃকুল ও পতিকুল উভয়কেই সমান সম্মানের চোখে দেখেন। তাদের মত পিতৃভক্ত ও পতিব্রতা নারীর দৃষ্টান্ত বিরল। অথচ জাপানী কৃষক পরিবারের কুল বধুরা ক্ষেত খামারে গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করেন। জেলেনীরা সমুদ্রে ডুব দিয়ে মনি মুক্তা আহরণ করেন। মাছ ধরেন। জেলেনীদের এই সকল কর্মকাণ্ড শিল্পীর তুলিতে বাঙময় হয়ে উঠেছে। দু'শো বছর পূর্বে অংকিত এমন বহুচিত্র জাপানী রমণীদের ধনোৎপাদনের প্রমাণ বহণ করছে। কৃষিকাজ কিংবা মৎস শিকার ছাড়াও জাপানের নারীরা শিল্প, সাহিত্য, খেলাধুলা, কুস্তিসহ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পুরুষের পাশাপাশি কাজ করে আসছেন। এজন্য কোন ট্রেড ইউনিয়ন, এনজিও কিংবা নারী সংগঠনের আন্দোলনের প্রয়োজন হয়নি। বিভিন্ন দেশের নারীরা তাদের সামাজিক রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বিভিন্ন স্থানে কাজ করে যাচ্ছেন।

দরিদ্র এবং শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর হলেও প্রয়োজনের তাগিদে বাংলাদেশের নারীরাও ক্রমবর্ধমান হারে ধনোৎপাদনের লক্ষ্যে বহির্মুখী হচ্ছেন। সুযোগ পেলেই তারা বিভিন্ন কাজে জড়িয়ে পড়ছেন। সম্প্রতি গার্মেন্টস ব্যবসা নরীদের কাজ করবার ক্ষেত্র প্রসারিত করেছে। ফলে নারীরা সতঃস্ফুর্তভাবে সেই কাজে অংশগ্রহণ করছেন। আন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও এজন্য কোন ট্রেড ইউনিয়ন, এনজিও কিংবা কোন নারী সংগঠনের আন্দোলনের প্রয়োজন পড়ছেনা। বাংলাদেশের নারীরা রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক রীতি নীতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই এসকল কাজের মাধ্যমে ধনোৎপাদনে অংশগ্রহণ করছেন। অথচ বাংলাদেশের সমাজ, সংস্কৃতি, রীতি, নীতি, ও আদর্শ ঐতিহ্য বিরোধী বিভিন্ন দেশের অর্থে পরিচালিত ও প্রতিপালিত এক শ্রেণীর এনজিও ও তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার অবাধ যৌনাচারের নারী স্বাধীনতার অনুসারী এনজিও কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার লক্ষ্যে, কাম লালসাদি পূর্ণ করবার বাসনায় (যে বিষয়ে ইতিমধ্যে পত্র-পত্রিকায় খবর পরিবেশিত হয়েছে এবং হচ্ছে) দেশের পরম্পরাগত রীতি, নীতি, সংস্কৃতি ও ধর্মে বিশ্বাসী শান্তিকামী পরিবারগুলো ভেঙ্গে ফেলবার এক অশুভ প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছেন। তারা সুখী ও শান্তিপ্রিয় পরিরবারগুলো ভেঙ্গে দিতে প্রতিনীয়ত নব নব কৌশল অবলম্বন করছেন। পত্র পত্রিকায় গৃহবধুদের প্রলুব্ধ করবার বাসনায় প্রবন্ধ নিবন্ধ রচনা করছেন। গৃহাসক্ত গৃহিণীদের পর্যন্ত উস্কানীমূলক বক্তব্য দিয়ে বহির্মুখী করতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। আর এসব করবার সাহস পাচ্ছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং ক্ষমতাসীন সরকারের দুর্বল নীতির কারণে। কারণ দেশের সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলো এদের হাতে রেখে, এদের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় থাকতে চায়, কিংবা ক্ষমতায় যেতে চায়। ফলে এদের পরিচালিত এনজিওগুলো সরকারের মধ্যে সরকার রূপে আবির্ভূত হবার দুঃসাহস দেখায়। বাংলাদেশের নিজস্ব রীতি-নীতি, আদর্শ-ঐতিহ্য ও পরম্পরাগত

www.pathagar.com

সৌহার্দ সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রাখতে হলে গৃহাসক্ত তথা গৃহাভিমুখী এবং বহির্মুখী কর্মজীবী নারীসহ সকল নাগরিককে সোচ্চার কণ্ঠ হতে হবে। নারীর ধনোৎপাদনে বহির্মুখী হবার ক্ষেত্রে তথাকথিত রাশিয়ার অবাধ যৌনাচারে বিশ্বাসী অসৎ এনজিও কর্মকর্তাদের সমাজ বিধ্বংসী ভূমিকার যে কোন প্রয়োজন নেই মে দিবসে সে বিষয়ে জোর উচ্চারণ করতে হবে। ১০-৫-২০০০।

কর্মজীবী নারী

www.pathagar.com

চাঁদার ব্যাকরণ

আজ থেকে প্রায় বাইশ তেইশ বছর আগের কথা। তখন দেশের সর্বত্র নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যতা ছিল অবিশ্বাস্যরকমের। খুব সহজে কোন কিছু পাওয়া যেতনা। যাও বা পাওয়া যেত দুর্মূল্যের কারণে সে সমস্ত সামগ্রী সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরেই থেকেযেত। তখন অতি নগণ্য মূল্যের যে লবণ সেই লবণ বিক্রি হতো অবিশ্বাস্য উচ্চ মূল্যে। শুধু কি লবণ, শিশুর প্রাণ রক্ষাকারী দুধের টিনের জন্যে দীর্ঘ লাইনে ঘন্টার পর ঘন্টা নারী পুরুষদের অপেক্ষা করতে হতো। তখন যে যেভাবে পেরেছে দ'হাতে মুনাফা লুটেছে। সে সময় মানবতাবোধ ছিল নির্বাসিত। অসৎ ব্যবসায়ী মহল প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী মজুত করে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করতো। ইচ্ছেমত যখন তখন যে কোন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করে মুনাফা লুটের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠতো। যার ফলে দেশের সর্বত্র বহুমুখী সংকট ছিল বিরাজমান। ঠিক এমনি এক সংকটময় মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত। দেশের এরূপ বেহাল অবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনার হাল ধরে তিনি অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর যাবতীয় সৎকর্ম, সত্যানুসন্ধান এবং হিতোপদেশ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ায় তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন। জাতির সংকট উত্তরণে ব্যর্থতার সেই মুহূর্তে যে কারণে তিনি প্রায়শঃ বিভিন্ন সভা সমিতিতে বলতেন চোরায় না শোনে ধর্মের কাহিনী। এরূপ অবস্থায় দেশের এই অবক্ষয়জনীত পরিস্থিতির উৎস সন্ধানে উৎসাহী একশ্রেণীর মানুষ কতিপয় অসাধু রাজনীতিবিদকে দায়ী করে নানা কথা বলতেন। বলতেন এদের অনেকে এমনকি কোন কোন মন্ত্রী পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে দলীয় প্রয়োজনের কথা বলে ব্যবসায়ী মহলের কাছ থেকে নানা কৌশলে মোটা অংকের চাঁদা আদায় করতেন। এবং বিভিন্ন পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করে দেয় চাঁদা পুশিয়ে নিতে উপদেশ দিতেন। ব্যবসায়ী মহল বাধ্য হয়েই নাকি রাজনৈতিক দলের দাবিকৃত অর্থ প্রদান করতেন। এবং চাঁদা দেবার সুবাদেই সরকারের আর্শিবাদপুষ্ট ব্যবসায়ী সম্প্রদায় লাগামহীনভাবে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করতেন। এমনিভাবে প্রকৃত অর্থে লাভবান হতো রাজনৈতিক দল, দলীয় কর্মী এবং ব্যবসায়ী মহল। কিন্তু নিঃস্ব হতো দেশের না খেতে পাওয়া হাড্ডিসার সাধারণ মনুষগুলো। রাজনৈতিক দলকে চাঁদা দেবার বিনিময়ে ব্যবসায়ী মহলের ফুলে ফেঁপে ওঠা এবং সাধারণ মানুষদের শোষণের বিষয়টিকে তখন তেমন একটা আমল দেয়া হতো না। ভাবা হতো এসব প্রতিপক্ষ দুষ্টুলোকের অপপ্রচার। কিন্তু পরিতাপের বিষয়

www.pathagar.com

হচ্ছে যে, সেই দুষ্টলোকদের প্রচারণাকে এখন আর অপপ্রচার ভাবা যাচ্ছে না। কারণ এখন ব্যবসায়ী মহল নিজেরাই বলছেন তাঁরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতা-নেত্রীদের চাঁদা দিয়ে থাকেন। যে চাঁদা বা অর্থের জোরে বিভিন্ন দলীয় নেতা-কর্মীরা দেশের সর্বত্র শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। নির্বাচনের প্রাক্কালে অনেক প্রার্থী কলো টাকার জোরে ভোট ক্রয় করে থাকেন। নির্বাচনের সময় বুঝতে কারো অসুবিধা হয় না এদেশে কত সংখ্যক লোক লক্ষপতি, কোটিপতি হয়েছেন। চাঁদা ছাড়াও যে সীমাহীন অর্থ উপার্জনের আরও নানাবিধ অবৈধ পন্থা তাদের রয়েছে তা তাদের টাকা ছিটানোর প্রতিযোগিতা থেকেই অনুমান করা যায়। এদেশের একজন সর্বোচ্চ পদের চাকরিজীবীর যে বেতন তা দিয়ে সংসার পরিচালনার পর কোনক্রমেই তার পক্ষে এরূপ বিপুল অংকের টাকার মলিক হওয়া সম্ভব নয়। তাহলে কি করে একজন এমপি পদপ্রার্থী, যিনি আমাদের সামাজের আমাদেরই চার পাশে বেড়ে ওঠা সাধারণ মানুষ হয়েও এমন বেহিসেবী অগাধ টাকার মানুষে পরিণত হন? কি করে নির্বাচনের সময় লাখ লাখ টাকা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেন? এনিয়ে কেউ কখনও প্রশ্ন তোলেন না। না সরকার। না নির্বাচন কমিশন। বরং এই অবৈধ অর্থের উৎস সম্পর্কে জনগণের প্রশ্ন ও সন্দেহকে সীমিত পর্যায়ে রাখবার উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের খরচের জন্যে একটি নির্দিষ্ট অংকের সীমা নির্ধারণ করে দেন। লক্ষণীয় যে, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক যে অংকের টাকা বেঁধে দেয়া হয় তাও এত বেশি যে একজন সাধারণ সৎপথে উপার্জনকারী মানুষের পক্ষে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। আর এরই মধ্য দিয়ে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, দেশের সাম্প্রতিককালে নির্বাচন পদ্ধতিতে কারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে থাকেন। একথাটিও আর অস্পষ্ট থাকে না যে নির্বাচন যারা করেন তাদের অগাধ অর্থের মালিক হতে হয়। যা সাধারণ একজন প্রকৃত আপাদমস্তক সৎ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তিনি কালো টাকার পাহাড়ের মালিক হতে পারেননা। তাঁর সম্বল মাত্র সীমিত সামান্য অর্থ, সততা ও আদর্শ। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যার কোন মূল্য নেই। অসৎ মানুষের কাছে তো নেইই। নিরীহ সাধারণ মানুষের কাছেও তাদের কোন মূল্য নেই। তারাও আজ ঐ অসৎ মানুষের পেছনেই ছুটে যায়। কারণ তারাও আজকের সামাজিক প্রেক্ষাপটে একথাটি না মেনে পারছেনা যে, যদি তার কিছু পওয়ার সম্ভাবনা থাকে তা ঐ অসৎ মানুষটির কাছ থেকেই পাওয়া সম্ভব। নগদ কিছু দিলে তিনিই তা দিতে পারেন। যা একজন সৎ মানুষের পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। কারণ তার সততা ও আদর্শ ছাড়া দেবার মত আর কিছু নেই। একজন চোরাকারবারী, অসৎ কালো টাকার মালিক তার অবৈধ অগাধ অর্থ থেকে, মাদ্রাসা, মসজিদ ও সমাজ উন্নয়নে সামান্য অর্থ ব্যয় করলেই সকলে ধন্য ধন্য করে। ফুলের মালায় ভরিয়ে দেয় তাকে। জিন্দাবাদ ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে। আর সমাজের এসব নির্লজ্জ অবক্ষয় অবলোকন করে সমাজের সৎ মানুষগুলো লজ্জায় মাথা নত করে নিজেদের দুরে সরিয়ে নেন। চার দেয়ালের মাঝে নির্বাসন জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। সমাজের এই যে করুণ পরিণতি এর জন্য দায়ী কে? দায়ী সরকার, রাজনৈতিক দলসমূহ, নীতি নির্ধারকবৃন্দ, ব্যবসায়ী

www.pathagar.com

মহল এবং আমরা সকলে। দেশকে, সমাজকে এবং দেশের মানুষকে এই অবক্ষয় থেকে রক্ষা করতে হলে সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। আসতে হবে নির্ভেজাল উদার হৃদয় নিয়ে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার চাই, তত্ত্বাববধায়ক সরকার চাই, ভাঙ্গা রেকর্ডের এই বাজনা যদি অনাদিকাল ধরেও বাজতে থাকে তাতে কোন লাভ হবে না। কারণ তাতে নির্বাচন ছাড়া জাতীয় উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা নেই। নেই সমাজকে অবক্ষয়ের পংকিলতা থেকে উদ্ধার করবার কোন দিকদর্শন। সুতরাং নির্বাচনকে নিরপেক্ষ করবার যে দাবি তার সাথে সাথেই পংকিলতা থেকে সমাজকে উদ্ধার করবার এবং সংসদে সৎ শিক্ষিত ও নির্লোভ প্রকৃত দেশপ্রেমিকদের প্রতিনিধিত্ব করবারও সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। যাতে করে বার বার অসৎ রাজনৈতিক চালের চক্রে এ দেশের মানুষকে আর কোন বিপদে পড়তে না হয়।

বিপদে পড়লে ক্ষণিকের জন্যে হলেও শত্রুমিত্র এক হয়ে যায়। কেউ কারো ক্ষতি করে না। এইটি পরীক্ষিত সত্য। যেমন বর্তমানে একত্রিত হয়েছে পরস্পরের প্রতি খড়গ হস্ত আওয়ামী লীগ, জামায়াত, ও জাতীয় পার্টি। যারা বিপদ কেটে গেলে প্রত্যেকেই স্ব স্ব মূর্তি ধারণ করবে। শুধু সময়ের অপেক্ষামাত্র। আবার এও দেখা গেছে যে, ঝগড়া বিবাদে জড়িয়ে অনেকেই একে অপরের চৌদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করে হাঁড়ির খবর পর্যন্ত ফাঁস করে দেয়। এইটিও পরীক্ষিত সত্য। এমনি একটি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনে আমরা দুঃসহ বেদনাদায়ক মুহূর্ত অতিক্রম করে চলেছি। দেশের নেতা-নেত্রী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ঝগড়া বিবাদ ও মন কষাকষির মধ্য দিয়ে সেই হাঁড়ির খবরগুলো বেরিয়ে পড়ছে। মামলা মোকদ্দমা ও দুই নেত্রীর বিবাদের মধ্য দিয়ে এ সত্যটি প্রকাশ হয়েছে যে, যে সংবিধানকে নিয়ে আমাদের এত গর্ব, যে সংবিধান জাতির পবিত্র আমানত, সেই সংবিধানই পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক সংবিধান নয়। গণতন্ত্রে জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস বলা হলেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটি বাস্তব নয়। একথা সাধারণ মানুষ যেমন মর্মে মর্মে অনুধাবন করছেন তেমনি সমাজের সচেতন অনেকেই তাঁদের লিখনির মাধ্যমে তা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণাও করছেন। ফলে সাধারণ মানুষসহ শিক্ষিত অশিক্ষিত সর্বস্তরের সকলেই রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যকলাপে দিন দিন সন্দিহান হয়ে উঠছেন। এদিকে বিরোধী ত্রিদলীয় জোটের লাগাতার হরতাল, অবরোধ, ঘেরাও, মিছিল মিটিং-এ অতিষ্ঠ হয়ে দেশের ব্যবসায়ী মহল এখন প্রকাশ্যেই বলছেন যে, এরূপ রাজনৈতিক অস্থিরতা অব্যাহত থাকলে তারা কোন দলকে আর চাঁদা দেবে না। ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ থাকলে চাঁদা দেবে কোত্থেকে। ব্যবসায়ী মহলের বলিষ্ঠ এবং স্পষ্ট এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে একথাও আর জাতির কাছে অস্পষ্ট রইল না যে, তারা মোটা অংকের চাঁদা দিয়েই রাজনৈতিক দলগুলিকে বাঁচিয়ে রাখেন। সেই সাথে একথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বিভিন্ন দলকে চাঁদা প্রদানকারী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় দলীয় আশীর্বাদে তাদের ইচ্ছেমত দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দিয়ে সেই চাঁদার অংক পুশিয়ে নেয়। এই প্রদেয় চাঁদাই যে বিভিন্ন দ্রব্যে ভেজাল মিশ্রণেরও অন্যতম প্রধান কারণ তারও একটি সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। যে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী তার পুঁজির টাকাই উদ্ধার করতে পারে না তাকেও যদি চাঁদা দিতে হয় তাহলে তার পণ্যের সঙ্গে সস্তা পণ্যের

www.pathagar.com

ভেজাল মিশ্রণ দেয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকে কি? পরিবারের ভরণপোষণ এবং ব্যবসা টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনেই তাকে এরূপ অমানবিক অন্যায়ের আশ্রয় নিতে হয়। একেতো রাজনৈতিক চাঁদা, তার উপর সন্ত্রাসী ও পাড়ার মস্তানদের চাঁদা প্রদান। ব্যবসা চলে কিভাবে? কেউ কখনও খবর নিয়েছেন? কে নেবে খবর? কে করবে এর প্রতিকার? যে সর্ষে দিয়ে ভূত তাড়াবার কথা সেই সর্ষেতেই তো চাঁদা নামক ভূতের অবস্থান। যে কারণে গোটা দেশই আজ ভূতের রাজ্যে পরিণত হয়েছে। রাজ্যের সর্বস্তরের প্রশাসনে নিযুক্ত প্রায় সকল ব্যক্তির উপরই ভূতের আসর পড়েছে। মন্ত্রণালয়, এজি, রাজউক, বিদ্যুৎ, টেলিফোনসহ সর্বত্রই একই অবস্থা। পুশি প্রসাশনও এর ব্যতিক্রম নয়। চাঁদা আদায় ও অন্যান্য কারণে পুলিশেরতো দোষের কোন সীমা পরিসীমা নেই। অন্তত পত্রিকায় তাদের সম্পর্কে খবর পড়লে তাই মনে হয়। যেনো পুলিশ হওয়াটাই তাদের জন্য মহা অপরাধ। পুলিশ কি ভিন্ন গ্রহের মানুষ যে সৎ হবার গুরু দায়িত্ব শুধু তাদেরই। পুলিশকে অসৎ করে কারা? বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, দেশের সমাজপতি, ব্যবসায়ী এবং উর্ধতন ক্ষমতাশীন ব্যক্তিবর্গই তাদেরকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে গিয়ে অসৎ পথে পরিচালিত করে। আর এই সুযোগে সমাজের অসৎ চোর বাটপাড়রা পর্যন্ত পুলিশ সম্পর্কে নানা কটু কথা বলার সাহস অর্জন করে।

কারেন্ট জালে জাটকা মাছ ধরা এবং অথিতি পাখি শিকার আইনত নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও অবাধে জাটকা মাছ ও পাখি নিধন চলছে। আইন প্রণয়ণ ও আইন প্রয়োগকারী সকলের চোখের সামনেই তা চলছে। এবং এও যে ঐ চাঁদার বদৌলতেই চলছে তা বলাই বাহুল্য। দেশ পরিচালনার দায়িত্বে যারা নিযুক্ত থাকেন তারাই যখন চাঁদা নেন তখন তাদের চেলা চামুণ্ডরা চাঁদা না নেয় কি করে। তাদেরওতো মান বাঁচিয়ে বাঁচতে হবে। তাদেরও রঙিন টিভি, ভিসিআর, ও ডিসের অধিকারী হতে ইচ্ছে করে। সুতরাং চাঁদা ছাড়া উপায় কি?

চাঁদার বিষাক্ত ছোবলে গোটা দেশের সুস্থ সুন্দর চেহারা বেদনায় নীল রঙ ধারণ করেছে। যার প্রধান শিকার এ দেশের অগণিত নিরন্ন সাধারণ মানুষ। কারণ তাৎক্ষণিক ভাবে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় চাঁদা দিয়ে থাকলেও তারা মূলত কোনরূপ ক্ষতির সম্মুখীন হন না। কারণ তারা পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করে এবং ভেজাল মিশিয়ে তা পুশিয়ে নেন। বরং তাদের সেই চাঁদার খেসারত দিতে হয় সাধারণ হাড্ডিসার মনুষদেরকেই। যাদের দেখবার কেউ নেই। তারা হচ্ছে ক্রমান্বয়ে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর। আর এমনিভাবে এক পর্যায়ে যখন ক্রয়ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তখন অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে নানাবিধ পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এদের এই অমানবিক অবস্থা এবং অকাল মৃত্যুর জন্যে প্রকৃতপক্ষে সকল রাজনৈতিক দলই কমবেশি দায়ী। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই দায়ী দলগুলোই আবার এই মৃত এবং মৃতপ্রায় মানুষদের নিয়ে এর পরেও রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। মৃত লাশ নিয়েও চলে স্বার্থ হাসিলের নোংরা রাজনীতি। এমনই হীনমন্য ও নির্লজ্জ

www.pathagar.com

আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনের মানুষগুলো। এর মধ্যে ভালো মানুষ যে একেবারেই নেই তা নয়। আছে। কিন্তু তারা সংখ্যাগুরু অসৎ মানুষের চাপে নিস্তেজ হয়ে থাকেন। বলিষ্ট ভূমিকা পালন করবার ক্ষমতা তাদের থাকে না। অথবা তারা ইচ্ছে করেই তেমন কোন সাহসী ভূমিকা পালন করেন না। এই সুযোগে অসৎ ব্যবসায়ীরা বিষসম ভেজাল মিশ্রিত খাদ্য বাজারজাত এবং বিক্রি করলেও সরকার নামক যন্ত্রটি এবং রাজনৈতিক দলসমূহ নিশ্চুপ থাকে। এমনিভাবে দেশের সাধারণ মানুষের রক্ত চুষে তাদেরকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিলেও তাদের গায়ে বাতাস লাগে না। আর এ সবই প্রমাণ করে যে, প্রকৃত অর্থে সাধারণ মানুষের কল্যাণকামী কোন রাজনৈতিক দল আজও পর্যন্ত দেশে আত্মপ্রকাশ করেনি। কারা গড়বে সেই দল? কে নেবে সেই গুরু দায়িত্ব? দেশ, দেশের নিপীড়িত জনতা আজ সেই দল ও সেই নেতার অপেক্ষায় অধির আগ্রহে অপেক্ষা করছে। যে দল প্রকৃত অর্থেই হবে সাধারণ মানুষের কল্যাণকামী নির্ভেজাল গণতান্ত্রিক দল। ৩০-১-১৯৯৫।

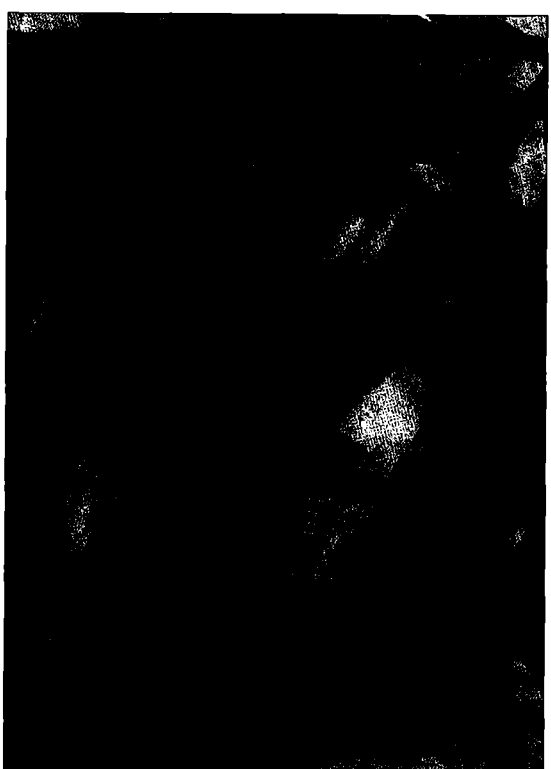

www.pathagar.com

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাই নকলবাজ ছাত্র তৈরির জন্যে দায়ী

পরীক্ষার্থীরা নকল করে কেন? এ প্রশ্নের সহজ উত্তর হচ্ছে- প্রশ্নপত্রে যেসকল উত্তর চাওয়া হয় সেসকল উত্তর জানা না থাকার কারণে। যদি আবারও প্রশ্ন করা হয়- পরীক্ষার্থীদের উত্তর জানা না থাকবার করণ কি? তাহলে কিন্তু এর উত্তর দেয়া সহজ হবেনা। কারণ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে দেশের রাজনীতি, রাজনীতির সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক , ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি, রাজনৈতিক দলগুলোর দালাল শিক্ষক এবং বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং অবশ্যই সাহসী হতে হবে। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য, শিক্ষা নীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষাদান প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি সজাগ এবং সন্ধানী দৃষ্টি রেখেই এর উত্তর দিতে হবে। তাহলেই কেবল পরীক্ষার্থীরা কেন নকল করে এবং কেন তাদের প্রশ্নের উত্তর জানা থাকে না তার যথার্থ উত্তর পাওয়া যাবে।

'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড' এই প্রবচনের কথাই ধরা যাক। এই প্রবচনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই প্রবচন বা উক্তির সঙ্গে শিক্ষার আদর্শ, উদ্দেশ্য ও প্রকৃতির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। পণ্ডিত ব্যক্তিদের ধারণা যে, শিক্ষা বা 'Education'শব্দটি ল্যাটিন শব্দ educare থেকে উদ্ভূত। কারণ শিক্ষাক্রিয়ার সৃজনমূলক বিষয়ের প্রতি এই ধারণাটিই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম। তাছাড়া educare-এর অর্থ হলো To bring up to rear, অর্থাৎ 'মানুষ করে তোলা'। এই বাক্যের সঙ্গে শিক্ষার যে মৌল উদ্দেশ্য, শিক্ষার যে তাৎপর্য, তার সঙ্গে মিল রয়েছে। অর্থাৎ দেশের নাগরিকদের মানুষ করবার উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয় শিক্ষা কার্যক্রম। আর সেজন্যেই সম্ভবত শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড বলা হয়ে থাকে। ফলে প্রায়ঃশই আমাদের দেশের কর্তা ব্যক্তিদেরকে বক্তৃতা বিবৃতি প্রদানের সময় উক্তিটি উচ্চারণ করতে শোনা যায়।

কিন্তু এই উক্তিটি বর্তমানে বাংলাদেশে অর্থহীন উক্তিতে পরিণত হয়েছে। কারণ শিক্ষার মৌল উদ্দেশ্যই আজ ভূলুণ্ঠিত। শিক্ষার উদ্দেশ্য এখন আর মানুষ করা নয়। উদ্দেশ্য অমানুষ করা। এই অমানুষ করবার প্রক্রিয়া প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিস্তৃত। ফলে সমগ্র জাতি আজ মেরুদণ্ডহীন, স্থবির এবং জরাগ্রস্ততার দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে।

শিক্ষা বিষয়ক যে সকল বিভাজন বা স্তর রয়েছে তার মধ্যে ভাববাদী শিক্ষার লক্ষ্য

www.pathagar.com

হচ্ছে-এর মধ্য দিয়ে মানব জাতির আধ্যাত্মিক সজ্ঞাগুলোকে যুক্তির দ্বারা সমর্থন করা। জড়বাদী শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে-সুখী জীবন যাপনের জন্যে প্রস্তুতির উপায় উদ্ভাবন করা। এই সুখী জীবন ব্যক্তির, সমাজের কিংবা ব্যক্তি ও সামাজ উভয়েরই হতে পারে। প্রকৃতিবাদী শিক্ষার প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য করলেও দেখা যাবে যে, এর ম্যাকডুগ্যাল পন্থীদের মতে শিক্ষার কাজ হচ্ছে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলোর সুপরিচালনা, পরিমার্জন এবং উদগতি সাধন। এবং ডারউইনপন্থীদের মতে, শিক্ষা হলো সেই প্রক্রিয়া যার সাহায্যে ব্যক্তি বা জাতি জীবন যুদ্ধের জন্যে যোগ্যভাবে প্রস্তুত হয়। আবার বস্তুবাদী শিক্ষার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রাকৃতিক ও সামাজিক জগতের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করাই হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য। একইভাবে দেখা যাবে মানবতাবাদী শিক্ষার প্রকৃতি হচ্ছে মুখ্যত বুদ্ধির চর্চার ব্যবস্থা এবং তার বিকাশের ব্যবস্থা করা। প্রয়োগবাদী দার্শনিক Dewey-এর মতে শিক্ষা হলো অভিজ্ঞতার সেই পুনর্গঠন যা অভিজ্ঞতার অর্থ বৃদ্ধি করে। কিন্তু দুঃখজন বাস্তবতা হচ্ছে শিক্ষার এ সকল আদর্শ উদ্দেশ্যের কোনকিছুই বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় নেই। যা আছে তা হচ্ছে- অস্থিতি, অসমতা, অসততা, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং বৈষম্য সৃষ্টির প্রবল প্রতিযোগিতা। দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আকাশ পাতাল বৈষম্য সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষার গোড়া থেকেই ব্রাহ্মণ এবং অস্পৃশ্য শূদ্রের জন্ম দেয়া হচ্ছে। অথচ শ্রেণী বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা যে একটি জাতির জন্যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ সে কথা বহুকাল পূর্বেই দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলে গেছেন।

এছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতিদিন ক্লাশে বিভিন্ন বিষয়ে পড়া, লেখা, বলা, শোনা সংক্রান্ত যে নিয়ম এবং ক, খ, গ, গ্রেডের মাধ্যমে নির্ধারিত স্বল্প সময়ের শ্রেণীকক্ষপূর্ণ ছাত্র ছাত্রীদের মূল্যায়ন করবার যে বিধান চালু করা হয়েছে তাও ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মান এবং ভিত বিনষ্ট করার পন্থা ছাড়া অর কিছু নয়। কারণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীর নাম ডাকা, তাদের প্রত্যেককে দিয়ে পড়ানো, বলানো, লেখানো এবং লিখিত খাতা মূল্যায়ন করা এবং এর রিপোর্ট প্রস্তুত করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় একজন শিক্ষকের পক্ষে মনোযোগ সহকারে শ্রেণীপূর্ণ ছাত্র-ছাত্রী পড়ানো সম্ভব হয় না। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ভিত অনিবার্য কারণেই বিনষ্ট হচ্ছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকদের অভিমত হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাস ফেল নির্বিশেষে সকল ছাত্র-ছাত্রীকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করার মাধ্যতামূলক যে বিধান রয়েছে সেই বিধান এবং খ ও গ পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ক পর্যায়ে উন্নীত করবার বিধানটিও সম্পূর্ণ অবাস্তব। এই অবাস্তব প্রক্রিয়ায় মেধা সৃষ্টি করা কিংবা মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না। এ সকল কারণে নানাবিধ অনিয়মের ফাঁকে গ্রামের ক্ষমতাধরদের তদবিরের কারণে অকৃতকার্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে উচ্চ বিদ্যালয়গুলোর জন্যে বিরাট সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে। এছাড়া ব্র্যাক পরিচালিত স্কুলে প্রথম,দ্বিতীয়, তৃতীয় এরূপ কোন

www.pathagar.com

শ্রেণী শিক্ষা পদ্ধতি নেই। এ সকল স্কুল থেকে ৩ বছর মেয়াদী শিক্ষার সনদপত্র নিয়ে, ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে থাকে। শ্রেণী শিক্ষা পদ্ধতি না থাকায় ব্র্যাক-এর স্কুল থেকে পাস করা ছাত্র ছাত্রীরা বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর যোগ্যতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়ে থাকে। শিক্ষায় নিম্ন মানসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে ব্র্যাকের ছাত্র-ছাত্রীরা উপবৃত্তি লাভের বাসনায় অসৎ উপায়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পর্যন্ত ভর্তি হয়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ৪র্থ শ্রেণীতে নামিয়ে দেয়া হয়েছে অযোগ্যতার কারণে এমন নজিরও রয়েছে। এই সকল ছাত্র-ছাত্রীদের শতকরা ৩৩ জন গম পেয়ে থাকে, কিন্তু গম পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হলে শতকরা ৮৫ দিন ক্লাশে উপস্থিত থাকতে হয়। অথচ অনেকেরই উপস্থিতির এই হার থাকে না। এক্ষেত্রে এলাকার টাউট, বাটপার এবং প্রভাবশালীদের তদবিরের কারণে অযোগ্য ছাত্রছাত্রীদেরকে গম দেয়ার লক্ষ্যে খাতায় গোঁজামিল দিতে হয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্কুলের শিক্ষকদেরকে বাধ্য হয়ে এই অন্যায় কাজ কতে হয়।

অন্যায় কাজ শুধু গম দেয়ার ক্ষেত্রেই নয়, আরও অনেক ক্ষেত্রে অন্যায় করতে হয় শিক্ষকদেরকে। যেমন প্রতিদিন ক্লাশে গিয়েই ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির যে হিসেব বোর্ডে লিখতে হয় তাতে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। অর্থাৎ ৩৫% ছাত্র-ছাত্রী ক্লাশে উপস্থিত থাকলেও তার চেয়ে অধিক হারে ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত আছে বলে গোঁজামিলের চার্ট তৈরি করতে হয়। নাহলে কেন ছাত্র-ছাত্রী যথেষ্ট সংখ্যক উপস্থিত হয়নি তার জন্যে শিক্ষকদেরকে উপর মহলে কৈফিয়ত দিতে হয়। শুধু তাই নয় চাকরির ক্ষেত্রেও সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়। এখানেই শেষ নয়। ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাশে উপস্থিতির হিসেবসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষকদেরকে হিসেব রাখতে ৪৪ টি খাতা ব্যবহার করতে হয়। প্রধান শিক্ষককে প্রতি মাসে ১, ৫, ৭, এবং ১১ তারিখে চারটি মিটিং ডাকতে হয়। প্রথম সভার সভাপতি থাকেন সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার। সভায় উপস্থিত থাকেন নির্দিষ্ট সংখ্যক স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণ। দ্বিতীয় সভার সভাপতি থাকেন-ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য। এ সভাতে উপস্থিত থাকেন ওয়ার্ডের প্রধান শিক্ষকগণ। তৃতীয় সভায় উপস্থিত থাকেন প্রতি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এবং প্রতি ওয়ার্ডের শিক্ষক প্রতিনিধি। চতুর্থ সভার নাম 'মাসিক সমন্বয় সভা'। সভা অনুষ্ঠিত হয় থানা হেড কোয়ার্টারে। সভার সভাপতি হন থানা শিক্ষা অফিসার। সভায় উপস্থিত থাকেন সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার এবং সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণ। এছাড়াও ২মাস পর পর অনুষ্ঠিত হয় সাব ক্লাস্টার ট্রেনিং। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্যে এই ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। ট্রেনিং দানের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে থাকেন ATO (সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার), TO (থানা শিক্ষা অফিসার), DPO (জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার)। TO এবং DPO কালে ভদ্রে ট্রেনিংদানের ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকেন। এসকল অফিসারবৃন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে কিভাবে শিক্ষা দিতে হবে সে বিষয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে শিক্ষা দিয়ে

www.pathagar.com

থাকেন। শিক্ষকদের উপর অর্পিত দায়িত্ব শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। তাদের দায়িত্ব আরও আছে। প্রতিমাসে প্রথম তারিখে যে সকল বিষয়ে প্রতিবেদন জমা দিতে হয় তার মধ্যে স্যানিটেশন প্রতিবেদন, বৃক্ষরোপণ প্রতিবেদন, মা সমাবেশ, উঠান বৈঠক প্রভৃতির প্রতিবেদন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া পূর্বে উল্লিখিত প্রতিমাসের ১১ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় জমা দিতে হয় ক. রিটার্ন ফরম, খ. বেতন প্রাপ্তির রাশিদ. গ. ম্যানেজিং কমিটির রেজুলেশন, ঘ. শিক্ষক অভিভাবক কমিটির রেজুলেশন প্রভৃতি। বছর শেষে বার্ষিক প্রতিবেদন এবং জুন মাসে অর্থ বছরের হিসেবও জমা দিতে হয়। ছাত্র ছাত্রী কেন বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকলো সে বিষয়েও শিক্ষকদেরকে ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রতিবেদন প্রস্তুত করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ জানিয়েছেন যে, বছরের বিভিন্ন সময় দরিদ্র ছাত্র বিশেষ করে গ্রামের দরিদ্র পিতার দরিদ্র ছাত্র পিতাকে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য দানের লক্ষ্যে ক্ষেত খামারে কাজ করে থাকে। এমনকি রিক্সাও চালিয়ে থাকে। তাগাদা দিলেও এদেরকে বিদ্যালয়ে হাজির করানো যায় না। অথচ ছাত্রদের এই গড় হাজিরার দায় শিক্ষকদেরকে বহন করতে হয়। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট এর জন্যে জবাবদিহি করতে হয়। বিভিন্ন কারণে শিক্ষকবৃন্দকে যে কি পরিমাণ ভীত সন্ত্রস্ত থাকতে হয় দিরাই থানার রফিনগর ইউনিয়নের বাসাখরচ হাজী আবাল হোসেন রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি ঘটনাই তার প্রমাণ বহন করছে। ১৯৯৯ সালের ২৯ আগষ্ট দিরাই থানার সহকারী শিক্ষা অফিসার উক্ত বিদ্যালয়ে গিয়ে উড্ডীয়মান জাতীয় পতাকা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ছিড়ে ফেলতে বাধ্য করলে এলাকার শিক্ষকদের সঙ্গে অফিসারদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। পরবর্তী পর্যায়ে (১২ সেপ্টেম্বর তারিখে) মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থিত ৫৫০ জন শিক্ষক শিক্ষিকাকে থানা শিক্ষা কর্মকর্তা অশালীন ভাষায় গালাগাল দেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তারা যে দুর্নীতিপরায়ণ সে বিষয়টিও ফাঁস হয়ে যায় (বাংলাবাজার পত্রিকা, (১/১০/৯৯)। সুতরাং শিক্ষা অফিসারদের দুর্নীতি এবং হম্বিতম্বীর কারণে বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ খাতাপত্রের প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ কাজেই প্রায় পুরো সময় ব্যয় করে থাকেন। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদানের বিষয়ে সময় অভাবে মনোযোগ দিতে পারেন না। পরিণতিতে শিক্ষার মান দ্রুততর গতিতে নিম্নগামী হচ্ছে। এভাবে শিক্ষার মান যে কতটা আশংকাজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে একটি উদারহরণ দিলেই তা স্পষ্ট হবে। ১৯৯৮ সালের হিসেব অনুযায়ী একটি থানার ৮৬টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৩৬টি বিদ্যালয়ের বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী একজন ছাত্রছাত্রীও পাস করতে পারেনি। আর ১০০% পাস করেছে মাত্র ১টি বিদ্যালয়ের বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। বাদবাকি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কেউ পাস করেছে; কেউ করেনি। উল্লেখ্য যে, বিদ্যালয়ের সবচেয়ে মেধাবী ২০ জন করে ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তি পরীক্ষায় আংশগ্রহণ করে থাকে। সুতরাং ৩৬টি বিদ্যালয়ের সবচেয়ে মেধাবী ৭৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে একজনও যখন পাস

www.pathagar.com

করতে পারেনা তখন দেশের শিক্ষার সার্বিক মান কোন পর্যায়ে নেমে গেছে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

শিক্ষার মান আশংকাজনক পর্যায়ে নেমে যাবার ক্ষেত্রে আরও যে সকল বিষয় দায়ী তার মধ্যে বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষকদের প্রাধান্য, শিক্ষকদের দলাদলি এবং রাজনৈতিক নিয়োগদান অন্যতম। ভুক্তভোগী এবং বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষকদের অনেকেই বলেছেন যে, বিষয়টি স্পর্শকাতর হলেও সত্য যে, বিদ্যালয়ে অধিক হারে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ শিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করছে। যেমন কোন বিদ্যালয়ে এক বা একাধিক শিক্ষয়িত্রীর মেটারনিটি ছুটির প্রয়োজন হলে সেই সময়টিতে সমস্যা হয়ে থাকে। এছাড়া অনেকের বাসায় বাচ্চা লালন পালনের কিংবা দেখাশোনার কোন লোক থাকে না বলে অনেক মহিলা শিক্ষক সদ্যজাত কিংবা মাস কয়েক হয়েছে এমন শিশুদেরকে সঙ্গে করে বিদ্যালয়ে পড়াতে যান। কোন কোন ক্ষেত্রে বাচ্চাকে পড়ানোর টেবিলে শুইয়ে রেখে ছাত্র পড়ান। এমতাবস্থায় বাচ্চা কান্নাকাটি করলে পড়ানো বাদ দিয়ে শিক্ষক বাচ্চা থামানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এভাবে পড়াতে গেলে ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ার ক্ষেত্রে অমনোযোগী হয়ে পড়ে। তাছাড়া ক্লাশের সময় বাদ দিলে অন্য কোন সময় বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় কাজেও তারা সময় দিতে পারেন না। কারণ বাড়ি যাবার জন্যে সবাই উদগ্রীব হয়ে পড়েন। এ সকল সমস্যার ক্ষেত্রে স্কুল পরিদর্শকরাও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন না। কারণ সেক্ষেত্রে তারা রাজনৈতিক প্রভাব খাটান, কিংবা পরিদর্শকদের বিরুদ্ধে অসৌজন্য আচরণের অভিযোগ এনে তাদেরকে হেনস্থা করবার ভয় দেখান। শিক্ষকরাও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন না একই কারণে। সুতরাং যে যার মত গা বাঁচিয়ে চলেন। এভাবে সবাই সবার গা বাঁচাতে পারলেও শিক্ষাকে কিন্তু কেউই বাঁচাতে পারছেনা। শিক্ষার মান শূন্যের দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে।

শূন্যের দিকে ধাবমান শিক্ষার মানের জন্যে শিক্ষকদের দলাদলিও কম দায়ী নয়। একসময় ছিল যখন শিক্ষক সম্প্রদায় রাজনীতিকে ভীষণ ভয় করতেন বা এড়িয়ে যেতেন। যদি প্রমাণিত হতো যে কোন শিক্ষক কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য কিংবা দলের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত তাহলে সেই শিক্ষক চাকরি হারাতেন। কর্তৃপক্ষ কিংবা প্রতিপক্ষ অনেক ক্ষেত্রে রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও সম্পর্ক জুড়ে দেবার মাধ্যমে অপছন্দের অনেক শিক্ষককে হয়রানী করতেন। বর্তমানে অবস্থা হয়েছে ঠিক তার উল্টো। এখন যিনি রাজনীতির সঙ্গে বিশেষ করে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যত বেশি গভীরভাবে যুক্ত থাকেন তিনি তত বেশি ক্ষমতাশালী শিক্ষক হিসেবে সবার নমস্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তার দাপটে বরং যারা রাজনীতি করেন না কিংবা অন্য দল করেন তারা সব সময় ভয়ে ভীত থাকেন। কখন না তাদেরকে কোন বিপদে জড়িয়ে ফেলেন। শিক্ষকদের এই দলাদলি শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয়েই নয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়েও ভয়াবহরূপে বিরাজ করছে। এ সকল স্থানে শিক্ষক এবং ছাত্র সকলেই রাজনীতি করেন। যারা রাজনীতি

www.pathagar.com

করেন না তাদেরকে রাজনীতি করতে বাধ করা হয় নানা কৌশলে। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলে তো কথাই নেই। সেখানে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করতে হয়। না হলে গোপন রিপোর্টের ভয় থাকে। কারণ কর্তারা সব সময়ই ক্ষমতাসীনদের অনুগত থাকেন। আর ক্ষমতাসীনরাই তাদেরকে নিয়োগ দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই ধরা যাক। এসকল স্থানে তাদেরকেই উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় যারা সবার চেয়ে দলের প্রতি অধিক অনুগত হয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে যে শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশেষ বিবেচিত হয় না এবং স্বজন ও স্বদলের ছাত্র-ছাত্রীদের কিভাবে অন্যায় সুযোগ-সুবিধা অনুগত কর্তারা দিয়ে থাকেন তা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীই প্রমাণ করছে। রাজনৈতিক দলের প্রধান নেতা-নেত্রী এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তা ব্যক্তিদের পরোক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষ নির্দেশে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী বছরব্যাপী দলীয় কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকে; মিটিং মিছিল, শ্লোগানে রাজপথেই সময় কাটায় তাদেরকে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ করে পরীক্ষার সময় অসৎ পথ অবলম্বনের সুযোগ দিতেই হয়। দিতে না চাইলেও দলীয় প্রভাব খাটিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা আদায় করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের জন্যে গোপন কক্ষে পরীক্ষার বিশেষ ব্যবস্থাও যে গ্রহণ করা হয়ে থাকে সে বিষয়ে পত্র পত্রিকায় ফলাও করে খবর পরিবেশন করতে দেখা গেছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পরীক্ষায় নকল বিষয়ক যে সকল সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছে এবং নকলের ক্ষেত্রে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অভিভাবকরা যেভাবে অংশগ্রহণ করছেন তাতে কি একথা মনে করবার সঙ্গত কোন কারণ থাকে যে, দেশে প্রকৃত অর্থে কোন শিক্ষা ব্যবস্থা আছে? কিংবা শিক্ষার মান আছে? নেই। থাকতে পারে না। যে দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক দলের প্রভাবে অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়, যে দেশে অর্থের (ঘুষ) বিনিময়ে অপদার্থ ব্যক্তিকে চাকরি দেয়া হয়, যে দেশে একাধিক তৃতীয় বিভগধারী উপাচার্যের পক্ষে শিক্ষামন্ত্রী সাফাই গান এবং তিনিই এদেশের সবচেয়ে যোগ্য প্রার্থী বলে প্রচার করতে লজ্জাবোধ করেন না, যে দেশে ছাত্র-শিক্ষকদেরকে রাজনীতি করবার অবাধ অধিকার দেয়া হয়, সে দেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে কোনরূপ শৃংখলা কিংবা শিক্ষার মান থাকতে পারে না। এ সকল বিষয়কে বিবেচনায় না এনে যারা নকল রোধ এবং শিক্ষার মান উন্নয়নের কথা বলেন, পত্রপত্রিকায় লেখেন তারা প্রকৃত অর্থে ভণ্ড। তারা প্রতারক। নকল প্রতিরোধ করতে হলে, শিক্ষার মান বাড়াতে হলে, শিক্ষার সর্বস্তরে প্রহসনমূলক অযৌক্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে এবং প্রহসনমূলক, অযৌক্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তক এবং সমর্থকদের নিষ্ক্রিয় তথা বন্ধ্যাকরণ করতে হবে। অন্যথায় শিক্ষা এবং জাতির সর্বনাশ অনিবার্য। ১১-৪-২০০১।

www.pathagar.com

ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি শিক্ষার অন্তরায়

দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থনপুষ্ট ছাত্র সংগঠনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলোতে পড়ালেখার পরিবেশ বিনষ্ট করে কি পরিমাণ ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে সে বিষয়ে গত ১৬/৪/৯৮ তারিখে 'অমানবিক দুটি প্রসঙ্গ' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ এই পত্রিকাতেই লিখেছিলাম। প্রবন্ধে একথাও উল্লেখ করেছিলাম যে, ছাত্র সংগঠনগুলোর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কোন কোন পর্যায়ে তরতাজা ছাত্র, যুবকের লাশ পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গনে এবং তাদের বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র মাটি। লেখাটি প্রকাশিত হতে না হতেই মাত্র সাতদিনের মাথায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবারও ভয়াবহ বন্দুকযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং এই বন্দুকযুদ্ধের কারণে লাশ পড়েছে আরও একজন ছাত্রের।

ছাত্রলীগ এবং ছাত্রদলের বন্দুকযুদ্ধে ছাত্রলীগ (শাপা) কেন্দ্রীয় নেতা পার্থপ্রতিম আচার্যের বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গন। অপ্রত্যাশিতভাবে মা-বাবার বুক খালি করে পার্থ বিদায় নিয়েছে এই নিষ্ঠুর সমাজ থেকে। সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর একরাশ ভালবাসা এবং সীমাহীন স্বপ্নকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে পার্থ অসময়ে চলে গেছে সকলের ধরাছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু কেন তাকে এভাবে চলে যেতে হলো? শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে তার তো মা-বাবা, স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে সুখের নীড় রচনা করবার কথা। কেন সেই নীড় রচনা করা তার পক্ষে সম্ভব হলো না? কেন অকালে তার রক্ত ঝড়লো বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে? কে তাকে বাধ্য করলো সম্মুখ সমরে যেতে? কারা তাকে উদ্বুদ্ধ করলো বুকের রক্ত ঢেলে দিতে? কারা তাকে হত্যা করলো? এসকল প্রশ্নের উত্তর সবার জানা। সবার জানা যে, যারা পার্থকে আত্মাহুতি দিতে বাধ্য করেছে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ নয়, তারা রাজনৈতিক দলের স্বার্থ রক্ষাকারী দানব বিশেষ। এই দানবীয় শক্তি দেশের অগণিত মেধাবী ছাত্রের রক্ত শুষে নিয়েছে। এই দানবীয় শক্তিই কোমলমতি ছাত্রদের হাতে মারণাস্ত্র তুলে দিয়ে তাদেরকে দুঃসাহসী করেছে। বিভিন্নভাবে লোভ দেখিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তাদেরকে বেপরোয়া করেছে। করেছে চাঁদাবাজ, টেণ্ডারবাজ। ফলশ্রুতিতে অনেক ছাত্র টাকার পাহাড় গড়েছে। ক্ষমতা এবং টাকার গরমে ছাত্ররা ধরাকে শরা জ্ঞান করেছে। তারা শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করতেও ভুলে গেছে। রাজনৈতিক খুঁটির জোরে শিক্ষকদের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করতে সাহস করছে। শিক্ষকদেরকে আক্রমণ

www.pathagar.com

করছে। অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করছে। বন্দুক-পিস্তলের ভয় দেখাতেও কসুর করছে না। কিন্তু এদের সংখ্যা নিতান্তই হাতে গোনা। এই কায়েকজনই শত-সহস্রজনের ক্ষমতা রাখে। এই কয়েকজনের দাপটেই গোটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জিম্মি হয়ে থাকে। এরাই নিরীহ সাধরণ ছাত্রদের মিছিল-মিটিংয়ে কিংবা সম্মুখ সমরে যেতে বাধ্য করে। গোলাগুলিতে অংশ নেয়। মিছিলে না গেলে বা গোলাগুলি না করলে হলে তাদের সিট থাকে না। বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কলেজে তারা শান্তিতে থাকতে পারে না। হল দখলের রাজনীতির এটাই বড় সুবিধা। কারণ হল যাদের দখলে থাকে সকল ছাত্রছাত্রীও তাদের কথামত চলে। সকল ছাত্রছাত্রী তাদের দলীয় ছাত্রছাত্রীতে পরিণত হয়। সাম্প্রতিক সময়গুলোতে এই ধারাই অব্যাহত আছে। কিন্তু এই রাজনৈতিক প্রক্রিয়া কিভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্রমান্বয়ে ধ্বংস করে ফেলছে তা ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারকারী দানবীয় শক্তিধররা একবারও ভেবে দেখে না। বরং বিজয়ের আনন্দে আত্মহারা হয়ে উল্লাস করে থাকে।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্থপ্রতিম আচার্যের হত্যাকাণ্ডের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অবনতি ঘটেছে তার কোন সুরাহা না হতেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও ঘটে গেছে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। গত ২৬/৪/৯৮ সকাল সাড়ে ন'টা থেকেই পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে অমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলাম। চারজন শিক্ষক মিলে সম্মান ২য় বর্ষের মৌখিক পরীক্ষা নিতে সবে শুরু করেছি। এমন সময় পরীক্ষা কক্ষের পার্শ্ববর্তী এলাকাতেই শুরু হলো ছাত্র সংঘর্ষ। গোলাগুলির শব্দে পুরো এলাকা প্রকম্পিত হলো। ছাত্রছাত্রীরা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছোটাছুটি শুরু করলো। পরীক্ষার্থীরা থাকবে না পালাবে এমন এক সমস্যার মধ্যে পড়ায় বিভাগীয় ডীন পরীক্ষা চলবে বলে তাদেরকে আশ্বস্ত করলেন। কিন্তু বিবাদমান দল দু'টির ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, মিছিল স্লোগান ও গোলাগুলির কারণে পরীক্ষার কার্যক্রম বারবার বিঘ্নিত হচ্ছিল। শিক্ষকবৃন্দ আতংকিত হয়ে বার বার জানালা দিয়ে অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে পরিস্থিতি লক্ষ্য করছিলেন। পরীক্ষা শেষে আমরা যখন শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হই তখন ক্যাম্পাস পুরোপুরি শূন্য। কোথাও কোন ছাত্রছাত্রী কিংবা শিক্ষকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়নি। এরপর ২৯/৪/৯৮ তারিখ পুনরায় ছাত্রলীগ এবং ছাত্র শিবিরের সংঘর্ষের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। দু'দিনের সংঘর্ষ কোন ছাত্র নিহত না হলেও বুলেটবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয়েছে অনেকেই। পত্র-পত্রিকার তথ্যে জানা গেছে, সংঘর্ষ শেষে ছাত্রলীগ শিবিরের দুটি হল দখল করে নিয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হলও এখন ছাত্রলীগের দখলে। ফলে ছাত্রদল আহূত ধর্মঘটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কার্যত অচল হয়ে ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংঘটিত সংঘর্ষের জন্য এবং পার্থ প্রতিম আচার্যের হত্যাকাণ্ডের জন্য ছাত্রলীগ এবং ছাত্রদল পরস্পর পরস্পরকে দায়ী করেছে। সরকার পক্ষের প্রচার মাধ্যম পার্থের হত্যার জন্য ছাত্রদলকে দায়ী করেছে এবং বিরোধী বিএনপি দলের পক্ষের প্রচার মাধ্যম ছাত্রলীগকে দায়ী করেছে। এই সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে একটি গাভীও মৃর্ত্যুবরণ করেছে। কিন্তু কেউ এবিষয়ে কোন

www.pathagar.com

প্রশ্ন তোলেনি। গাভীটি ছাত্রলীগ কিংবা ছাত্রদলের ছিল কিনা এ বিষয়ে কেউ কোন কথা বলেনি। গাভীটি যদি ছাত্রদলের সদস্য হয়ে থাকে তাহলে ছাত্রলীগ তাকে হত্যা করেছে। কিংবা যদি ছাত্রলীগের সদস্য হয়ে থাকে তাহলে ছাত্রদল হত্যা করেছে এমনটিই ভাবা স্বাভাবিক। কিন্তু গাভী কোন দলেরই ছিল না। তাহলে গাভীটি মারা গেল কেন? কারা তাকে হত্যা করলো?

যারা গাভীকে হত্যা করলো, যারা পার্থ প্রতিম আচার্যের মত উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ছাত্রকে হত্যা করলো তাদেরকে চিহ্নিত করা সম্ভ হবে কিনা জানি না। চিহ্নিত করা সম্ভব হলেও তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া যাবে কিনা তাও জানি না । তবে একথা নিশ্চিতভাবেই জানি যে, পার্থ প্রতিম আর ফিরে আসবে না। তার বাবা-মা ফিরে পাবে না হৃদয়ের টুকরোসম সন্তান পার্থকে। প্রিয়তমা স্ত্রী ফিরে পাবে না জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ জীবনসঙ্গী পার্থ প্রতিমকে। দিন কয়েক পার্থ প্রতিমকে নিয়ে শোকসভা, আলোচনা সমালোচনা হবে এবং এক সময় সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে। হয়তো অতীতের অন্যান্য ঘটনার মত এই ঘটনারও কোন বিচার হবে না। কারণ বিচার করতে হলে তো তাদেরই বিচার সর্বাগ্রে করতে হবে যারা কোমলমতি ছাত্রদের হাতে বন্দুক, পিস্তল তুলে দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লুটবার জন্য তাদেরকে ব্যবহার করছে। বিচার করতে হবে তাদের যারা জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে দলীয় স্বার্থ রক্ষায় ছাত্রদের বিপথগামী করছে, সেই সকল রাজনৈতিক দলের নেতা, নেত্রী, কর্মী, সমর্থক এবং দলবাজ শিক্ষকদের । কারণ তারাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য দায়ী। আর এ জন্যই বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের মাননীয় প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বার বার ছাত্র আন্দোলনের বিপক্ষে মত প্রকাশ করে চলেছেন। তিনি গত ২৯/৪/৯৮ তারিখ শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে পুনরায় বলেছেন- 'ছাত্রদেরকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। যার ফলে বইয়ের পরিবর্তে আজ দেখছি হাতে হাতিয়ার। ছাত্রদের সংগঠনগুলো রাজনৈতিক দলসমূহের অঙ্গসংগঠন হিসেবে কাজ করছে বলেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সন্ত্রাসমুক্ত হতে পারছে না। ছাত্ররা আজ পিতৃসম শিক্ষকদের কথা শোনে না ও উপদেশ গ্রহণ করে না। তার কারণ শিক্ষকগণ নিজেরাই এখন রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন। লাল, সাদা, সবুজ, নীল, হলুদ ইত্যাদি বিভিন্ন রঙের পরিচিত নিশান নিয়ে তারা পরোক্ষভাবে কোন না কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে কাজ করছেন। সব রাজনৈতিক দল যদি একত্র হয়ে ছাত্র সংগঠনের সাথে তাদের দলের সম্পর্ক ছেদ করে এবং শিক্ষকদেরকে দলাদলি করতে নিষেধ করে তবেই শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসবে' (বাংলাবাজার পত্রিকা ৩০/৪/৯৮)। প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদের এই আবেদনের প্রতি সর্বস্তরের মানুষ জোড়ালো সমর্থন দিতে শুরু করেছেন এবং দিন দিন এ সমর্থন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি পেসিডেন্টের প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও সাড়া দিয়েছেন। ২৮/৮/৯৮ তারিখে জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন-

www.pathagar.com

'শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে প্রেসিডেন্ট যে প্রস্তাব দিয়েছেন তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। তিনি উদ্যোগ নিলে সর্বান্তকরণে সামর্থন ও সহযোগিতা দেব।' তিনি আরও বলেছেন-'প্রয়োজনে শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী দেখা মাত্রই গুলি করার মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতেও আমি রাজি'।

প্রেসিডেন্টের প্রস্তাবকে সমর্থন জানানোয় প্রধানমন্ত্রীকে সর্বস্তরের জনগণ অভিনন্দিত করেছেন এবং আরও অভিনন্দন পাবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে প্রধানমন্ত্রী যে অস্ত্রধারীদের দেখামাত্র গুলি করবার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন তার কোন প্রয়োজনই পড়বে না যদি ছাত্র সংগঠনগুলোর উপর থেকে রাজনৈতিক দলগুলো দলীয় সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। কারণ রাজনৈতিক দলগুলোর সহায়তায় দলের স্বার্থ রক্ষার্থেই যে ছাত্ররা হাতিয়ার হাতে নেয় সে কথা মাননীয় প্রেসিডেন্টের বক্তব্যে সুস্পষ্ট। সুতরাং ছাত্রদের উপর রাজনৈতিক সমর্থন না থাকলে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাতিয়ারও থাকবে না সে কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তবে আমি একটি বিষয়ে নিশ্চিত যে, ছাত্র সংগঠনগুলোর উপর থেকে রাজনৈতিক সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলেও, ছাত্রদের হাতে হাতিয়ার না থাকলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতি থাকবে। কোনভাবেই এই রাজনীতি বন্ধ করা যাবে না। বন্ধ করা সঙ্গতও হবে না। কারণ একক কিংবা যৌথভাবে মত প্রকাশের অধিকার প্রতিটি নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার। এই অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না। ছাত্রদেরকেও নয়। ছাত্রসমাজ এদেশের সব চাইতে সচেতন ও জাগ্রত সমাজ। তারা রাষ্ট্রের যে কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ অবশ্যই করবে। তবে সেই প্রতিবাদের ধারা হতে হবে অরাজনৈতিক। আমার বিশ্বাস, সেই উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যেই মাননীয় প্রেসিডেন্ট বক্তব্য রেখেছেন। প্রেসিডেন্টের উদ্দেশ্য ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা নয়। উদ্দেশ্য ছাত্র সংগঠনগুলোকে রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত করা। ছাত্র সংগঠনগুলোর উপর থেকে রাজনৈতিক সমর্থন প্রত্যাহার করবার যে প্রস্তাব প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রেখেছেন তা বাস্তবায়নে অন্যান্য রাজনৈতিক দল এবং সর্বস্তরের জনগণ এগিয়ে আসবেন বলে আশা করি। ৫-৫-১৯৯৮।

www.pathagar.com

ছাত্র রাজনীতির সংজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে আমাদের অঞ্চলে অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে যে ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাকে কোনভাবেই ছাত্র রাজনীতি বলার সুযোগ নেই। কারণ আভিধানিক অর্থে রাজনীতির অর্থ হচ্ছে 'রাষ্ট্র শাসনের বা রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি।' সুতরাং রাজনীতির এই সংজ্ঞা প্রমাণ করে যে, আন্দোলন এবং রাজনীতি সমার্থক নয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিনস্তানের শাসকবর্গ তাদের কলোনী হিসেবে ব্যবহার করেছে। তারা তাদের সিদ্ধান্ত জোরপূর্বক বাঙালি জনগোষ্ঠীর উপর চাপিয়ে দিয়েছে। যে কারণে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনসহ অনেক বিষয়েই তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই সকল আন্দোলনে সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেছে। অংশগ্রহণ করেছে ছাত্র সমাজ। ছাত্র সমাজের এই আন্দোলন অব্যাহত ছিল ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। কিন্তু রাজনীতির সংজ্ঞানুসারে এই আন্দোলনকে 'ছাত্র রাজনীতি' বলে চালিয়ে দেবার উপায় নেই। কারণ প্রকাশ্যে দেশের রাজা বা সরকারের ক্ষতিসাধন করার চেষ্টা বা ষড়যন্ত্র কিংবা সরকার উৎখাতের চেষ্টাকে রাজনীতি বলা হয় না। বলা হয় সন্ত্রাসবাদ। বাঙালির এই সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস রয়েছে। অস্ট্রিক, দ্রাবিড় এবং আর্যদের সংমিশ্রণে পুন্ড্র, গৌড়, রাঢ়, সমুদ্র, ব্রজ, তাম্রলিপি, সমতট প্রভৃতি অঞ্চলের সমন্বয়ে সৃষ্ট বাঙালি জাতি এবং বাংলা ভাষার জন্মলগ্ন থেকে যখন পাল ও সেন বংশের সহায়তায় সংস্কৃতসেবী ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠী বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, বাঙালিদের নিগৃহীত করতে থাকে, শাসন-শোষনের সুবিধার্থে বাাঙালিদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথার প্রচলন করে, এমনকি ভোগ-বিলাসের প্রয়োজনে নিম্নবর্ণের যুবতীদের সঙ্গে তাদের অবৈধ মিলনকে বৈধ এবং নিম্নবর্ণের যুবতীদের জন্য তা পূণ্যের কাজ বলে প্রচার করে ঠিক তখন থেকেই অত্যাচারিত, নিগৃহীত, অপমানিত বাঙালি জাতি স্বাভাবিক কারণেই ক্ষুব্ধ হয় ও সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। এখান থেকেই বাঙালির সন্ত্রাসবাদের শুরু।

স্বরাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত সন্ত্রাসবাদের প্রয়োজন হয়েছে। এবং তৎকালে স্বাধীনতাকামী মানুষ এবং বঙ্গের গভর্নরের দ্বারা এই সন্ত্রাসবাদ সমর্থিতও হয়েছে। গভর্নর ঢাকার পুলিশ প্যারেডে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তাতে বলা হয়েছে- 'সন্ত্রাসবাদীরা দেশের শাসনপ্রণালী পরিবর্তন এবং শাসক পরিবর্তন দ্বারা দেশকে স্বাধীন

www.pathagar.com

দেশ করবার প্রয়োজনে সন্ত্রাসী কার্য করে থাকে। এই অনুমান যদি সঠিক হয় তাহলে সরকারী অভিযান পরিচালনাকারীদেরকে উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় নির্দেশ করতে হবে' (প্রবাসী, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, ১৩৪১)।

ব্রিটিশ ভারতে শুধু নয়, সন্ত্রাসবাদ সমর্থন পেয়েছিল '৫২ এবং '৭১ সালেও। সমর্থন পেয়েছিল বাঙালির প্রিয় ভাষা ও বাঙলার মর্যাদা রক্ষার প্রয়োজনে। সমর্থন পেয়েছিল বাঙালির নিজস্ব আবাসভূমি বাংলাদেশকে স্বাধীন করবার প্রয়োজনে। এই সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে দেশের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ যেমন যুক্ত ছিল তেমনি যুক্ত ছিল ছাত্র সমাজও। ছাত্র সমাজের এই সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডকেই কোন কোন বুদ্ধিজীবী এবং লেখক 'ছাত্র রাজনীতি' বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। বলছেন, পাকিস্তান আমলে ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতার আন্দোলন পর্যন্ত ছাত্র সমাজ গৌরবজনক ভূমিকা পালন করেছে। গৌরবের সেই উত্তরাধিকার বহনকারী ছাত্রদের রাজনীতি বন্ধ করা উচিত নয়। প্রফেসর মজহারুল ইসলাম এ প্রসঙ্গে বলেছেন-"বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছে ছাত্র রাজনীতির মধ্য দিয়ে," আখতারুজ্জামান এমপি বলেছেন-"ছাত্র রাজনীতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আছে" (আজকের কাগজ, ১০/৫/৯৮)।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ১৯৭১-এর পূর্বে ছাত্র সমাজ যে ভূমিকা পালন করেছে তা কোনভাবেই ছাত্র রাজনীতি নয়। তবে রাজনীতির সংজ্ঞানুযায়ী পাকিস্তান আমলের এক পর্যায়ে ছাত্র রাজনীতি যে ছিল তা অস্বীকার করা যাবে না। আইয়ুবের সামরিক শাসনামলে মোনেম খান এনএসএফ বা ছাত্রশক্তি নামে প্রথম ছাত্র রাজনীতির প্রচলন করেন। এই সংগঠনের ছাত্ররা পাক শাসকদের রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে সহায়ক শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। আর এ জন্যই এদের কর্মকাণ্ডকে ছাত্র রাজনীতি নামে আখ্যায়িত করা যায়, যাকে গৌরবজনক ছাত্র রাজনীতি হিসেবে কেউ কখনো গ্রহণ করেননি। সুতরাং দেখা যায়, ছাত্র রাজনীতি শুরু থেকেই কলংকিত। স্বাধীনতার পর পাক শাসকদের অনুকরণেই রাজনৈতিক দলসমূহ ছাত্র রাজনীতিকে বৈধতা দেয়ায় রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গ-সংগঠন হিসেবে বিভিন্ন নামে ছাত্র সংগঠন গড়ে উঠে এবং প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতার পর থেকেই ছাত্র রাজনীতি শুরু হয়।

রাষ্ট্র শাসন কিংবা পরিচালনার নীতিই যেহেতু রাজনীতি, সেহেতু সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে এর একটি সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। কিংবা অন্যভাবে বললে বলা যায়, রাজনীতির সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের রয়েছে গভীর সম্পর্ক। কারণ রাজনীতির প্রয়োজনে কিংবা রাজনৈতিক কারণে যে ভয়ভীতি কিংবা মহাশংকা সৃষ্টি করা হয় তারই নাম সন্ত্রাসবাদ। আরও স্পষ্ট করে বললে সন্ত্রাসবাদ হচ্ছে রাজনৈতিক ও ক্ষমতা লাভের জন্য হত্যা, অত্যাচার ইত্যাদি কার্য অনুষ্ঠান নীতি। রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে হত্যাকাণ্ড সন্ত্রাসবাদ এবং সন্ত্রাসবাদী সম্পর্কে অভিধানগুলো এই অভিমতই ব্যক্ত করেছে। সুতরাং ছাত্র রাজনীতি কিংবা শিক্ষক রাজনীতিকে কোনভাবেই খাটো করে দেখবার কোন সুযোগ নেই। কারণ উভয় গোষ্ঠীই

www.pathagar.com

ক্ষমতাসীন এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের অঙ্গ-সংগঠন কিংবা সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে থাকে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মদদে পরিচালিত হয়। ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতির ভয়াবহতা এখানেই। সুতরাং প্রফেসর মাজহারুল ইসলাম, প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা, রাশেদ খান মেনন, মোর্শেদ আলী এবং অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন প্রমুখ আজকের কাগজ আয়োজিত 'ছাত্র রাজনীতি, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও আমাদের করণীয়' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে ৯/৫/৯৮ তারিখে 'ছাত্র রাজনীতি নয়, সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে' বলে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা অসার প্রমাণিত হয়। দেশের বিচক্ষণ, বিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ যখন এ ধরনের বক্তব্য দেন বিশেষ করে জনাব রাশেদ খান মেনন একজন রাজনীতিবিদ হয়েও যখন বলেন সন্ত্রাস ও রাজনীতিকে এক করে দেখলে চলবে না। ছাত্র রাজনীতি বন্ধ নয়, ছাত্র রাজনীতিকে কলুষমুক্ত করতে হবে, সন্ত্রাসমুক্ত করতে হবে (ভোরের কাগজ, ১২/৫/৯৮)। কিংবা যিনি এক সময় আওয়ামী লীগের সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং এখনও যিনি আওয়ামী সরকারের বিভিন্ন সভা-সমিতিতে আসন গ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ভিসি আজাদ চৌধুরীও যখন বলেন রাজনীতি সন্ত্রাস আর সহিংসতা এক কথা নয় (বাংলাবাজার পত্রিকা, ১১/৫/৯৮)। তখন বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। এ সকল অভিমত প্রদানকারী বিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিকট সবিনয়ে একটি প্রশ্ন রাখতে চাই। রাজনীতি কবে, কখন, কোথায় ষড়যন্ত্র, সহিংসতা এবং সন্ত্রাসমুক্ত ছিল? রাজনীতি ষড়যন্ত্র, সহিংসতা এবং সন্ত্রাসমুক্ত ছিল এমন কোন নজির নেই। রাজনৈতিক কারণে, ক্ষমতার লোভনীয় মসনদ দখল করবার জন্য এবং দখলে রাখবার জন্য প্রতিপক্ষতো বটেই এমনকি পুত্র পিতাকে, পিতা পুত্রকে হত্যা করেছে এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় রয়েছে। সুতরাং রাজনীতি এবং সন্ত্রাস ও সহিংসতাকে যারা ভিন্নভাবে দেখতে চান, একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্কহীনতা প্রমাণ করতে চান তারা মূলতঃ অবাস্তব ও অসত্যের পূজারী। তারা ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি সচল রেখে বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা জীবন বিনষ্টের মধ্য দিয়ে জাতিকে অশিক্ষার অন্ধকারে নিক্ষেপ করতে চান। রাজনীতি করতে গিয়ে গেরুয়া বসন পরিধান করে জপমালা হাতে নিয়ে বসে থাকলে কেউ কখনো ভক্তি গদগদ চিত্তে এসে রাষ্ট্র ক্ষমতা হাতে তুলে দিয়ে যায় না। রাষ্ট্র ক্ষমতা পেতে হলে বিভিন্নভাবে নিরলস সংগ্রাম কিংবা কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করতে হয়। জেল-জুলুমের মত অত্যাচার সইতে হয়। প্রয়োজনে মাঠে-ময়দানে প্রতিপক্ষের সঙ্গে মোকাবেলায় নামতে হয়। ক্ষমতায় যেতে কিংবা ক্ষমতা রক্ষার্থে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়। এতে মূল রাজনৈতিক দল এবং দলের সকল অঙ্গ-সংগঠন সমভাবে অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণ করবার জন্য সকলের প্রতি রাজনৈতিক দলের পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ নির্দেশ থাকে। এ নির্দেশ কেউ অমান্য করতে পারে না। অমান্য করলে সদস্য পদ থাকে না। সুতরাং রাজনৈতিক দলের প্রতিটি সদস্যের নিজ নিজ এলাকাসহ দেশের সর্বত্র দলীয় স্বার্থ প্রতিষ্ঠা এবং সেই স্বার্থ রক্ষা করা দায়িত্ব হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক দলের অঙ্গ-সংগঠন হিসেবে

www.pathagar.com

ছাত্র সংগঠনগুলোও সেই দায়িত্বই পালন করে চলেছে। রাজনৈতিক দলের কর্মী হিবে এ দায়িত্ব পালন করা প্রতিটি ছাত্রের কর্তব্য। আর এ কর্তব্য পালন করতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে ছাত্রদের লাশ পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে হত্যা এবং অচলাবস্থার সৃষ্টির জন্য ছাত্ররা দায়ী হলেও, অস্ত্র হাতে প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করলেও সঙ্গত করাণেই কর্তৃপক্ষ তো দূরের কথা পুলিশের পক্ষেও তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা কিংবা গ্রেফতার করা সম্ভব হয় না (যদিও বিরোধী দলীয় ছাত্রদের বিরুদ্ধে কখনো কখনো কিছু কিছু ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়)। পুলিশ গ্রেফতার করতে পারে না কারণ তাদের উপর গ্রেফতার করবার কোন নির্দেশ থাকে না। থাকতে পারে না। পারে না কারণ রাজনীতি করবার অধিকার যারা দেন তারা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে দলের জন্য তা আত্মঘাতী হয়। এই আত্মঘাতী নির্দেশ ক্ষমতাসীন কোন দলই কখনো দেয়নি। ছাত্র রাজনীতি অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতেও দেবে না। সুতরাং যারা বলেছেন সরকার ইচ্ছে করলেই সন্ত্রাস দমন করতে পারে, যারা বলছেন এমন হতে পারে সংসদে হট্টগোলের অজুহাতে বলা হবে সংসদ বন্ধ করে দাও, যারা বলছেন মাথা ব্যথার কারণে মাথা কাটা ঠিক নয়, যারা বলছেন সন্ত্রাসমুক্ত ছাত্র রাজনীতি চাই তারা মূলত মহামান্য প্রেসিডেন্টের ছাত্র রাজনীতি বন্ধের আহবান এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমর্থনের বিরুদ্ধে ধূম্রজাল সৃষ্টি করছেন। মহামান্য প্রেসিডেন্টের আহবানের বিরুদ্ধে নানা কৌশলে কটাক্ষ করছেন। কিন্তু ধূম্রজাল সৃষ্টি এবং কটাক্ষ করবার কোন অবকাশ নেই। কারণ রাজনীতি তথা ছাত্র রাজনীতির চরিত্র বৈশিষ্ট্য দিবালোকের মত সুস্পষ্ট। ছাত্র রাজনীতি থাকলে সন্ত্রাস থাকবেই । সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস কিংবা সন্ত্রাসবাদ বন্ধ করতে চাইলে ছাত্র রাজনীতি অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই। ২৬-৫-১৯৯৮।

www.pathagar.com

শিক্ষক রাজনীতির কুফল

শিক্ষক কেন রাজনীতি করেন? এর উত্তর একটাই, আর তা হচ্ছে- নিজের কিংবা নিজেদের সীমাহীন লোভ-লালসা এবং উচ্চাকাঙক্ষা পূরণের জন্য। অর্থাৎ নিজের কিংবা নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য। শিক্ষক রাজনীতি করেন ভিসি, প্রো-ভিসি, ডীন, সিণ্ডিকেট, সিনেট সদস্য হবার জন্য। রাজনীতি করেন প্রভোস্ট,হাউস টিউটর হবার জন্য। রাজনীতি করেন ইউজিসি, পাবলিক সার্ভিস কমিশনসহ দেশের বড় বড় প্রতিষ্ঠানের প্রধান কিংবা সদস্য হবার জন্য। রাজনীতি করেন-বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, জাতীয় জাদুঘরসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান হবার বাসনায়। রাজনীতি করেন সরকারী আমলা কিংবা মন্ত্রী হবার অদম্য আকাঙক্ষায়। রাজনীতি করেন শিক্ষক সমিতির কর্মকর্তা সেজে নিজের কিংবা নিজেদের আখের গোছাবার জন্য। রাজনীতি করেন যোগ্য বা অযোগ্য হয়েও উচ্চতর পদে নিয়োগ পাবার জন্য। এ সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমর্থনে তথ্য পাওয়া যাবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যায়ের প্রাক্তন উপাচার্য, শিক্ষক এবং দেশের সচেতন নাগরিকবৃন্দের বক্তব্যে। অধ্যাপক মোঃ সামসুল হক (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা) তার এক নিবন্ধে বলেছেন, 'শিক্ষকদের মধ্যে দায়িত্ববোধ কমে গেছে। তারা তাদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে যতটা সজাগ কর্তব্য সম্পর্কে ততটা সচেতন নন। গবেষণা কর্মতো ছেড়েই দিয়েছেন। কেউ কেউ রীতিমত ক্লাসও নেন না।' শিক্ষক সমিতি সম্পর্কে বলেছেন '... পাণ্ডিত্যে যারা যত প্রখর নন তারাই সমিতিতে ভিড় জমান এবং কর্মকর্তা সেজে নিজের উন্নতির ব্যবস্থা করেন এবং দলাদলিটা জিইয়ে রাখেন' (সংবাদ, ৭/৩/৮৮)।

অবশ্য সবাইকে এই অভিযোগে অভিযুক্ত করা যাবে না। কারণ সবার উদ্দেশ্য এক নয়। অনেক শিক্ষক আছেন যারা শিক্ষক সমিতি, সিনেট এবং সিণ্ডিকেটের কর্মকর্তা হন বিশ্ববিদ্যালয়ের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে। তারা কোন রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করেন না। তবে তাদের কোন-না-কোন দলের অন্তর্ভূক্ত হতেই হয়। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বর্ণভিত্তিক দলের মধ্যে তারতম্য আছে। বড় দলগুলির সমর্থকদের বেশিরভাগই সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তিতে আসক্ত হয়ে পড়েন। তাদের কর্মকাণ্ড রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তাদেরই অনুরূপ।

www.pathagar.com

এই রাজনীতির কারণে বিভিন্ন দলের শিক্ষকদের সম্পর্কেরও আশংকাজনক অবনতি ঘঠে থাকে, যে কথা অধ্যাপক শামসুল হক ১০ বছর পূর্বেই উল্লেখ করেছেন। তিনি তার নিবন্ধের এক স্থানে বলেছেন যে, শিক্ষক সমিতির কর্মকাণ্ডের কোন কোন সময় শিক্ষকদের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হবার উপক্রম পর্যন্ত হয়েছে। এ সকল কারণে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছিলেন যে, শ্রদ্ধেয় সহকর্মীদের নিকট আবেদন থাকবে যারা ব্যক্তিগত উন্নতির জন্যে স্বার্থান্বেষী নন এমন লোকদেরকেই যেন শিক্ষক সমিতির কর্মকর্তা নির্বাচিত করা হয়, যারা সারাবছর ধরে দল গঠন ও ভোটের ধান্দায় বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ান তারা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। কিন্তু অধ্যাপক শামসুল হকের এ আবেদনে কেউ সাড়া দেননি। বরং দেখা গেছে যারা বছরব্যাপী রাজনীতি করেন, শিক্ষকদের বাড়ী বাড়ী দিন-রাত ঘুরে বেড়ান, সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রী, মন্ত্রী এবং কর্মকর্তাদের পিছনে ঘুরঘুর করেন, রাজনৈতিক দলের সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে রাজনীতিবিদের মত গলাবাজি করেন, রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের আমন্ত্রণপত্র পেলেই ছুটে যান ইফতার পার্টিতে, নির্বাচনে জিতে গেলে দেখা করে আসেন দলীয় প্রধানের সাথে, এরাই সর্বাধিক ভোট পেয়ে শিক্ষক সমিতির কর্মকর্তা নির্বাচিত হয়ে থাকেন। আর এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, সাধারণ শিক্ষকদের মধ্যেও রাজনৈতিক প্রভাব ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। আর এ সবই করছেন সবাই বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের দোহাই দিয়ে। এই বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ শিক্ষকদের জন্য মহাসুযোগের সৃষ্টি করেছে। কারণ ভোট প্রার্থনা এবং রাজনৈতিক দলের পক্ষে কাজ করবার কারণে অনেকেই ক্লাস নেয়ার সময় পান না, সময় মত খাতা দেখেন না, পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেন না, যে কথা অধ্যাপক শামসুল হকের প্রবন্ধেই স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে এ ধরণের গাফিলতির জন্য উপযুক্ত কোন শাস্তির বিধান নেই।

অভিযোগ আছে অতীতে(এবং হয়তো বর্তমানেও) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন উপাচার্য অস্ত্রধারীদের কথায় উঠেছেন-বসেছেন। বলা হয়েছে, গ্রুপ রাজনীতির জন্যেই দলীয় শিক্ষককে উপাচার্য করা হয়, তাকে প্রশাসনে পাঠানো হয়। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভোস্ট, হাউজ টিউটরদেরকে কর্তৃপক্ষের কৃপাপুষ্ট সন্ত্রাসকারী বলে পর্যন্ত আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং এই সকল সুবিধাবাদী তাঁবেদার শিক্ষকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে- আজ পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব দখল করার জন্য শিক্ষকরা রাজনৈতিক নেতাদের পায়ের কাছে বসে থাকছেন। শুধু তা-ই নয়, যে ছাত্রদের কাছ থেকে তাদের সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে চলার কথা, দলবাজি করতে গিয়ে তারা তাদের সাথে রীতিমতো ইয়ার-দোস্ত সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। বাংলাবাজার পত্রিকার এক লেখায় বলা হয়েছিল, দুঃখজনক হলেও সত্যি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিজস্ব নির্বাচনগুলো হয় রাজনৈতিক দলগুলোর পরিচয়ে। পরবর্তীকালে শিক্ষকদের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় সেভাবেই। ছাত্ররাও সেভাবে শিক্ষকদের পক্ষ নেয়। শিক্ষকরা সেভাবে

www.pathagar.com

ছাত্রদের ব্যবহার করেন। শোনা যায়, দলীয়ভাবে যদি কেউ উপাচার্য হন, তিনি সরকারি ছাত্র সংগঠনের 'বিশেষ ছাত্রদের' সঙ্গে দহরম-মহরমের সম্পর্ক তৈরি করেন। না করলে নাকি ক্ষমতায় থাকতে পারেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেকশন বোর্ড, সিণ্ডিকেট ইত্যাদি সবই দলীয়করণ করা হয়। একটি বা দু'টি পদের বিজ্ঞাপন দিয়ে তার চেয়ে অধিকসংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করার রীতি অনেকদিন থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে চলছে। বাড়তি নিয়োগ দেয়ার এই রীতি চালু রয়েছে অনেকদিন ধরে। চলছে দলীয় স্বার্থে।

বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সম্প্রদায় সম্পর্কে জনগণের ধারণা কেন এমন হলো? এমনতো হবার কথা ছিল না। কথা ছিল শিক্ষকবৃন্দ সামগ্রিকভাবে শিক্ষক সমাজের উন্নতির জন্য কাজ করবেন। নিজেদের পেশার মান-মর্যাদা বাড়াবেন। বিশেষ করে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ধারক-বাহক হিসেবে কাজ করবেন। কথা ছিল নিরহংকার, নির্লোভ, নিষ্কলুষ, নির্দলীয় হিসেবে দেশের সকলের কাছে, সর্বস্তরে নিজেদেরকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। কথা ছিল পবিত্রতা, সরলতা, উদারতা, স্বাতন্ত্র্য ও মুক্তচিন্তায় স্ব স্ব ক্ষেত্রে অনন্য সাধারণ হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলবেন এবং রাজনৈতিক সংঘাত, সন্ত্রাস, অসততা, জাতিগত ও ধর্মগত বিভেদ, বর্ণবিভেদ, বিশৃংখলা তথা জাতির যে কোন দুর্যোগময় মুহূর্তে স্বাধীনভাবে বলিষ্ঠ ভূমিকা পলনের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলায় জাতিকে সঠিক পথনির্দেশ করবেন। এভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা জাতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের এমনটি হয়নি।

এক সময় ছিল যখন বিভিন্ন দলের নেতা-নেত্রীরা নিজেদের দুঃসময়ে, জাতির দুর্যোগময় মুহূর্তে পরামর্শ লাভের আশায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শরণাপন্ন হতেন। হিতোপদেশ এবং পরামর্শ লাভে তারা নিজেদেরকে ধন্য মনে করতেন। অথচ গত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে ভিন্ন চিত্র। ঘটছে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ঘটনা। এখন ন্যায়নীতি বিবর্জিত স্তাবক শিক্ষকরা অধীর আগ্রহে পিপাসার্ত কাকের মত হা করে বসে থাকেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কৃপাভাজন হবার জন্যে। কে কার আগে গিয়ে নেতা-নেত্রীদের প্রিয়পাত্র হতে পারেন তারা সেই প্রতিযোগিতায় উন্মত্ত। নেতা-নেত্রীদের আশীর্বাদ পেলে তারা শিক্ষাঙ্গনকে রাজনৈতিক দলের আখড়ায় পরিণত করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থক ছাত্র-শিক্ষক মিলে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনকে এভাবেই অসহনীয় করে তুলছেন। শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট করছেন। এ অভিমত দেশের সকল স্তরের সচেতন নাগরিক ও বুদ্ধিজীবী সমাজের। এদের মধ্যে অনেকেই আজ অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় কথা বলতেও কুণ্ঠাবোধ করছেন না। বলছেন 'আত্মা বিক্রয়কারী বা বর্ণচোরা শিক্ষকের সংখ্যাও কম নয়' (মুনতাসীর মামুন), 'ঢাকা ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এখন যে ছবি প্রতিনিয়ত তুলে ধরছে, তা এক জাহান্নামের ছবি, (জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, সাবেক উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়)।

www.pathagar.com

জাতির বিবেকের কাছে প্রশ্ন, জনগনের অর্থে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতির কারণে কি 'জাহান্নাম' হিসেবেই পরিচিত হবে? শিক্ষক রাজনীতি কি অব্যাহত থাকবে? সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার এখনই সময়। কারণ মাননীয় প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন এবং রাজনৈতিক দল ও সর্বস্তরের জনগণের সমর্থন চেয়েছেন। এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখনই উপযুক্ত সময়। ১৭-৫-১৯৯৮।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের রাজনীতি ও শিক্ষা

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। কথাটি আমাদের দেশের কর্তাব্যক্তিরা হরহামেশাই বলে থাকেন। সভা-সমিতি ও সেমিনারে বলেন। পত্র-পত্রিকায় সাক্ষাৎকারে বলেন। অনেকে প্রবন্ধ-নিবন্ধের মাধ্যমেও বলেন। কথাটি তারা গর্বের সাথেই বলেন। কিন্তু যে শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড সেই শিক্ষাকে নিয়ে যে কত রঙ-তামাশা চলছে সে দিকে কারো নজর আছে বলে মনে হয় না। যদি থাকতো তা হলে আমাদের জাতীয় জীবনে শিক্ষার যে বেহাল অবস্থা, তা হতে পারতো না। দেশের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রগুলোর দিকে তাকালে দেখা যাবে, সেগুলোকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য ও সমর্থক সংগ্রহ এবং তাদের লালন-পালনের কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে। কেন্দ্রগুলোতে নতুন শিক্ষার্থীদের আগমনের সাথে সাথে বিভিন্ন দলের এজেন্টরা তাদেরকে দলভুক্ত করার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠে। দলভুক্তির পর শুরু হয় দলীয় সবক প্রদান। সবক প্রদান শেষ হলে দলীয় নেতা-নেত্রীদের নামে উচ্চকণ্ঠে শ্লোগান দেয়া, দলের সমর্থনে শিক্ষাঙ্গন ও রাজপথে মিছিল করা, মাঠে-ময়দানে-মহল্লায়, এমনকি বিভিন্ন জেলায় দলীয় সভা-সমিতিতে যোগ দেয়া, প্রতিপক্ষের সমর্থকদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্র কিংবা ক্যাম্পাস এবং ছাত্রাবাস, হল দখলে রাখা, চর দখলের মত অস্ত্রবাজ সন্ত্রাসীদের সাহায্যে হল দখল, অন্য দলের সমর্থকদের দলচ্যুত করে নিজ দলে নিয়ে আসা, রাজনৈতিক দলের নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করাসহ এ জাতীয় বিভিন্ন দলীয় কর্মে তাদেরকে বছরব্যাপী ব্যস্ত রাখা হয়। ফলে যে বিদ্যার্জনের উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়া সেই বিদ্যার্জনের কাজটি করার তাদের সময় হয়ে উঠে না। এ সমস্ত দলীয় কর্মকাণ্ডে শুধু ছাত্র-ছাত্রীরাই জড়িত নয়, এর সঙ্গে জড়িত উচ্চাভিলাষী, ক্ষমতালোভী ও বিকৃত রুচির এক শ্রেণীর দলবাজ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীও। জড়িত দলবাজ শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী সমাজ, যারা স্ব স্ব দলের ছাত্র সংগঠন ও সন্ত্রাসীদের উৎসাহ যোগান। উৎসাহ যোগান পত্র-পত্রিকায় বিবৃতিদানের মাধ্যমে। তাদের কবিতা, গল্পে, প্রবন্ধে, শিল্পে অসফল, অসৎ, দুশ্চরিত্র, লম্পট, স্বৈরাচারী রাজনৈতিক নেতা ও রাষ্ট্রনায়করা ফেরেস্তারূপে আবির্ভূত হয়। তাদের সাহিত্যকর্ম ঐ সকল ব্যক্তির গুণগানে পরিপূর্ণ হয়। এমনিভবে আমাদের দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোর সাথে সাথে শিল্প সাহিত্যের অঙ্গনগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। কারণ তাদের এ সমস্ত শিল্প ও সাহিত্যকর্ম পেশাদারি কৌশল, নাটকীয়তা, অতি আবেগ-উদ্বেলতা, সস্তা চটকদার

www.pathagar.com

যুক্তির অভিনবত্ব এবং প্রতারণা প্রভৃতি শিল্পমাণ সংহারক বিষয়ে আক্রান্ত। যে কারণে দেশের একজন শীর্ষস্থানীয় সাহিত্যিক দেশের শীর্ষস্থানীয় একজন প্রবীন কবি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ১৭ নভেম্বর '৯৬ এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, উক্ত কবি আওয়ামী লীগের নিম্ন শ্রেণীর একজন শ্লোগানদাতা। বলেছেন, তার কিছু কবিতা কবিতা হয়েছে, অন্যগুলো শ্লোগানে ভর্তি। তিনি আওয়ামী লীগের কবি। আর একজন জনপ্রিয় কবি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, তার কবিতা কোন কবিতাই নয়, সব দলীয় শ্লোগান। এ অভিযোগ সর্বাংশে সত্য কি না জানি না, তবে অন্য কবি সাহিত্যিকদের পারস্পরিক অভিযোগেও এ জাতীয় বক্তব্য পাওয়া গেছে। তা ছাড়া আমাদের দেশের এক শ্রেণীর শিল্পী, সাহিত্যিক, কবিদের সাম্প্রতিককালের বক্তব্য, বিবৃতি ও রচনাবলীর প্রতি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এ জাতীয় অভিযোগ অমূলক নয়। কারণ তাদের বক্তব্য, বিবৃতি ও রচনাবলীর কিছু কিছু বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও দলীয় নেতা-নেত্রীদের খুশি করার অভিপ্রায়ে তাদেরকে নিয়েই রচিত। এ জাতীয় রচনার উদ্দেশ্য দল এবং দলীয় প্রধানদের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে সুবিধা লাভ এবং আখের গোছানো। প্রতিপক্ষের উদ্দেশে রচিত খিস্তি খেউরে পূর্ণ রচনা এবং দলীয় শ্লোগানসর্বস্ব রচনায় এ উদ্দেশ্য ছাড়া সমাজ উন্নয়নমূলক কিংবা শিক্ষণীয় কোন বিষয়ই নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক সংগঠনগুলোকে রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তিতে অধিক অনুপ্রাণিত করে। এমনিভাবে বিভিন্ন দলের সমর্থক ছাত্র-শিক্ষক মিলে বিভিন্ন কর্মের মাধ্যমে দলের লেজুড়বৃত্তিতে বছরের পর বছর নিয়োজিত থাকেন। এতে করে শিক্ষার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের যেমন কোন সম্পর্ক থাকে না, তেমনি শিক্ষা ও গবেষণা কর্মে সম্পর্ক থকে না শিক্ষক নামধারী দলবাজদেরও। কিন্তু তাতে জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তাদের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। তাদের দলীয় সরকার প্রতিষ্ঠা পেলে তাদের আনন্দের আর সীমা-পরিসীমা থাকে না। যোগ্যতা না থাকলেও জাতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী তারাই হন এবং পদগুলোতে জেঁকেবসেন। শুধু তাই নয়, এই অযোগ্য ক্ষমতাদর্পীরাই কঠোর সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে জাতিকে তারা আদর্শের বাণী শোনান। এ জন্যেই বোধহয় উত্তরবঙ্গসাহিত্য সম্মিলনে সভাপতি তার বক্তব্যে বলেছিলেন, 'প্রায়ই দেখতে পাই, যে ছেলেটার সংস্কৃত বা ইংরেজি কোন লেখাপড়াই ভালমত হলো না, সে বাংলা লেখক বা ততোধিক মারাত্মক সমালোচক হয়' (উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন, চতুর্থ অধিবেশন,, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ,১৩১৮)। বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এ বক্তব্যের হুবহু প্রফিলন লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষা নীতি-নির্ধারকদের কল্যাণে দেশে ইংরেজি শিক্ষার যে বেহাল অবস্থা হয়েছে তাতে ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যে যোগ্য ইংরেজি শিক্ষক পাওয়া দুষ্কর হয়েছে। ভিনদেশি এই ইংরেজি ভাষার প্রতি অবজ্ঞা, অনীহা কিংবা বিমাতাসুলভ আচরণের ফলে নিজেদের মাতৃভাষা বাংলার প্রতি যে আগ্রহ বাড়ে কিংবা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করা সম্ভব হয় তা কিন্তু নয় । জানা গেছে,

www.pathagar.com

আজকের নামি দামি, তুখোড় অনেক লেখক-প্রবন্ধকারের লেখা প্রবন্ধ কেটে-ছেঁটে প্রায় নতুন করে লিখে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করতে পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের গলদঘর্ম হতে হয়। শুধু তাই নয়, দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সিংহভাগ পণ্ডিতের লেখাও নাকি ছাপার অযোগ্য বিবেচিত হয়। তাদের বাক্য গঠন ও বানান ভুলের মাত্রা নাকি মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। বাংলাদেশের অহংকারী বাঙালিদের অবস্থা এখন এমন যে, তারা না-জানে বাংলা, না-জানে ইংরেজি। যে কারণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম এমনকি দেশের প্রধানমন্ত্রীর জন্যে লিখিত প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও ভাষণে ভুলের ছড়াছড়ি লক্ষ্য করা যায়। কেন এই অবস্থা। শিক্ষায় রাজনীতি, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অনিয়ম আর ভ্রান্তনীতিই যে এর মূল কারণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বহুদিন যাবত রঙ-তামাশা চলছে। শিক্ষাকে করা হয়েছে পরীক্ষাগারের গিনিপিগ। ফলে পরীক্ষাগারের গবেষক মহাপণ্ডিতদের বিভিন্নমুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষার কারণে শিক্ষা নামক গিনিপিগের আজ মরণদশা হয়েছে। তাদের প্রচলিত বিভিন্ন সময়ের পরীক্ষা পদ্ধতি সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রহসনে পরিণত করেছে। ফলে মেধাবী ছাত্রছাত্রী গবেট ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় খারাপ ফল করছে। এখন আর ভাল ফল করতে বা পরীক্ষায় পাস করতে মেধা বা পড়ালেখার প্রয়োজন হয় না। শিক্ষা বোর্ডগুলোতে ভুয়া রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে পরীক্ষা দেয়া যায়। খাতায় না লিখেও ভাল ফল করা যায়। এমনকি পরীক্ষায় ফেল করলেও অসুবিধে হয় না, কারণ অর্থের বিনিময়ে পাসের সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। শিক্ষার এই চমকপ্রদ ব্যবস্থার সাথে সাথে ঘটা করে প্রতিবছর শিক্ষা সপ্তাহ পালন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী থেকে শুরু করে মাথা মোটা বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তিরা জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেন। প্রাথমিক শিক্ষাসহ সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক সাফল্যের কথা প্রচার করেন। বিশেষ বিশেষ অবদান রাখার জন্যে কিছু কিছু শিক্ষককে পুরস্কৃতও করেন। কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে পুঞ্জীভূত সমস্যার কথা ঘুণাক্ষরেও উচ্চারণ করেন না, কিংবা তা দূর করবার কোন প্রচেষ্টা নেন না।

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রগুলোর মত রাজনৈতিক সমস্যার ব্যাপকতা না থাকলেও প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে বলে প্রাথমিক স্কুলের একজন প্রধান শিক্ষক বলেন যে, স্কুল পরিচালনার জন্যে যে সকল কমিটি রয়েছে সে সকল কমিটির নিয়মিত মিটিং করা, তার রিপোর্ট তৈরি করা, সে রিপোর্ট উর্ধ্বতনকর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছে দেয়া, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে গণসংযোগের আওতায় মিছিল করা, অনুপস্থিত ছাত্রছাত্রীকে খুঁজে বের করে তার রিপোর্ট প্রস্তুত করা, পাড়ায়-মহল্লায় ঘুরে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা হলো কি হলো না তার খবরদারি করাসহ এমনি বিভিন্ন কার্যক্রম শিক্ষকদের উপর ন্যস্ত হওয়ায় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, প্রতিদিন বিভিন্ন বিষয়ে পড়া, লেখা, বলা এবং শোনা সংক্রান্ত ক, খ, গ, গ্রেডের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়ণ করার যে পদ্ধতি রয়েছে তা প্রকৃত অর্থে প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। করণ একটি ক্লাসে শিক্ষাদানের জন্যে যে স্বল্প

www.pathagar.com

সময় নির্ধারিত থাকে সেই সময়ের মধ্যে সকল ছাত্রছাত্রীর নাম ডাকা, প্রত্যেককে দিয়ে পড়ানো, বলানো, লেখানো এবং লিখিত খাতা নিরীক্ষণসহ যাবতীয় বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে মূল্যায়ণ করা এবং এর রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ প্রদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব ব্যাপার। এ ছাড়া পাস-ফেল নির্বিশেষে সকল ছাত্রছাত্রীকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করার বাধ্যতামূলক যে বিধান রয়েছে তা এবং খ এবং গ পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদেরকে ক পর্যায়ে উন্নীত করবার কাজটি দুরূহ হয়ে পড়ে। কখনও কখনও অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে নানাবিধ অনিয়মের ফাঁকে অকৃতকার্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী পঞ্চম শ্রেণী পাসের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে থাকে, যারা প্রকৃত অর্থে হাইস্কুলের জন্যে বিরাট সমস্যা হয়ে দাড়ায়। এ ছাড়া রয়েছে প্রতি স্কুল থেকে ২০% ছাত্রছাত্রীর বৃত্তি পরীক্ষা ও পরীক্ষায় পাস-ফেল জনিত জটিল সমস্যা। এতসব সমস্যার মধ্যে প্রাথমিক স্কুলে যথাযথভাবে শিক্ষাদান সম্ভব হয় না বলে গোঁজামিলের সাহায্য নিতে হয়। এই প্রাথমিক শিক্ষা কি সকল শিক্ষার বুনিয়াদ কিংবা ভিত্তি হতে পারে? নাকি জাতির মেরুদণ্ড শক্ত করবার সহায়ক হতে পারে? বিষয়গুলো সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ভেবে দেখা উচিত। ২৩-১১-১৯৯৬।

www.pathagar.com

শিক্ষক আছেন, গুরু নেই

এক সময় ছিল যখন আমাদের এই অঞ্চলেই আমাদের পূর্বপুরুষেরা প্রকৃত অর্থেই বড় ছিলেন। শুধু তাই নয়, তারা বীরও ছিলেন। তারা ধর্মপ্রাণ ছিলেন। পবিত্র ছিলেন। যথার্থ বড় যাকে বলে তারা সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন। যে সচেতনতা আজ আমাদের মঝে নেই। সে কারণেই আমরা ধন-সম্পদকেই বড় হবার উপায় মনে করি। অর্থ-সম্পদের অধিকারীকে বড় মানুষ বলি। অন্যের সম্পদ আত্মসাৎকারী, লুটপাটকারী, ব্যাংকের টাকা লোপাটকারীদেরকেও মহৎ মানুষ বলি। শুধু তাই নয়, এই লুটেরা অসৎ মানুষদের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে সুবিধা লাভের জন্যে সৎ মানুষেরা কৃপা ভিক্ষা করেন। তাদের মান্যগণ্য করেন। তাদেরকে সমাজপতিরূপে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠা করেন। ভোট দিয়ে কাউকে কাউকে আবার দেশ পরিচালনার দায়িত্বও অর্পণ করেন। কিন্তু সেকালে অর্থ-সম্পদে বড়দেরকে কখনই বড় বলা হতো না। সে সময় বিদ্যা-বুদ্ধি এবং জ্ঞান-গরিমায় যারা বড় ছিলেন সেই শিক্ষাগুরু, ধর্মগুরুদেরকেই বড় বলা হতো। যারা বেশভূষা বিলাসিতার কথা কখনই চিন্তা করতেন না। ফলে ধন-সম্পদের অধিকারীও তারা ছিলেন না। অথছ বড় বড় রাজা-মহারাজারা তাদেরই কাছে মাথানত করতেন। কিসে মঙ্গল হয় সে বিষয়ে পরামর্শ চাইতেন।

ধন নেই, সম্পদ নেই, গাড়ি নেই, বিলাস বহুল বাড়ি নেই তথাপি তারাই ছিলেন বড়। বড় ছিলেন কারণ তারা সত্যকে সর্বোচ্চে স্থান দিয়েছেন। সত্য কী তা জানবার জন্যে তারা কঠিন তপস্যা করেছেন। যে বিষয় সত্য সন্ধানের অন্তরায় হয়েছে, সে বিষয় যত গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন তাকে তারা পরিত্যাগ করেছেন। সত্য বলে যা জানতেন, মুখে যে সত্য বাণী উচ্চারণ করতেন, কাজে-কর্মের মধ্যেও তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তাদের কাজে কর্মে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ছিল। তারা সকলের মঙ্গলের জন্যে, সকলের উজ্জ্বল ভবিষ্যত নির্মাণের জন্যে জ্ঞানান্বেষণ করতেন। সকলের শান্তির জন্যে ধর্মকথা বলতেন। ফলে কিসে মঙ্গল হয় তা জানতে সকলে তাদের কাছে যেতেন। রাজা-প্রজা সকলেই যেতেন। যে কারণে সে সময় সর্বত্র ন্যায় নীতি ছিল। যুদ্ধে নিরস্ত্রকে আঘাত করতো না কেউ। সে সময় মানুষ নির্লোভও ছিল। ফলে রাজার ছেলে উপযুক্ত হলে তার হাতে ধন-সম্পদ ও রাজ্যভার ছেড়ে দিয়ে রাজাকেও সত্য সন্ধানে সংসার ত্যাগ করতে দেখা গেছে। শুধু রাজাই নন, সাধারণ গৃহস্থদেরকেও উপযুক্ত সন্তানের হাতে সংসার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে

www.pathagar.com

অতি দরিদ্র বেশে ঈশ্বরের তপস্যা তথা সত্য সন্ধানে সংসার ছেড়ে বন-জঙ্গলে চলে যেতে দেখা গেছে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন সে সময় তারাও সত্যের প্রতি, ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ব্যবসায় সুদ গ্রহণ, কাউকে ঠকানো কিংবা কেবল নিজের স্বার্থে অর্থ উপার্জন এমন কোন কাজই তারা করতেন না। অথচ আজকের সমাজের দিকে তাকালে সত্যত্যাগী ধর্মবিদ্বেষী অসৎ লুটেরা, অর্থলিপ্সু, ক্ষমতালিপ্সু, সন্ত্রাসী, লম্পটদের রাজত্ব ছাড়া ভাল কিছু দেখা যায় না। সত্যত্যাগী, ধর্মত্যাগী, অসৎ লম্পট এই নিকৃষ্ট মানুষেরাই সমাজে আজ বড় মানুষরূপে বড় বড় আসনগুলো দখল করে মহা দাপটে বসবাস করছে। আজকের সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে সেকালের মানুষদের কর্মকাণ্ড এবং তাদের সমাজব্যবস্থাকে কল্পনাকাহিনী মনে হয়। আরব্য রাজনীর উদ্ভট গল্প কাহিনীর মত শোনায়। সেকালের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা শুনলেও আজকের তুলনায় কল্পকাহিনীই মনে হয়। সেকালে শিক্ষার উদ্দেশ্যে বাল্যবয়সে সকলকেই আবাসস্থল পরিত্যাগ করে নির্জনে গুরুগৃহে যেতে হতো। গুরুগৃহে অত্যন্ত কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে নিজেদেরকে সংযত রাখতে হতো। গুরুভক্তি করতে হতো। শুধু তাই নয়, গুরুর জন্যে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষে করা থেকে যাবতীয় কাজকর্ম করে দিতে হতো; তা সে যত বড় ধনীর পুত্রই হোক না কেন। সে সময় শিক্ষাকালে সকলকে দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত থেকে হৃদয়কে পবিত্র রাখতে হতো। জুতো, ছাতা, দামি বস্ত্রের সাজসজ্জার পরিবর্তে নিজের দুষ্ট প্রবৃত্তি দমন, সত্য সন্ধান ও শিক্ষালাভে ধ্যানমগ্ন থাকতে হতো। নিজের অসৎ প্রবৃত্তিকে দমন করে সুন্দর গুণ ও প্রবৃত্তিকে ফুটিয়ে তুলবার নিমিত্তে নিমগ্ন থাকতে হতো। এই সমস্ত কঠিন তপস্যাসম কর্মকাণ্ড অনুকরণ করবার জন্যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার ছাত্রদের উদ্দেশে বলেছিলেন-'তোমাদের সেই রকম কষ্ট স্বীকার করে সেই কঠিন নিয়মে, সকল প্রকার বড়মানুষিকে তুচ্ছ করে দিয়ে এখানে গুরুগৃহে বাস করতে হবে। গুরুকে সর্বতোভাবে শ্রদ্ধা করবে, মনে-বাক্যে-কাজে তাঁকে লেশমাত্র অবজ্ঞা করবে না। শরীরকে পবিত্র করে রাখবে-কোন দোষ যেনো স্পর্শ না করে। মনকে গুরু-উপদেশের সম্পূর্ণ অধীন করে রাখবে' (শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা দিবসের উপদেশ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রিট, কলিকাতা)।

সেকালের কথা, যা এতক্ষণ উল্লেখ করলাম, যা অবিশ্বাস্য মনে হয়, তার সাথে সেতুবন্ধন রচনা করেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি নিজেও সেকালের আদর্শের প্রকৃত বড় মানুষদেরই একজন ছিলেন বলে সেকালের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিও তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ছাত্রদের উদ্দেশে উপরে পদত্ত বাণীই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। তিনি প্রকৃত শিক্ষার প্রতি যেমন নির্ভেজাল অনুরাগী ছিলেন তেমনি ধর্মের প্রতিও ছিলেন সমান শ্রদ্ধাশীল। যে কারণে তিনি ছাত্রদের সম্পর্কে একই গ্রন্থে বলেছেন, 'বালকদিগের অধ্যয়নের কাল একটি ব্রত যাপনের কাল। মনুষ্যত্ব লাভ স্বার্থ নহে পরমার্থ, ইহা অমাদের পিতামহেরা জানিতেন। এই মনুষ্যত্ব লাভের ভিত্তি যে শিক্ষা তাহাকে তাহারা ব্রহ্মচর্যব্রত বলিতেন। এ কেবল পড়া

www.pathagar.com

মুখস্ত করা এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া নহে; সংযমের দ্বারা, ভক্তি শ্রদ্ধার দ্বারা, সুচিন্তা দ্বারা, একাগ্র নিষ্ঠা দ্বারা সংসারাশ্রমের জন্যে এবং সংসারাশ্রমের অতীত ব্রহ্মের সহিত অনন্ত যোগ সাধনের জন্যে প্রস্তুত হইবার সধনাই ব্রহ্মচর্যব্রত। ইহা ধর্মব্রত। প্রথিবীতে অনেক জিনিসই কেনাবেচার সামগ্রী বটে, কিন্তু ধর্ম পণ্যদ্রব্য নহে। ইহা এক পক্ষে মঙ্গল ইচ্ছার সহিত দান ও অপরপক্ষে বিনীত ভক্তির সহিত গ্রহণ করিতে হয়। এই জন্যে প্রাচীন ভারতে শিক্ষা পণ্যদ্রব্য ছিল না। এখন যাহারা শিক্ষা দেন তাহারা শিক্ষক, তখন যাহারা শিক্ষা দিতেন তাহরা গুরু ছিলেন। তাহারা শিক্ষার সঙ্গে এমন একটি জিনিস দিতেন যাহা গুরু-শিষ্যের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ব্যতীত দান প্রতিগ্রহ হইতেই পারে না।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষার ক্ষেত্রে সেকালের গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যেই লোকালয় থেকে দূরে শান্তিনিকেতনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। তার জীবদ্দশায় এমনকি তার মৃত্যুর পরও সেটি একটি আশ্রমের অনুরূপই ছিল। পাকা দালানকোঠা তেমন ছিল না। ছিল না বিলাসবহুল জীবনযাপনের কোন ব্যবস্থা। আমি যখন শান্তিনিকেতনে ছিলাম (১৯৭৩-৭৫) তখনো বিশ্বভারতী ক্যাম্পাসে কিংবা ক্যাম্পাসের রাস্তার ধারে মাটিতে বসে শিক্ষ-ছাত্রদের ঝুপড়ির চা খেতে দেখেছি। দেখেছি শিক্ষকরা সাধারণ চপ্পল পায়ে ফতুয়া কিংবা অতিসাধারণ জামা গায়ে ক্লাসে যেতেন। নামি দামি অধ্যাপকবৃন্দ শীতের দিনে শতছিন্ন চাদর গায়ে শিক্ষায়তনে যেতেন। তারা সেকালের গুরুর আদর্শ মেনে চলতেন, হয়তো এখনও চলেন। যদিও সময়ের দাবির প্রেক্ষিতে দালানকোঠার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু অনাড়ম্বর জীবনযাপন অব্যাহত আছে। শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক গুরু-শিষ্যের পর্যায়েই আছে। আদর্শের তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। অথচ আমাদের এ অঞ্চলে অর্থাৎ বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালে যথেষ্ট সুনাম ছিল। যে কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশে-বিদেশে 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' নামে খ্যাত ছিল। কিন্তু এখন নেই। আগে রাজনীতি ছিল না। এখন আছে। এখন ছাত্র-শিক্ষক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থকরূপে রাজনীতি করেন। কেউ কেউ দলে রেজিস্টার্ড সদস্যরূপেও কাজ করেন। আগে উপাচার্য হতে রাজনীতি করতে হতো না। এখন করতে হয়। ভোটের মাধ্যমে উপাচার্য প্যানেলে নাম লেখাবার জন্যে রাজনীতি করতে হয়। অধিক ভোট লাভের জন্যে ব্যাপক গণসংযোগ রক্ষা করতে হয় অন্যান্য নির্বাচনের ক্ষেত্রেও। ফলে শিক্ষা, গবেষণা ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্র সংকুচিত হচ্ছে। রাজনীতির সাথে সাথে সন্ত্রাসও বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে ছাত্র-শিক্ষকদের নিকট ক্যাম্পাসে পুলিশের উপস্থিতি নিন্দনীয় ছিল সেই ছাত্র-শিক্ষকরাই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশের উপস্থিতিকে স্বাগত জানাচ্ছেন। হলে হলে পুলিশি রাজত্বের ফলে প্রশাসনের অসহায়ত্ব প্রকাশ পাচ্ছে। নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা হয় না বলে সেশনজট বাড়ছে। অর্থ আত্মসাৎ এবং অর্থের বিনিময়ে প্রশ্নপত্র বিক্রির মত গুরুতর অভিযোগ উঠছে অধ্যাপকদের বিরুদ্ধে। এ সকল কারণে দেশে-বিদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক মান

www.pathagar.com

আশংকাজনক পর্যায়ে নেমে গেছে। ফলে এককালের প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে এশিয়ার সেরা ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেও স্থান পায় না। স্থান নাা পাওয়ার কারণ যে উল্লিখিত আদর্শহীনতা এবং অস্থিরতা তা বলাবাহুল্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই যে শুধু এই হাল হয়েছে তা কিন্তু নয়। দেশের প্রায় সকল উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোর একই অবস্থা। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, শিক্ষকদের পারস্পরিক সম্পর্কের ধস সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। রাজনৈতিক মতপার্থক্যসহ বিভিন্ন কারণে আজ শিক্ষক শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্র লেলিয়ে দেন। নামে-বেনামে শিক্ষক শিক্ষকের মানহানি করেন। ফলে সমাজে ছাত্র-শিক্ষকদের মর্যাদা ব্যপকভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। লেখক-প্রবন্ধকারদের দৃষ্টিতে সমালোচনার পাত্র হয়েছেন। তারা আজ শিক্ষক-ছাত্রদের সম্পর্কে অশালীন ও কটু কথা বলেন। জাতীয় মেরুদণ্ড তৈরির কারখানা এবং তার কারিগর উভয়ই ধ্বংসের পর্যায়ে নেমে গেছে। নেমে গেছে কারণ আজ সকলে সেই গুরু-শিষ্যের ও গুরুগৃহের আদর্শের কথা বিস্মৃত হয়েছেন। কিংবা আধুনিকতার অহংকারে, দামি বাড়ি, গাড়ি ও অর্থ সম্পদে বড়হবার অভিলাষে পরিত্যাগ করেছেন। অথচ যাকে নিয়ে প্রতিবছর আমাদের দেশের ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীরা মাতামাতি করেন সেই কবি রবীন্দ্রনাথের বাণীকে কেউ মনে রাখেননি। রবীন্দ্রনাথকে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঘটা করে স্মরণ করেন কিন্তু তার নীতি, আদর্শ ও আদেশ-উপদেশকে স্মরণ করেন না। রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্মরণীয়, বরণীয় , আদর্শ; তিনি শ্রেষ্ঠ বাঙালি ও বাঙালি জাতির আহংকার। এমনি সব বিশেষণে বিশেষিত করে মুখে ফেনা তুলে ফেলেন, কিন্তু তিনি যে বলে গেছেন 'ছেলেরা প্রত্যহ পর্যায়ক্রমে তাহাদের অধ্যাপকদের ঘরও পরিষ্কার করিয়া গুছাইয়া রাখিলে ভাল হয়। অধ্যাপকদের সেবা করা ছাত্রদের অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে নির্ধারিত করা চাই। অধ্যাপকদের প্রতি ছাত্রদের নির্বিচারে ভক্তি থাকা চাই। কোন মতে তাহাদের সমালোচনা বা নিন্দায় যোগ দিতে পারিবে না। অধ্যাপকেরা যদি কখনো পরস্পরের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন তবে সে সময়ে কোন ছাত্র সেখানে উপস্থিত না থাকে তৎপ্রতি যত্নবান হইতে হইবে। কোন অধ্যাপক ছাত্রদের সমক্ষে অন্য অধ্যাপকদের প্রতি অবজ্ঞাজনক ব্যবহার, অসহিষ্ণুতা বা দোষ প্রকাশ না করেন সেদিকে সকলের মনোযোগ থাকা কর্তব্য। অধ্যাপকগণ পরস্পরকে নমস্কার করিবেন। পরস্পরের প্রতি শিষ্টাচার ছাত্রদের নিকট যেন আদর্শস্বরূপ বিদ্যমান থাকে'। এই কথাগুলো আজ আর কেউ স্মরণও করেনা। মেনেও চলেনা। আজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকলেই শিক্ষক। তারা ছাত্রদের শিক্ষা দেন। শাসন করেন। এমন কি প্রাইভেট পড়ানোর নামে ব্যবসাও করেন। শিক্ষকদের অর্থ কড়ি দিলে ছাত্র-ছাত্রীরা ভাল ফল করে। অর্থ কড়ি না দিতে পারলে ছাত্রছাত্রী মেধাবী হলেও ভাল ফল করেনা। ফলে ছাত্র শিক্ষকের দ্বন্দ্ব বাড়ে। সম্পর্ক বিনষ্ট হয়। এমনিভাবে সকলের নিকট শিক্ষক মর্যাদা হরান। এই মর্যাদা হারানো শিক্ষকদেরই প্রাধান্য আজ দেশের সর্বত্র। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক পাওয়া যায়, কিন্তু গুরু পাওয়া যায় না সহজে। অথচ আজকের দিনে জাতির সার্বিক স্বার্থে, প্রকৃত শিক্ষার স্বার্থে শিক্ষক নন, গুরুরই অধিক প্রয়োজন। প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথের নীতি-আদর্শের বাস্তবায়ন। ২৮-৬-১৯৯৭।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস জাতীয় সমস্যা, উপাচার্যের পদত্যাগ এর সমাধান নয়

'সন্ত্রাস' শব্দটি বর্তমানে বাংলাদেশের সর্বত্রই বহুল পরিচিত। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই সন্ত্রাসের অর্থ বুঝে। কারণ সন্ত্রাস যে ভয় বা মহাশঙ্কা একথা বুঝতে কারো অসুবিধা হয় না। তবে সন্ত্রাস যে রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত একথা হয়ত সবাই বুঝবে না। রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্যে হত্যা, অত্যাচার ইত্যাদি কার্য অনুষ্ঠান হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ। সুতরাং সন্ত্রাস রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক উভয়ই। তবে আমাদের দেশে সন্ত্রাসের স্বরূপ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক। ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী উভয় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গের দ্বারাই সর্বত্র সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে। এ সন্ত্রাস সাধারণত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবার কথা। কিন্তু বাংলাদেশের সাম্প্রতিককালের সন্ত্রাস রাজনৈতিক অঙ্গন ছাড়িয়ে অরাজনৈতিক শান্তিপ্রিয় মানুষের ঘরে ঘরে বিস্তার লাভ করেছে। স্বামী স্ত্রীতে সন্ত্রাস, পিতা-পুত্রে সন্ত্রাস, বন্ধুতে-বন্ধুতে সন্ত্রাস, আত্মীয়-আত্মীয়তে সন্ত্রাস, পাড়ায়-পাড়ায় সন্ত্রাস, মহল্লায়-মহল্লায় সন্ত্রাস, স্কুল-কলেজে সন্ত্রাস, বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস, অফিস-আদালতে সন্ত্রাস, সমগ্র দেশব্যাপি সন্ত্রাস। সন্ত্রাস আর সন্ত্রাস। সন্ত্রাসই যেনো বাংলাদেশের পরিচয়।

সন্ত্রাস রাজনৈতিক হলেও এর কারণ বহুবিধ। প্রাধান্য বিস্তার, কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন এবং স্বল্পতম সময়ে সীমাহীন সম্পদ লাভের লালসাই সন্ত্রাসের মূল কারণ, যা সন্ত্রাসকে দান করে অপ্রতিরোধ্য গতি এবং এই গতির পেছনে যে শক্তি কাজ করে তার নাম খুঁটি। আর এই খুঁটি হচ্ছে রাজনৈতিক দল, দলীয় নেতা-নেত্রী, কর্মী, সমর্থক এবং সংশ্লিষ্ট উচ্চমহল। যে সন্ত্রাসীর যত বেশি খুঁটির জোর তার ততবেশি ক্ষমতা। সে ততবেশি আইনী বা পুলিশী বিপদমুক্ত। খুন করলেও তার ভয়ের কোন কারণ থাকেনা (ব্যতিক্রম ছাড়া), কারণ পুলিশ তাকে খুঁজে পায় না এবং কখনই পায় না। অবৈধ অস্ত্র নিয়ে দিনরাত পুলিশের সামনে ছুটোছুটি করলেও পুলিশ চোখে দেখে না। প্রকাশ্যে অস্ত্রবাজি করলেও সকলেই এক অজ্ঞাত কারণে তাদের সমীহ করে চলে। তদন্ত হলে কেউ কাউকে অস্ত্র হাতে দেখেনি বলে সাক্ষ্য প্রদান করে। শিক্ষা, টেণ্ডার, ইজারা, চাঁদাবাজি, সর্বত্রই একই চিত্র। প্রতিরোধ নেই, প্রতিবাদ নেই, গ্রেফতার নেই। সুতরাং বিচারও নেই। আছে শুধু সন্ত্রাসীদের অবাধ ও নির্বিঘ্ন অসুর শক্তির বিস্তৃতি। যে শক্তির বিষাক্ত ছোবলে বিশ্ববিদ্যালয়ের

www.pathagar.com

পবিত্র অঙ্গন রক্তাক্ত। মান সম্ভ্রম ভলুণ্ঠিত। ধ্বংসপ্রায় শিক্ষা ব্যবস্থা। জাতি স্তম্ভিত। বিবেকবান প্রতিটি মানুষ মর্মাহত, জাতির ভবিষ্যৎ চিন্তায় শংকিত। শংকা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক ঘটনাবলীর কারণে। শিক্ষক-সমিতির সাম্প্রতিক বিবৃতিতে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। ছাত্রদল এবং ছাত্রলীগ (ম-ই) এর বন্দুকযুদ্ধ এবং সন্ত্রাসকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক জন শিক্ষক লাঞ্ছিত হয়েছেন। এই ঘটনার সাথে বহিরাগত সন্ত্রাসী জড়িত বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিমত পাওয়া গেছে এবং তারা যে ছাত্র নয় তা তাদের দ্বারা উপাচার্য মহোদয়কে শিক্ষক সমিতির সভাপতি হিসেবে চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে। অথচ এই সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্যে শিক্ষক সমিতি একতরফাভাবে ছাত্রদলের নাম উল্লেখ করে তাদেরকে সরাসরি দায়ী করেছে। পক্ষান্তরে এর পরের ঘটনা অর্থাৎ গত ১ সেপ্টেম্বর '৯৪ তারিখে ছাত্র লীগ (ম-ই)এবং ছাত্রলীগ (বা-কা) এই ছাত্র সংগঠন দুটির বন্দুকযুদ্ধ ও সন্ত্রাসী ঘটনাকে কেন্দ্র করে একজন ছাত্রের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার প্রেক্ষিতে শিক্ষক সমিতি বিবৃতির মাধ্যমে যে নিন্দা প্রকাশ করেছে তাতে সংশ্লিষ্ট কোন ছাত্র সংগঠনের নাম উল্লেখ নেই। ফলে শিক্ষক সমিতির নিরপেক্ষতা সম্পর্কে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারিসহ সকলের মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। শিক্ষক রাজনীতি ক্রমান্বয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গন ছাড়িয়ে বিবদমান বিভিন্ন রাজনৈতিক অঙ্গন পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করছে। তাদের বর্ণগত ব্যবধান ছাত্র রাজনীতি তথা গোষ্ঠীগত বিরোধ, শিক্ষক-শিক্ষকে বিরোধ, ছাত্র-শিক্ষকে বিরোধ, ছাত্র পুলিশে বিরোধ, সব মিলিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক অনিশ্চয়তার আবর্তে তলিয়ে যেতে বসেছে। কিন্তু কারও এ বিষয়ে মাথা ব্যথা নেই। আদৌ কারও মাথা নামক বস্তুটি আছে কিনা সে বিষয়েই সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কারণ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আহার, বস্ত্র, বাসস্থানসহ হাজারো সমস্যায় জর্জরিত দেশের সাধারণ মানুষদের নিয়ে মাথা ঘামাবার কেউ নেই। রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী, কর্মী, লেখক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী যাদের দেশকে নিয়ে ভাববার কথা তারা প্রায় সকলেই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছেন। স্বল্প সময়ে স্বর্গারোহণের সিঁড়ির সন্ধানে ব্যস্ত সকলে। রাষ্ট্রের প্রধান আসনটিকে ঘিরে নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা দেশকে ধ্বংসের পথে পরিচালিত করছে। বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষে নেত্রীর ছাদে প্রার্থনা, ধর্মঘটি শিক্ষকদের জন্যে অযৌক্তিক আশ্বাস প্রদান, উচ্ছেদকৃত ফুটপাত দোকানীদের জন্যে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ, আমি এসেছি ওরা আসেনি বলে লাশের রাজনীতি, ঘাতক দালাল নির্মূল আন্দোলন, যাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন তাদের সাথেই সম্প্রীতি, মিটিং মিছিল, হরতাল, ভাঙচুর, অবরোধ, গণঅবস্থান, রাস্তা দখল, সংসদ বর্জন, এ সবই ভোটের জন্যে। ঐ লোভনীয় রাষ্ট্রের আসনটির জন্যে। দেশ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে নয়। রাজনৈতিক দলের নেতা, কর্মী, সমর্থক সকলেরই জোর প্রতিযোগিতা যে কোন প্রকারে গাড়ি বাড়ি ও অগাধ সম্পদের মালিক হওয়া। এইটিই তাদের একমাত্র স্বপ্ন। এই স্বপ্ন শুধু তারাই দেখেন না, কোমলমতি ছাত্রদেরকেও দেখান। স্বর্গারোহণের সিঁড়ি হসিবে এদের ব্যবহার করেন। বিনিময়ে কাউকে

www.pathagar.com

কাউকে মন্ত্রী বানান, কাউকে দেন মন্ত্রণালয়ের লোভনীয় চাকরি। দেন পারমিট। এমনি দু'একটি লোভনীয় দৃষ্টান্ত দেখিয়ে অনেকের হাতে অর্থ অস্ত্র ও ক্ষমতা তুলে দেন। সেই অর্থ, ক্ষমতা আর মিথ্যা আশ্বাসে তারা পবিত্র শিক্ষাঙ্গনকে নরক রাজ্যে পরিণত করে। বিভিন্ন পক্ষে ক্ষমতা প্রদর্শন প্রতিযোগিতা চলে অবিরাম ধারায়। যে ধারায় জান-প্রাণ, মান সবই চলে যায়। শোকসভা, মৌন মিছিল, কমিটি গঠন, সবই চলে রুটিনমাফিক। কিন্তু সমাধান হয় না। করণ এর সমাধান বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। প্রশাসন, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মচারী সকলে মিলে সমাধানের আন্তরিক প্রচেষ্টা চালান মাত্র, কিন্তু সমাধান দিতে পারেন না। কারণ সমাধান তাদের হাতে নেই। উপাচার্যের পর উপাচার্য বদল হয়, কিন্তু সমাধান হয় না। কারণ সমাধান উপাচার্যের হাতেও নেই। তা সত্ত্বেও তিনি সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হন। কখনও কখনও কেউ কেউ সমস্যা সমাধানে তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টাকে কটাক্ষ করেন, ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেন। যারা তা করেন তারা মূলত আজীবন পর নিন্দাকারী অসৎ চরিত্রের মানুষ। তাদের অসৎ সমালোচনা অশান্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সন্ত্রাসীদের করে উৎসাহিত।

গত পহেলা সেপ্টেম্বর '৯৪ বিবদমান দুই ছাত্র সংগঠনের বন্দুকযুদ্ধকে কেন্দ্র করে প্রাণ হারালো কামরুল ইসলাম বুলবুল নামের একজন নিরীহ ছাত্র। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়েছে। পত্র-পত্রিকার মতে বুলবুলের মৃত্যুর কারণ পুলিশের নিক্ষিপ্ত টিয়ার গ্যাসের শেল। ময়না তদন্তের রিপোর্টও অনুরূপ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির অভিমতও তাই। অথচ বিবদমান ছাত্র লীগ (ম-ই) এবং ছাত্রলীগ (বা-কা) এই মৃত্যুর জন্য পরসম্পকে দায়ী করেছে। আত্মীয় স্বজনদের দাবি অনুযায়ী নিহত বুলবুল কোন ছাত্র সংগঠনের সদস্য ছিলনা। অথচ ছাত্রলীগ (মি-ল) বুলবুল তাদের সংগঠনের সদস্য বলে .দাবি করেছে এবং তারা মৃত্যুর জন্যে ছাত্রলীগ (ম-ই)কে দায়ী করেছে (বাংলাবাজার পত্রিকা ২-৯-৯৪)। এহেন নাজুক পরিস্থিতির কারণে স্বাভাবিকভাবেই সকল মহল থেকে সুষ্ঠু তদন্তের দাবি উঠেছে। বিশ্বদ্যিালয়ের অতীত ঐতিহ্য অনুসারে যতারীতি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। শুধু তাই নয় উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে ইতিমধ্যেই অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ উপাচার্যের পদ থেকে পদত্যাগ করতে পারেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি মনে করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পদে আসীন থেকে সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ হলে পদ পদবীতে লাভ নেই।

উপাচার্যের পদত্যাগের উদ্দেশ্য যে মহৎ তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে সন্ত্রাস দমনের ব্যর্থতা তার নিজের কিনা সর্বাগ্রে সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। ক্ষমতা থাকলেই ব্যর্থতার প্রশ্ন আসে । যে বিষয়ে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষমতা থাকে না সে বিষয়ে ব্যর্থতার প্রশ্ন অবান্তর। যে সন্ত্রাস দমনের প্রশ্ন সে সন্ত্রাস বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়। বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করে মাত্র। এ সন্ত্রাস রাজনৈতিক। যা দমনের প্রধান দায়িত্ব রাজনৈতিক দলসমূহের। দায়িত্ব ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী, সকলের

www.pathagar.com

। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন যাদের স্বার্থ রক্ষা করে তাদের, সকলের আন্তরিক যৌথ সিদ্ধান্তই কেবল বন্ধ করতে পারে এই দানবীয় সন্ত্রাস। কোন দলের একক সিদ্ধান্তে এর সমাধান সম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষেতো নয়ই। সুতরাং উপাচার্যের পদত্যাগ সন্ত্রাস দমনের সমাধান নয়। উপাচার্য অনেক এসেছেন এবং আরও আসবেন, কিন্তু সন্ত্রাস থেকেই যাবে। যদি না এর রাজনৈতিক সমাধান হয়। তবে একজন উপাচার্য যা করতে পারেন তা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট মহলকে সমস্যা সমাধানে উদ্বুদ্ধ করা। যা বর্তমান উপচার্য অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথেই করছেন। উপচার্যের এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারেন যারা তারা হলেন-বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা, প্রশাসন, ছাত্রছাত্রী এবং বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন। সকলের মিলিত শক্তিই পারে রাজনৈতিক দলগুলোকে সমাধানে বাধ্য করতে। পারে রাজনৈতিক দলসমূহের যৌথ প্রচেষ্টাকে সফল করতে। এই প্রচেষ্টাই বলবান হোক। উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগাকুল দেশবাসীর এইটিই এই মুহূর্তের কামনা। ১৪-৯-১৯৯৪।

www.pathagar.com

দার্শনিক এবং বুদ্ধিজীবীদের সন্ত্রাস

চাকু, ছুরি কিংবা আগ্নেয়াস্ত্রের ভয় দেখিয়ে পথচারীর সর্বস্ব কেড়ে নেয়া সন্ত্রাস। মিছিল করে বোমা ফাটিয়ে বন্দুক, পিস্তলের সাহায্যে হাট-বাজার, পথ-ঘাট, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, হল-হোস্টেল, পাড়া-মহল্লাসহ যে কোন প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব গ্রহণ করা সন্ত্রাস। রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের লক্ষ্যে হত্যা, অত্যাচার ইত্যাদি কার্য নুষ্ঠানও সন্ত্রাস। যদিও এ জাতীয় কর্মকাণ্ডকে বলা হয় সন্ত্রাসবাদ। কারণ রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে হত্যাকাণ্ডের পক্ষপাতী যারা আভিধানিক অর্থে তারা সন্ত্রাসবাদী। তবে মূল কথা হচ্ছে-অতিশয় ভয় কিংবা মহাশঙ্কা সৃষ্টি করে এমন যে কোন কর্মকাণ্ডকেই সন্ত্রাস বলে আখ্যায়িত করা হয় এবং এই কারণেই দার্শনিক, বুদ্ধিজীবী এবং লেখকরা তাদের কর্মকাণ্ড এবং লেখনির মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে ভয় দেখিয়ে কিংবা তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে, কুৎসা রটিয়ে নিজের কিংবা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কিংবা নিজের বা নিজেদের অবস্থান এবং দাপট অক্ষুণ্ন রাখবার যে প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন তাও সন্ত্রাস। অর্থাৎ চাকু, ছুরি, বোমা এবং বন্দুকের সাহায্যে যারা সন্ত্রাস করে এবং কলম ও বুদ্ধির মারপ্যাঁচে যারা সন্ত্রাস করে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে চাকু, ছুরি, বন্দুক, বোমা, কলম, বুদ্ধিবৃত্তি, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সবাই সমান এবং সকল সন্ত্রাসীই সমঅপরাধী। কারণ কলম এবং বুদ্ধি কৌশলে পরিচালিত সন্ত্রাস অনেক ক্ষেত্রে চাকু, ছুরি এবং আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে পরিচালিত সন্ত্রাসকে বহুগুণ শক্তিশালী করে। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ঘটায়। অন্ধকার গলিপথের নিকৃষ্ট গোপন সন্ত্রাসকেও রাজনৈতিক সন্ত্রাসে রূপান্তরিত করে। শতগুণে সাহসী করে সন্ত্রাসীদের। ফলে সন্ত্রাস সংঘটিত হয় প্রকাশ্য রাজপথে। যে কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক (প্রাক্তন) মনসুর মুসার মত সহজ সরল গোবেচারা স্বভাবের মানুষও সন্ত্রাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হন। অরাজনৈতিক সহজ সরল বাবার বয়সী অফিসগামী অফিসার কর্মচারীদের সন্ত্রাসীদের দ্বারা দিগম্বর হয়ে মান-সম্ভ্রম খোয়াতে হয়।

সবার জানা না থাকলেও অনেকেরই জানা থাকবার কথা যে, প্রটাগোরাস, জর্জিয়াস, প্রডিকাস এবং হিপ্পিয়াস এই চার সফিস্ট দার্শনিক তর্কযুদ্ধে সক্রেটিসের নিকট পরাজিত হওয়ার কারণে প্রতিহিংসাবশত সক্রেটিসের বিরুদ্ধে বানোয়াট অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। যা সক্রেটিসকে মৃত্যুদণ্ড দেবার ক্ষেত্রে আদালতকে প্রবলভাবে প্রভাবিত

www.pathagar.com

করেছিল। দার্শনিক এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে নিরহংকার, নির্লোভ, নিষ্কলুষ, নির্দলীয়, মুক্তচিন্তার অধিকারী এবং সর্বজনগ্রাহ্য সত্যসন্ধানী হবার কথা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, উল্লিখিত চার সফিষ্ট দার্শনিক এ সকল নীতি আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। ফলে সত্য সন্ধান এবং সত্য প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে তারা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করবার মত মারাত্মক খেলায় মেতে উঠেছিলেন। তারা বুদ্ধির মারপ্যাঁচ এবং তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে লোক ঠকিয়ে সুবিধা আদায়ের মাধ্যমে জীবন উপভোগ করতেন। সহজ সরল মানুষের ক্ষতিসাধন করে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন। তাদের এই অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে সক্রেটিস সোচ্চার হয়েছিলেন এবং তর্কযুদ্ধে তাদেরকে পরাস্ত করে তাদের অন্যায় অপকর্মের কথা জনসমক্ষে ফাঁস করে দিয়েছিলেন। যে কারণে সফিস্ট দার্শনিকরা সক্রেটিসের উপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং তাদের অন্যায় অপকর্ম নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাবার জন্যে ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন রাখবার জন্যে সক্রেটিসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিলেন এবং বানোয়াট, মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপনের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড দিতে আদালতকে প্রভাবিত করেছিলেন।

সফিস্ট দার্শনিকরা ঈশ্বর, ধর্ম এবং বিশেষ কোন মতবাদ কিংবা নীতি আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না। ফলে অন্যের জীবন বিপন্ন করে হলেও শুধু স্বার্থের প্রয়োজনে যে কোন মত কিংবা আদর্শের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করতেন। ঈশ্বর, পরকাল ,পাপ, পুণ্যে বিশ্বাসী ছিলেন না বলেই তারা নিঃসঙ্কোচে অন্যায় অপকর্মে লিপ্ত হতে পারতেন। যে কারণে সৎ, শান্তিপ্রিয় এবং ঈশ্বর বিশ্বাসী নাগরিকদের জন্যে তারা ছিলেন মহাশংকার কারণ।

ভারতীয় চার্বাক দর্শনের অনুসারী নাস্তিবাদী বা নিরীশ্বরবাদীরাও উল্লিখিত সফিস্টদের মত ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন না এবং তারাও লোক ভুলানো কথা ও উল্টাপাল্টা যুক্তিতর্কের সাহায্যে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য প্রমাণে পারদর্শী ছিলেন। সুন্দর সুন্দর বাক্যচয়ন এবং আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গির মায়াজাল বিস্তারের মাধ্যমে তারা সাধারণ নাগরিকদের বিভ্রান্ত করে নিজেদের হীনস্বার্থ উদ্ধার করতেন। ফলে তারা সমাজে নিন্দিত ছিলেন। সফিস্ট এবং চার্বাক কপট দার্শনিকদের এবং তাদের অনুসারী বুদ্ধিজীবী এবং অন্য ব্যক্তিবর্গের নিরীশ্বরবাদিতা এবং কপটতার কারণে সমাজে নিন্দিত হলেও তারা তাদের কপট বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা পরিত্যাগ করেননি। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও তাদের আত্মসেবমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত আছে।

বাংলাদেশের নাস্তিবাদী বা নিরীশ্বরবাদী বুদ্ধিজীবীরা সফিষ্ট এবং চার্বাক দার্শনিকদের হুবহু অনুসারী। উল্টাপাল্টা কথা ও যুক্তিতর্কের মারপ্যাঁচে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করবার ক্ষেত্রে তাদের প্রয়াস সর্বজনবিদিত। তারা নিজের কিংবা নিজেদের স্বার্থে যা বলেন অন্যদের স্বার্থে কিংবা প্রয়োজনে তা বলেন না। অন্যদের বেলায় তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলেন। তারা ঈশ্বর-আল্লাহ এবং ধর্মেও বিশ্বাস করেন না। ঈশ্বর-আল্লাহ এবং ধর্মের কথা উচ্চারিত হলেই তাদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে যায়। অথচ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এবং ভারতীয় উপমহাদেশে যাকে নিয়ে গর্ব করা হয়, যাকে নিয়ে গবেষণা হয়

www.pathagar.com

সেই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার দিনে(২৭ কার্তিক, ১৩০৯) বলেছেন যে, 'বাহিরের জগত এবং আমার অন্তরের ধী এই দুই-ই একই শক্তির বিকাশ- ইহা জানিলে জগতের সহিত আমার চেতনার এবং আমার চেতনার সহিত সেই সচ্চিদানন্দের ঘনিষ্ট যোগ অনুভব করিয়া সংকীর্ণতা হইতে, স্বার্থ হইতে, ভয় হইতে, বিষাদ হইতে মুক্তিলাভ করি'। গেল ২৮ জুন '৯৭ তারিখে বাংলাবাজার পত্রিকার এই পাতাতেই 'শিক্ষক আছেন, গুরু নেই' নামে একটি প্রবন্ধে পূর্বকালের শিক্ষাগুরুরা কতটা সৎ এবং সত্যসন্ধানী ছিলেন, ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন সে বিষয়ে আলোকপাত করেছিলাম বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই গুরুদের আদর্শের অনুসারী ছিলেন বলে তারও প্রশংসা করেছিলাম। কিন্তু আমাদের নিরীশ্বরবাদী বুদ্ধিজীবীরা তাতে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ক্ষুব্ধ বুদ্ধিজীবীদের একজন তার ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আমাকে বলেছিলেন যে, ধর্মই হচ্চে সকল অশান্তি এবং অনাসৃষ্টির মূল। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বর এবং ধর্ম বিশ্বাসী বলে তার চৌদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করেছিলেন। তার মতে রবীন্দ্রনাথ মোটেও ততটা গুরুত্বপূর্ণ কিংবা প্রগতিশীল ছিলেন না। পক্ষান্তরে যৌন সুড়সুড়ি জাগানো উলঙ্গ, অর্ধউলঙ্গ হিন্দি এবং পাশ্চাত্যের লেটনাইট সিনেমার অনুরূপ বিকৃত রুচির সাহিত্য রচনা করে, ছোট খালার সঙ্গে বাবার এবং হাসান ভাইয়ের সঙ্গে চাকরানীর উলঙ্গাবস্থায় অবৈধ যৌন সম্ভোগের দৃশ্য দেখিয়ে (গ্রন্থঃ সব কিছু ভেঙ্গে পরে) বালক মাহবুবকে অবৈধ যৌন সঙ্গমে উৎসাতি করে তারই মাধ্যমে সমাজে অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন তথা ধর্ষণের আকাঙ্ক্ষা প্রচারের মধ্যদিয়ে মধ্যযুগীয় অন্ধকার এবং পাপাচারকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তারা নিজেদেরকে অতি আধুনিক এবং প্রগতিশীল মনে করে থাকেন। প্রগতিশীলতার দাবিদার এই সকল বুদ্ধিজীবী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একান্ত ব্যক্তিগত ধর্মীয় জীবন সম্পর্কেও কটাক্ষ করতে ছাড়েন না। তারা প্রধানমন্ত্রীর ধর্মীয় পোশাক, তসবি এবং পবিত্র হজব্রত পালন সম্পর্কেও প্রবন্ধে নিবন্ধে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করে থাকেন।

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী, যারা ঈশ্বর-আল্লাহ এবং ধর্মে বিশ্বাস করেন না তারা সফিস্ট এবং চার্বাকদের মতই নিজের কিংবা নিজেদের স্বার্থ ছাড়া অন্য কোন নির্দিষ্ট নীতি আদর্শে বিশ্বাস করেন না। তারা আইয়ুব, ইয়াহিয়া, মুজিব, জিয়া, এরশাদ, খালেদার আমলসহ প্রায় সকল আমলেই সুবিধাভোগী ছিলেন। উর্দু ওয়ালাদের কৃপা লাভের আকাঙ্ক্ষায় তারা তাদের সাথে যেমন সুসম্পর্ক গড়েছেন তেমনি আবার কেউ কেউ উর্দুতে চলচ্চিত্রও নির্মাণ করেছেন। অথচ উর্দুর বিদায়লগ্নে তাদেরকে অতি উর্দু বিদ্বেষী বক্তব্য দিতে দেখা গেছে। বেশিদিন আগের কথা নয়। গত বিএনপি সরকারের আমলেও যারা বিএনপি প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন এবং সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছিলেন, এবং যারা সুবিধা লাভের আশায় মন্ত্রী এবং নেতা-নেত্রীদের পেছনে ঘুরঘুর করছিলেন, ক্ষমতার চাকা ঘুরবার সাথে সাথে তাদের সেই প্রেমের চাকাও ঘুরে গেছে। এখন তারা আওয়ামী প্রেমে হাবুডুব খাচ্ছেন। ভাবখানা এমন যে, তাদের মত সাচ্চা আওয়ামী প্রেমিক আর কেউ নেই। কথায় কথায়

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের জয়ধ্বনি দিয়ে এবং একই সাথে একাত্তরে স্বাধীনতা বিরোধী ভূমিকা পালনকারী কাউকে কাউকে দিনে বারকয়েক ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলাবার প্রত্যয় ব্যক্ত করে এখন তারা আওয়ামী নেতা-নেত্রীদের ভীষণভাবে পুলকিত করছেন। পুলকিত করছেন বিএনপির কর্মকাণ্ড এবং হরতালের বিরোধিতা করেও। অথচ বিএনপি আমলে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠমো বিনষ্টকারী, শান্তিপ্রিয় মানুষের শান্তি হরণকারী আওয়ামী লীগের দীর্ঘ কয়েক মাসের হরতাল এমন কি দীর্ঘ ৯৬ ঘন্টার লাগাতার হরতালকেও বলিষ্ঠভাবে সমর্থন দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, এই হরতালের সমর্থনে বিভিন্ন দেশের হরতালের অযৌক্তিক উদ্ধৃতি পর্যন্ত টেনে এনেছিলেন। সে সময় সাক্ষাৎকারেও একজন বুদ্ধিজীবি বলেছিলেন- 'হরতাল ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই। এটা হচ্ছে সর্বশেষ গণতান্ত্রিক অস্ত্র। এ অস্ত্র ব্যবহার করার পরও যদি সরকার বিরোধী দলের দাবি না মানে তবে সংঘর্ষে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই' (আজকের কাগজ, ১৬/১০/৯৫)। লক্ষণীয় যে, হরতালে কাজ না হলে সংঘর্ষে লিপ্ত হবার যে দৃপ্ত ঘোষণা দেয়া হয়েছে তা কোন রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রী দেননি। দিয়েছেন আমাদের দেশের একজন শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবী। সুতরাং এই বক্তব্য থেকেই সুস্পষ্ট যে, আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা কতটা অসহিষ্ণু, দলীয় এবং সন্ত্রাসবাদী।

১১-৯-১৯৯৭।

দার্শনিক সক্রেটিস

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস এবং একজন পত্র লেখক

খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ৪০০ বছর পূর্বেকার কথা। সে সময় এম্পিডোক্লিস নামে একজন গ্রিক দার্শনিক গণতন্ত্রের চর্চা শুরু করেছিলেন। শুরুতে তিনি যেমন অতিমাত্রায় গণতন্ত্রী ছিলেন, তেমনি ছিলেন স্বৈরতন্ত্র বিরোধী। গণতন্ত্র চর্চার ফলে তৎকালে গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে সংঘাত লেগেই থাকতো। দার্শনিক এম্পিডোক্লিস নিজেও সে সংঘাতে শরিক ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে- গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এই দার্শনিক একসময় নিজেই নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করে বসেন। একজন গণতন্ত্রী যখন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন কিংবা সর্বশক্তিমান ঈশ্বররূপে অবির্ভূত হন তখন বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, সেই ঈশ্বররূপী মানুষের কার্যক্রমের সঙ্গে গণতান্ত্রিক আদর্শ ও রীতিনীতির কোনরূপ সম্পর্ক থাকে না। কখনো গণতন্ত্রী, কখনো আবার স্বৈরতন্ত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার এই যে অশুভ প্রচেষ্টা খ্রীষ্টের জন্মের ৪০০ বছর পূর্বে লক্ষ্য করা গেছে তার অবসান আজও হয়নি। আর এ কারণেই পৃথিবীর বহু দেশে গণতন্ত্র আজও নির্বিঘ্ন নয়। নিরাপদ নয়। বহু বিচিত্র স্বার্থের সংঘাতে গণতন্ত্র ক্ষতবিক্ষত। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয় বৃটিশ-ভারতের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে পাকিস্তান নামক দেশটি যখন আত্মপ্রকাশ করে তখন থেকেই গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী শাসকচক্র ও তাদের উচ্ছিষ্টভোগী, পদলেহী এক শ্রেণীর মানুষ গণতন্ত্রের নামাবলী গায়ে চড়িয়ে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থ চরিতার্থ করতে দোর্দণ্ড প্রতাপে মাঠে নেমে পড়ে। সরকারের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কাঠামো থেকে সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত এ দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। যাবতীয় অর্থ-সম্পদ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বঁটোয়ারা করবার মধ্যদিয়ে তাদেরকে দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ও ভাগ্য নিয়ন্তা হিসেবে আবির্ভূত হতে দেখা যায়। এমনিভাবে শোষণ ও বঞ্চনার ইতিহাস দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। একসময় প্রশাসক ও লুটেরাদের প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রে অতিষ্ঠ হয়ে দেশের সর্বস্তরের সচেতন মানুষ হাতে অস্ত্র তুলে নেয়ায় পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশরূপে বিশ্ব মানচিত্রে আবির্ভূত হয়। কিন্তু তারপর। তার পরও কি দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে ? পারেনি। পারেনি কারণ একই কৌশলে নব নব লুটেরা দলের আবির্ভাব ঘটেছে। ফলে গণতন্ত্র বার বার বিপন্ন হয়েছে এবং সেই সাথে 'বাঙালি' ও 'বাংলাদেশী' জাতীয়তাবাদের গুরুতর সমস্যা যুক্ত হওয়ায় সমগ্র জাতি মূলত দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এই দুই শিবিরকে কেন্দ্র করেই বর্তমানে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের অসহনীয় চর্চা চলছে। ফলে একপক্ষ ক্ষমতায় বসবার সাথে সাথেই স্বৈরাচার আখ্যায়িত করে ক্ষমতাচ্যুত করতে মাঠে নেমেছে

www.pathagar.com

অন্য পক্ষ। কেউবা আবার অস্ত্রের জোরে নিজেই স্বৈরাচাররূপে ক্ষমতার মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছে। সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি ক্ষমতায় বসলেও সহযোগিতার পরিবর্তে আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিপক্ষ তাদেরকে স্বৈরাচার আখ্যায়িত করেছে এবং ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে বাধ্য করেছে। সর্বশেষে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় বসতে না বসতেই প্রতিপক্ষ দ্বারা স্বৈরাচার আখ্যায়িত হতে শুরু করেছে। এই হচ্ছে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের স্বরূপ কিংবা ধারা। এই গণতন্ত্রের ধারায় 'সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ' কিংবা 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস' কথাটি বলা হলেও এই শক্তিধর সম্মানীত জনগণকেই গণতন্ত্রের বলি হতে হচ্ছে। অতীতেও হয়েছে, বর্তমানেও হচ্ছে এবং হয়তো ভবিষ্যতেও হবে। গত বছরে কত সংখ্যক মানুষ গণতন্ত্রের বলি হয়েছে তার পরিসংখ্যান পাওয়া যায় বাঙালি ও বাংলাদেশী গণতন্ত্রীদের পরস্পরের বিরুদ্ধে উচ্চারিত তথ্যে। গত নির্বাচনে পোস্টার, লিফলেটসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম এবং দেশের বিভিন্ন দলের অনুসারী পত্রপত্রিকা ও দৈনিকের মাধ্যমে অনেকেই এ বিষয়ে অবহিত হয়েছেন এবং হচ্ছেন। মানুষ হত্যার এই গণতন্ত্র দেশবাসী নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করে না। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে জনগণ না চাইলেও এ চর্চা অব্যাহত আছে। এই জন্যেই দার্শনিক প্লেতো গণতন্ত্র বিরোধী ছিলেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তার গুরু সক্রেটিসকে বিষপানে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য করা হলে তিনি গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আরো অধিক পরিমাণ বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেন। মানবপ্রেমী প্লেতো না চাইলেও পৃথিবীর অনেক দেশেই এই মানব হন্তারক গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত আছে। বাংলাদেশ এই ধারার গণতন্ত্র থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করেও কোন এক অদৃশ্য কারণে বার বার ব্যর্থ হয়ে চলেছে। শুধু তাই নয় বর্তমানে জাতির পিতার প্রসঙ্গ, জাতীয়তাবাদের বিতর্ক এবং বিভিন্ন দলের বাক-বিতণ্ডা ও কাদা ছোড়াছুড়ি গণতন্ত্র ও জাতীয় সংসদের ভবিষ্যতকেও বিপন্ন করে তুলেছে। বিপন্ন করে তুলেছে গোটা জাতির ভবিষ্যতকে। কারণ ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা দলীয় স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত কিংবা জাতীয়তাবাদের বিকৃতি যে সমগ্র জাতিকে ধ্বংস করে দিতে পারে তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে।

C. Loyd, Democracy and its Rivals, C.D. Burns, political Ideals Harold J. Laski, A Grammar of Politics, প্রভৃতি গ্রন্থ রোমন্থনপূর্বক যে সারসংক্ষেপ পাওয়া যায় তাতে জাতীয়তাবাদকে ধর্মোন্মাদনার সমতুল্য গণ্য করা হয়েছে। কারণ ধর্মের মতই জাতীয়তাবাদ গভীর প্রেরণাপ্রসূত। ধর্মোন্মাদনায় মানুষ যেমন যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং অত্মাহুতি দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না, জাতীয়তাবাদও সেইরূপ প্রেরণাদায়ক। Democracy and its Rivals- এর লেখক লয়েড অন্তত তাই মনে করেন। জাতীয়তাবোধ এমন একটি অনুভূতি যা একদিকে সমগ্র দেশবাসীকে যেমন ঐক্যবদ্ধ করে তেমনি আবার সমগ্র বিশ্বসমাজের জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধ আনয়ন করে। এ অভিমত লাস্কির। এছাড়া অন্যান্যের অভিমতেও একথা স্পষ্ট যে, ভাষা, সাহিত্য ও আদর্শগত ঐতিহ্য বন্ধনে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়। মধ্যযুগে এ জাতীয় ঐক্যচিন্তাপ্রসূত চেতনাবোধ জাগ্রত ছিল না। চতুর্দশ শতকেই এর শুরু। ইতালিকে একীভূত করার ম্যাকিয়াভেলির প্রচেষ্টার

www.pathagar.com

ফলেই সে সময় জাতীয় চেতনার প্রথম উন্মেষ ঘটে বলে তাকে জাতীয় চেতনার প্রথম উন্মেষকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কান্ট, হেগেল, শিলার, গেটে প্রভৃতি মনীষীর রচনার মধ্য দিয়ে এই চেতনার নবরূপায়ণ ঘটে। তবে ম্যাকিয়াভেলি জাতীয়তাবাদের নামে যে 'রাষ্ট্রনীতি' নির্ধারণ এবং প্রচার করেছিলেন তা তার ব্যক্তিগত নীতিবোধ হতে রাষ্ট্রীয় নীতিবোধকে বিচ্ছিন্ন করেছিল, যা মানবতার জন্যে কল্যাণকর ছিল না। ম্যাকিয়াভেলির এই নীতিবোধের পরিণতি সমগ্র বিশ্বের জন্যে শিক্ষণীয় হয়ে রয়েছে। কারণ তার নীতি এটা সুস্পষ্ট করেছে যে, প্রকৃত জাতীয়তাবাদ যেরূপ মানব কল্যাণে সহায়ক তেমনি এর বিকৃতি মানবতা ও সভ্যতা ধ্বংসেরও কারণ।

ম্যাকিয়াভেলির রাষ্ট্রচিন্তা ও জাতীয়তাবোধের নীতি বাংলাদেশের জনগণের জন্যে সুখের ইঙ্গিত নয় বরং এক ভংঙ্কর ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিত করে। কারণ বাংলাদেশের রাষ্ট্রনায়কদের চিন্তা-চেতনা এবং জাতীয়তাবোধের নীতি ম্যাকিয়াভেলি চিন্তা-চেতনা ও জাতীয়তাবোধের নীতির সমার্থক। তারা ব্যক্তিস্বার্থ ও দলীয় স্বার্থের উর্ধে উঠতে পেরেছেন- এমন দৃষ্টান্ত নেই বললেই চলে। যে কারণে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে জেলে পচতে হয়। যে কারণে দল ও দলীয় প্রধানদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি হয়। শুধু তাই নয়, সত্য সন্ধানী যে সংবাদ মাধ্যম ও দেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে নিরপেক্ষ থেকে জাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবার কথা, সেই সংবাদ মাধ্যম ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় স্বার্থের মোহে সততা ও আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে বিশেষ বিশেষ দল এবং দলীয় প্রধানদের নির্লজ্জ পদসেবকরূপে আবির্ভূত হতে দেখা যায়। সামান্য স্বার্থে দল থেকে দলে ছুটোছুটি করতে দেখা যায়। দেখা যায় নীতিবিগর্হিত কাজে আত্মনিয়োগ করতে। আমরা দার্শনিক সক্রেটিসের কথা জানি, যিনি নীতির ক্ষেত্রে কখনো আপোষ করেননি বরং ক্ষমতাসীনদের দেয়া মৃত্যুদণ্ডকেই স্বাগত জানিয়েছিলেন। অথচ আমাদের সমাজের সর্বস্তরে আজ আত্মমর্যাদাহীন, মেরুদণ্ডহীন, পচে যাওয়া, গলে যাওয়া মানুষের কি প্রচণ্ড ভিড়। তাদের নির্লজ্জ গলাবাজি, লাফালাফি, দাপাদাপি, সবই স্বার্থের জন্যে, পদের জন্যে, পদবির জন্যে। এই স্বার্থ, পদ ও পদবির জন্যে স্তাবকী স্তননের মালা গাঁথেন তারা। তারা কলম ধরেন স্তুতিবাক্য আওড়ানোর জন্যে। তারা সমাজের সমস্যার কথা বলেন, সমস্যা সমাধানের কথা বলেন কিন্তু স্তাবকতা ছাড়েননা। ছাড়তে পারেন না। আর সে কারণেই বিশেষ একটি দলকে টার্গেট করে প্রধানমন্ত্রীকে বলতে পারেন সন্ত্রাস বন্ধ করতে গেলে শুধু সন্ত্রাসীদের ঠেকালে ও ধরলে চলবে না। সন্ত্রাসীদের মালিক কারা, রক্ষাকারী কারা, চালনাকারী কারা, বেনিফিশিয়ারি কারা, গডফাদার আর মাদার কারা সবশুদ্ধ ধরে ফেলতে হবে। গাছ কাটার মত করে ছাঁটতে হবে। কাটতে হবে। পাতা ঝরান। শাখা কাটেন। ডাল কাটেন। তারপর মোটা গুড়িতে হাত দেন। সন্ত্রাস কেন বন্ধ হবে না ? সন্ত্রাস বন্ধ হবে। সন্ত্রাসের বাপ বন্ধ হবে। সন্ত্রাসের মা বন্ধ হবে। সব বাক্সে পুরে বঙ্গোপসাগরে ফেলে দিয়ে আসেন (২০/৭/৯৬ তারিখে একটি দৈনিকে প্রকাশিত প্রবন্ধের অংশ)। কথাগুলো প্রবন্ধকার এমনভাবে বলেছেন যেনো যাকে উদ্দেশ্য করে বলা তার দলে সন্ত্রাস কিংবা সন্ত্রাসী নেই। যেনো দেশের সকল

www.pathagar.com

সন্ত্রাসী ঐ নন্দ ঘোষের দলের। বাকি সমস্ত দল ধোয়া তুলসি পাতা। একই প্রবন্ধে বলা হয়েছে, 'কোন প্রধানমন্ত্রী কারোর ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে না তবে সন্ত্রাস বন্ধ করতে পারে'। কথাটি ঠিক নয় বরং উল্টোটাই ঠিক। কারণ কোন রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রধানমন্ত্রীই সন্ত্রাস বন্ধ করতে পারেননি। তবে অনেকের ভাগ্য পরিবর্তন করেছেন অনেকেই। সন্ত্রাস বন্ধ করতে পারেননি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, পারেননি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, পারেননি প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, পারছেন না বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এদের সময়কালে ভাগ্য পরিবর্তন হয়েছে অনেকের। যাদের কিঞ্চিৎ সম্পদ ছিল তারা নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়েছে। যাদের কিছুই ছিল না তারা অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে কিংবা অভুক্ত থেকে থেকে দেহত্যাগ করেছে। পক্ষান্তরে অনেকে রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। অনেকে বিশাল বিশাল বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। সুতরাং একজন প্রধানমন্ত্রী কারোর কারোর ভাগ্য পরিবর্তনই করতে পারেন, সন্ত্রাস বন্ধ করতে পারেন না। সন্ত্রাস বন্ধ করতে হলে দলমত নির্বিশেষে সকলের ঐকমত্যের প্রয়োজন হবে। আর এজন্যে সকল দলের আস্থা ও সমর্থন অর্জনের প্রক্রিয়াকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। মনে রাখতে হবে একজন অস্ত্র হাতে নিলে তাকে প্রতিরোধ করতেই আর একজন অস্ত্র হাতে নেয়। সুতরাং একজনের হাতে অস্ত্র রেখে আরেকজনকে নিরস্ত্র করতে গেলে অস্ত্র উদ্ধার সম্পূর্ণ সফল হবে না এবং তা না হলে বহুল আলোচিত সন্ত্রাস দমনও সম্ভব হবে না। সন্ত্রাসী সকল দলেই রয়েছে এবং অস্ত্রও সকল দলের সন্ত্রাসীদের হাতেই যে রয়েছে তার প্রমাণও দেশের পত্রপত্রিকা প্রায় প্রতিদিনই অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তুলে ধরছে। পত্রপত্রিকা এটাও প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে যে, অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই দেশের বিভিন্ন দল তাদের সন্ত্রাসীদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে। এখন যাদেরকে সন্ত্রাসী বলে ঘৃণা করা হচ্ছে তারা কেউই (রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে) নিজের গরজে কিংবা স্বইচ্ছায় সন্ত্রাসী হয়নি। তাদেরকে সন্ত্রাসী বাননো হয়েছে। সুতরাং যারা সন্ত্রাসী বানানোর জন্যে দায়ী তাদেরকেই সন্ত্রাসীদের সম্মানজনক পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিতে হবে। সকল অপরাধের দায়দায়িত্ব সন্ত্রাসীদের উপর চাপিয়ে নিজেরা সাধু সাজতে চাইলে চলবে না। সকল দিক বিবেচনাপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ কতে হবে এবং ভবিষ্যতে সন্ত্রাস যাতে প্রতিষ্ঠা না পায় তারও পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। একই সাথে সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে নিয়োজিত পুলিশ বাহিনী যাতে নির্ভয়ে, নির্দ্বিধায় এবং নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। আমরা প্রায়ই পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের সম্পর্কে নানাবিধ অভিযোগ পত্রপত্রিকায় দেখে থাকি। ব্যতিক্রম ছাড়া তারা যে সকল অভিযোগের জন্যে দায়ী নয় তা আমরা অনেকেই ভেবে দেখি না, কিংবা দেখতে চাই না। কিন্তু একথা তো অস্বীকার করবার উপায় নেই যে সন্ত্রাসীদের কর্মকাণ্ড যেমন বিশেষ বিশেষ স্থান থেকে নিয়ন্ত্রিত , পুলিশ বাহিনীর কর্মকাণ্ডও তেমনি ক্ষমতার কেন্দ্র কিংবা অন্য কোন স্থান থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়। অদৃশ্য রশিতে বাঁধা থাকেন এ সংস্থার সদস্যবৃন্দ। যে কারণে ৩০/১/৯৫ তারিখে 'চাঁদার ব্যাকরণ' শিরোনামের এক প্রবন্ধে লিখেছিলাম-'এখন ব্যবসায়ী মহল নিজেরাই

www.pathagar.com

বলছেন তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতা-নেত্রীদের চাঁদা দিয়ে থাকেন। যে চাঁদা বা অর্থের জোরে বিভিন্ন দলীয় নেতা-কর্মীরা দেশের সর্বত্র শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। নির্বাচনের প্রাক্কালে অনেক প্রার্থী কালো টাকার জোরে ভোট ক্রয় করে থাকেন। ... মন্ত্রাণালয়, এজি, রাজউক, বিদ্যুৎ, টেলিফোন সর্বত্রই একই অবস্থা। ... পুলিশের তো দোষের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। অন্তত পত্রপত্রিকায় তাদের সম্পর্কে খবর পড়লে তাই মনে হয়। যেনো পুলিশ হওয়াটাই তাদের জন্যে মহা অপরাধ। পুলিশ কি ভিন্ন গ্রহের মানুষ যে সৎ হবার পুরো দয়িত্ব শুধু তাদেরই। পুলিশকে অসৎ করে কারা? বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, দেশের সমাজপতি, ব্যবসায়ী এবং উর্ধতন ক্ষমতাশালী ব্যক্তিবর্গই তাদেরকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে গিয়ে অসৎ পথে পরিচলিত করে। আর এই সুযোগে সমাজের অসৎ চোর-বাটপাড়রা পর্যন্ত পুলিশ সম্পর্কে নানা কটু কথা বলার সাহস অর্জন করে'। সুতরাং আমাদের দেশের গর্ব পুলিশ বাহিনী সম্পর্কে সমালোচনা করবার কিংবা কটু কথা বলবার যে ছিদ্রপথ তৈরি হয়ে আছে সেগুলো অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। পুলিশ বাহিনী যে আমাদের গর্বের কারণ হতে পারে বহুবার তার প্রমাণ তারা রেখেছন। সুতরাং যথাযথভাবে কাজ করবার সুযোগ, প্রয়োজনীয় সহায়তা এবং কর্মের সম্মানজনক স্বীকৃতি পেলে স্বল্পতম সময়ের মধ্যেই যে তারা শান্তি, শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত-করতে সক্ষম হবে সে বিশ্বাস আমার মত অনেকেরই আছে বলে বিশ্বাস করি।

গত ১৭ জুলাই '৯৬ 'প্রধানমন্ত্রীকে সতর্ক থাকতে হবে' শিরোনামের এক প্রবন্ধে দেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত পুলিশ বাহিনীর কতিপয় সদস্যের অনৈতিক কর্মকাণ্ডের উদাহরণ দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলেছিলাম। যাতে সাধারণ নিরীহ নাগরিকবৃন্দ হয়রানির শিকার না হন। বলেছিলাম সন্ত্রাস নির্মূল সংক্রান্ত সেমিনার, সেমিনারের সিদ্ধান্ত এবং সন্ত্রাস দমন অভিযান উপলক্ষে। আমার লেখাটি প্রকাশিত হবার পর পুলিশ বাহিনীর একজন সম্মানীত সদস্য সেটি পড়ে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে একটি পত্র লিখেছেন। পত্রে তাদের সন্তানেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে কিভাবে অস্ত্রের শিক্ষা নিয়ে ফিরছে এবং তাদের সেই অস্ত্রবাজ সন্তানদের জন্যে তারা সমাজে কিভাবে হেয় পতিপন্ন হচ্ছেন তার বেদনাদায়ক বর্ণনা দিয়ে এর জন্যে আমাদের শিক্ষক সমাজকে দায়ী করতে সচেষ্ট হয়েছেন। পত্র লেখক যে নিতান্ত অভিমানভরেই অভিযোগটি করেছেন তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। কারণ তিনি ভালো করেই জানেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস রাজনৈতিক। সুতরাং এই রাজনৈতিক সমস্যার কাছে পুলিশ যেমন তেমন শিক্ষকরাও বড় অসহায়। শিক্ষক এবং পুলিশ কেউ কারো প্রতিপক্ষ নয়। প্রতিপক্ষ হবার কোন সুযোগ নেই। অথচ পুলিশের অনৈতিক কর্মকাণ্ডের কথা উল্লেখ করায় পত্রলেখক প্রতিপক্ষ ভেবেছেন। অন্যায় কিংবা অনৈতিক যে কোন কর্মকাণ্ডের জন্যে শিক্ষক, পুলিশসহ যে কারো সমালোচনা করবার অধিকার রয়েছে। আর তাছাড়া পুলিশের কিছু কিছু কর্মকাণ্ডের সমালোচনা হচ্ছে বলেই যে যাবতীয় দোষক্রটি কেবল পুলিশই করছে আর সবাই ধোয়া তুলসি পাতা এমনটি ভাববারও কোন সঙ্গত কারণ নেই। গোটা সমাজই আজ পঙ্কিলে

www.pathagar.com

নিমজ্জিত। রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রী, আমলা, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের মহান পেশায় নিয়োজিত অধ্যাপকদের সম্পর্কেও কড়া সমালোচনা হচ্ছে। সমালোচনা আত্মশুদ্ধির পথ উন্মুক্ত করে বলেই আমার বিশ্বাস। এবং এ-ও বিশ্বাস করি যে, সমালোচনা সকলকে অন্যায় আকর্ষণ থেকে রক্ষা করে। কোন যুক্তিতেই কোন অন্যায়কে যে সমর্থন করা য়ায় না তা নিশ্চয়ই পত্র লেখক বিশ্বাস করেন। অন্যায় অন্যায়ই। অন্যায় থেকে সমাজকে, দেশকে, দেশের মানুষকে রক্ষা করা আমাদের সকলের দয়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করতে হলে সকলকে অবশ্যই প্রকৃত গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় উজ্জীবিত হতে হবে। এ প্রেরণা ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলীয় স্বার্থে নয়, রাষ্ট্রীয় কিংবা জনস্বার্তে উদ্দীপ্ত হতে হবে। অন্যথায় ধ্বংসই অনিবার্য হবে। ১২-৮-১৯৯৬।

www.pathagar.com

সূর্যাস্ত আইনের পোস্টমোর্টেম

যৌন সম্পর্ক স্থাপনে অক্ষম রোগীর চিকিৎসক মহিলা ডাক্তারদের রোগীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে রোগীর সুস্থতা ও যৌনক্রিয়ায় সফলতা নিরূপণ, বাসা-বাড়ী-ফ্ল্যাটে ছেলেমেয়েদের উপস্থিতি সত্ত্বেও বয়ফ্রেণ্ড/গার্লফ্রেণ্ডদের সঙ্গে সিঙ্গল প্যারেন্টসদের যৌন সম্পর্ক স্থাপন, স্কুলপড়ুয়া অপ্রাপ্ত বয়স্কা ছাত্রীদের যৌনজীবন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে পাশ্চাত্যের টেলিভিশনে হরহামেশাই দশর্ক-শ্রোতার উপস্থিতিতে খোলামেলা আলোচনা হয়ে থাকে এবং রোগীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনকারী মহিলা ডাক্তার, সিঙ্গল প্যারেন্টস এবং ছাত্রীরা তাদের যৌন সম্পর্ক স্থাপন সম্পর্কে প্রশ্নকর্ত্রীর বিভিন্ন প্রশ্নেরও খোলামেলা উত্তর দিয়ে থাকে। আজ থেকে ১০ বছর আগে আমেরিকার বিভিন্ন চ্যানেলে যখন এ সমস্ত অনুষ্ঠান দেখেছি এবং অলোচনা শুনেছি তখন মনে হয়েছে বাংলাদেশের কাউকে এসব বিষয়ে আলোকপাত করলে হয়তো কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না। দ্বিতীয়ত হয়তো তারা লজ্জায় শুনতেই চাইবে না, অথবা আমাকেই নির্লজ্জ বেহায়া ভাববে। এজন্য বিষয়গুলি কখনও প্রকাশই করিনি। কিন্তু এখন দেখছি আমার প্রকাশ করা না করায় কিছু যায় আসে না। এখন ডিসের বদৌলতে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে উল্লিখিত বিষয়গুলি নিয়মিতই আলোচিত হচ্ছে। স্টার টিভিতে ডোনাহিউ নামক সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ক'দিন আগেই স্কুল পড়ুয়া অপ্রাপ্ত বয়স্কা ছাত্রীদের যৌনজীবন সম্পর্কে এরূপ একটি অনুষ্ঠান প্রচারিত হতে দেখলাম। অন্যান্য অনুষ্ঠানও অন্যেরা দেখেছে বলে জানা গেল। এতো গেল যৌনজীবন সম্পর্কের কথা। এছাড়াও রয়েছে তাদের সামাজিক আচার-আচরণের বিচিত্র ধরনের জীবনালেখ্য। যেমন দিনকয়েকের ব্যবধানে কোন নারী পুরুষ মিলিত হলে একে অপরকে বুকে চেপে ধরে সৌজন্য ও কুশল বিনিময় করে থাকে। যা আমাদের সমাজে অসৌজন্য আচরণ বলে গণ্য হওয়াই স্বাভাবিক। আমি দেশে ফিরে বিমানবন্দরে আমার স্ত্রীকে বুকে জড়িয়ে কুশল বিনিময় করবো কিনা ফরেইন স্টুডেন্টস এ্যাডভাইজার অমাকে একথা জিজ্ঞেস করলে বলেছিলাম- এটা তোমাদের দেশেই সম্ভব, আমাদের দেশে নয়। তোমাদের দেশের নিয়ম, রীতি, পদ্ধতি আমরা ভাবতেও পারিনা। সুতরাং যে বিষয় নিয়ে আমরা ভাবি না, যে বিষয়ে আমাদের প্রচার মাধ্যমে আমরা আলোচনা করি না, যে সংস্কৃতি ও রীতি-নীতির আমরা চর্চা করি না, যে বিষয়কে আমরা আমাদের বিষয় ভাবি না সেই সমস্ত বিষয় যখন আমাদের ঘরে ঘরে আজ ডিসের মাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে তখন আমাদের মত ভিন্ন সংস্কৃতি ও রীতি-নীতিতে অভ্যস্ত অভিভাবকবৃন্দ সমাজ ও

www.pathagar.com

ফরেইন স্টুডেন্ট এ্যাডভাইজারের সঙ্গে লেখক ড. আব্দুস সাত্তার

তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য উদ্বিগ্ন না হয়ে পারেন না। অভিভাবকদের এই উদ্বিগ্নের কথাই আমি গত ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে বাংলাবাজার পত্রিকায় উল্লেখ করে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। উল্লেখ করেছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ৪ দফা দাবির প্রেক্ষিতে। প্রবন্ধে আমাদের দেশের অভিভাবকদের অধিক দুশ্চিন্তা করা এবং পাশ্চাত্য জগতে অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা না করবার কারণসমূহের ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম। পাশ্চাত্যের নারী-পুরুষের সমঅধিকার এবং সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা ভোগেরও একটি স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরেছিলাম। এবং সেই সাথে একথাও স্পষ্ট করেই উল্লেখ করেছিলাম যে, পাশ্চাত্যের সেই সমঅধিকার ও স্বাধীনতা ভোগের বিষয়গুলি আমাদের দেশে অকল্পনীয়।

উল্লিখিত বিষয়গুলি তুলে ধরেছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীদের সমঅধিকার ও রাত ৯টা পর্যন্ত হলের বাইরে থাকতে দেবার দাবি এবং তাদের আইন অমান্য আন্দোলনের প্রেক্ষিতে। ছাত্রীদের মতে রাত ৯টা পর্যন্ত হলের বাইরে থাকতে না দেয়া সংবিধান এবং

www.pathagar.com

মানবাধিকার পরিপন্থী। কারণ সংবিধানে নারী-পুরুষের সমঅধিকারের কথা বলা হয়েছে। একদিকে তাদের এই সমঅধিকারের দাবি অন্যদিকে আবার রাত ৯টা পর্যন্ত হলের বাইরে থাকতে দেবার দাবিটি পরস্পর বিরোধী মনে হওয়ায় আমার 'খটকা' লেগেছে বলে উল্লেখ করেছিলাম। এবং বলেছিলাম সমঅধিকার প্রশ্নে কেবল মাত্র রাত ৯টা পর্যন্ত ছাত্রীদের হলের বাইরে থাকতে দিলেই সেই অধিকার পূর্ণ হয় এবং সংবিধানসম্মত হয় কিভাবে? কারণ ছাত্ররাতো রাত ৯টার পরেও হলের বাইরে যাতায়াতের অধিকার রাখে। প্রবন্ধের সমাপ্তি টেনে বলেছিলাম- 'আইন অমান্য করে নয়, ন্যায়সঙ্গতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, অভিভাবকবৃন্দ, সচেতন ছাত্রসমাজ এবং সমাজের সর্বস্তরের গণ্যমান্য সকলের অভিমতের সঙ্গে একাত্ম হয়েই ছাত্রীদের এর একটি সম্মানজনক সমাধান বের করা উচিত। কারণ এর সঙ্গে আমাদের দেশের পরম্পরাগত অতি প্রাচীন ঐতিহ্যের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। যে ঐতিহ্য আমাদের গর্বের, অহংকারের। যাকে আমরা লালন করতে চাই।' অথচ প্রগতিশীল ও উদারপন্থী নামে পরিচিত ঢাকার দুইটি দৈনিকে ততোধিক উদার ও প্রগতিপন্থী দুইজন প্রবন্ধকার আমার বক্তব্যকে বিকৃতরূপে প্রচার করে পুরো বিষয়টিকেই ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এদের মধ্যে নারী আন্দোলনের নেত্রী মালেকা বেগম, যিনি গত ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'সূর্যাস্ত আইন তুলে দেওয়া হোক' শিরোনামে ভোরের কাগজে এবং মোহাম্মদ রসিদুজ্জামান সংবাদ-এ ২০ ফেব্রুয়ারী তারিখে 'সান্ধ্য আইন থাকবে না, তুমি নিশ্চিন্ত থেকো' এই শিরোনামে 'সূর্যাস্ত অইনের পোষ্টমোর্টেম' করেছেন। এই আইনের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও নাড়ীভূড়ি কাটাছেঁড়া ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁরা তাঁদের রিপোর্ট পেশ করে বলেছেন যে, স্বাভাবিকের চেয়ে অধিক বয়সকালের কারণে এই আইন লাশে পরিণত হয়েছে। যে লাশ পচন ধরায় চতুর্দিকে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পরিবেশকে দূষিত করছে বিধায় অনতিবিলম্বে লাশ কবরস্থ করতে হবে। শুধু তাই নয় লাশ কবরস্থ করবার যে রীতি-পদ্ধতি ও ঐতিহ্য রয়েছে এবং তা পালনের জন্য যে সময়ের প্রয়োজন তাঁরাসহ অনেকেই সেই সময়টুকু পর্যন্ত দিতে রাজি নন। তাঁদের রিপোর্টের কোন কোন স্থানে তাঁরা বেশ কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন। হয়তো ডাক্তারী ভাষা/শব্দ হবে। যা সাধারণত কোন শিক্ষিত, মার্জিত ও রুচিবোধের সাধারণ মানুষ কখনও ব্যবহার করেন না। রাত ৯টা অবধি ছাত্রীদের হলের বাইরে থাকতে দিলে তারা গর্ভবতী হয়ে পড়বে। তাদের গর্ভধারণের সম্ভাবনা দেখা দেবে, আমার প্রবন্ধের গভীরে তাঁরা যে এরূপ অলীক স্বপ্ন দেখেছেন রিপোর্টে সেকথাও উল্লেখ করেছেন। এবং বলেছেন মেলামেশা ও গর্ভধারণের জন্য নাকি রাতের প্রয়োজন হয় না, দিনের যে কোন সময়ই সেটা সম্ভব। বলেছেন ছাত্রীরা সমঅধিকারের দাবি করেছে বলে নাকি আমার 'খটকা' লেগেছে বলেছি। এবং .. পাশ্চাত্যের পাশাপাশি রুমে ছাত্রছাত্রী বসবাস করতে গিয়ে গর্ভধারণ করলেও সমাজে হেয় হয় না অথচ আমদের দেশে হতে হয়, এমন উদ্ধৃতিও নারী আন্দোলনের নেত্রী আমার প্রবন্ধে আবিষ্কার করেছেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে আমার প্রবন্ধের কেথাও এ সকল বক্তব্য নেই। ছাত্রীদের

www.pathagar.com

গর্ভধারণের বিষয়টির উল্লেখ আছে কেবলমাত্র পাশ্চাত্যের সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রে। নারী আন্দোলনের নেত্রী আমাকে উদ্দেশ্য করে আরও বলেছেন-'তিনি আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য বিরুদ্ধ দাবি তোলার বিপক্ষে।' তাঁর এই বক্তব্য উদ্ধৃত করবার প্রেক্ষিতে একথা ভাবা স্বাভাবিক যে, তিনি নিজে আমাদের ঐতিহ্য রক্ষার বিপক্ষে। পুরুষদের সঙ্গে করমর্দনের পরিবর্তে মিষ্টি হাসি দিয়ে ভাবগম্ভীর পরিবেশে আমাদের ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী দলের দুই নেত্রী সৌজন্য ও সুশীলতা প্রদর্শনের যে ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছেন জানি না তিনি তারও বিরুদ্ধে কিনা। হতে পারে সমঅধিকারভোগী নারী-পুরুষের বুকে বুকে পিষ্ট করা পাশ্চাত্যের ঐতিহ্যই তাঁর অধিক পছন্দ। কিন্তু আবারও বলতে হচ্ছে আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য বিরুদ্ধ ঐরূপ পশ্চিমী ঐতিহ্য আমাদের কাম্য নয়।

উল্লিখিত দুই প্রগতিশীল প্রবন্ধকার ছাড়াও আরও অনেকেই ছাত্রীদের আন্দোলনের বিষয়কে নানাভাবে বিশ্লেষণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী সরাসরি আন্দোলনরত ছাত্রীদের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। অধ্যপক শামসুল হক কৌশলী মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন- পুরোনো আইনটি যুগোপযোগী হওয়া প্রয়োজন। পাশাপশি এ বিষয়ে অভিভাবকদেরও মতামত নেয়া প্রয়োজন। অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান সরাসরি সূর্যাস্ত আইন বাতিলের বিরোধিতা করে বলেছেন পরিচ্ছন্নতা এবং পরিশুদ্ধতার দিকে লক্ষ্য রেখেই ছাত্রীনিবাসে প্রচলিত নিয়মনীতি বলবৎ থাকা বাঞ্ছনীয়। উল্লেখ্য যে, উল্লিখিত তিনজনই প্রাক্তন উপাচার্য। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ মনোয়ার উদ্দিন (ডীন, সমাজবিজ্ঞান অনুষদ) বলেছেন, কোন পরিবারের অভিভাবকই চান না তার মেয়েটি রাতে ঘুরে বেড়াক। ডঃ অনোয়ার হোসেন (চেয়ারম্যান, ইতিহাস বিভাগ) বলেছেন- ছাত্রীদের এ দাবি অযৌক্তিক। পাগলের প্রলাপ। গুটিকয়েক ছাত্রী আন্দোলনের নামে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে; আর গুটিকয়েক এনজিও নেতা আন্দোলনে সমর্থন দিয়েছে। তথ্য বাংলাবাজার পত্রিকার,(৮/৩/৯৫)। এছাড়া একই পত্রিকায় একজন প্রবন্ধকার বলেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষিত মেয়ে হওয়ায় এবং বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাওয়ায় তাদের ক্ষেত্রে যোগ্যতাসম্পন্ন পাত্র পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে। আর এ কারণেই তারা সূর্যাস্ত আইন বাতিলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে (১৯/২/৯৫)। সূর্যাস্ত আইনের সাথে মেয়েদের বিয়ের সম্পর্ক জুড়ে দিয়ে প্রবন্ধকার কি বুঝাতে চেয়েছেন জানি না। তবে তিনি এই আইনের বিলোপ চেয়েছেন। প্রবন্ধকারের সাথে আমার বাসায় একদিন কথা হচ্ছিল। কথায় কথায় জানালেন তিনি একটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। এটি সম্পন্ন করতে পারলে তাঁর দীর্ঘদিনের একটি আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম আপনি তো নারী-পুরুষের সমঅধিকারের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করে সূর্যাস্ত আইন বাতিল করতে বলেছেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অভিন্ন আইন করবার দাবি করেছেন। অথচ আপনি সেই একই ব্যক্তি কোন যুক্তিতে মেয়েদের জন্য আলাদা একটি বিশ্ববিদ্যালয় করতে চাইছেন? তিনি অবশ্য এর কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। আর একজন মহিলা বলেছেন, 'কথায় আছে নরীরা বাল্যকালে বাবার শাসনে, যৌবনকালে স্বামীর শাসনে এবং

www.pathagar.com

বৃদ্ধকালে ছেলের শাসনে থাকে। ফলে নারী কোন বয়সেই স্বাধীন নয়'(বাংলাবাজার পত্রিকা ২/৩/৯৫)। উল্লেখ্য যে, এই বক্তব্যও যথাযথ নয়। কারণ সবাই জানেন যে, নারীরা বাল্যকালে শুধু বাবার শাসনেই থাকে না, মাও সমভাবেই শাসন করেন। অনেক ক্ষেত্রে বাবার চেয়ে মা-ই অধিক মাত্রায় শাসন করে থাকেন। যৌবনকলে শুধু স্বামীই শাসন করে না, শাশুড়ি ননদরাও শাসন করে থাকে। বৃদ্ধকালে ছেলেই শাসন করে না, ছেলের বউ এবং মেয়েরাও শাসন করে। ছেলের বউ অর্থাৎ একজন নারীই শাশুড়িরূপী আর একজন নারীকে কখনও কখনও এতটাই শাসন করে যে, শাশুড়ি ছেলের বউরূপী নারীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেন। সুতরাং উপরের উদ্ধৃতাংশ যে উদ্দেশ্যমূলক তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় নারী-পুরুষ কেউই পাশ্চাত্যের মত বলগাহীন স্বাধীন নয়। কারণ আমাদের রক্ষণশীল সমাজে বাবা-মায়েরা ছেলেমেয়ে যে বয়সেরই হোক না কেন তারা শাসন করেন। কারণ তাঁরা ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যত নিয়ে বড় বেশি উদ্বিগ্ন থাকেন। প্রাপ্তবয়স্ক, সংবিধান, মানবাধিকার কোন কিছুই তাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। যে বয়সেরই হোক তাঁদের কাছে সন্তান সব সময়ই সন্তান। আর তাই আমৃত্যু তাঁরা সন্তানের মঙ্গল অমঙ্গল চিন্তায় উদ্বিগ্ন থাকেন। আর এ কারণেই আমার প্রবন্ধে অভিভাবকদের অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলাম। বোধকরি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও একই কারণে গুরুত্ব দিয়েছে।

সম্প্রতি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় একজন প্রবন্ধকার দেশের কয়েকটি বিশেষ ধরনের পত্রিকার সাথে বাংলাবাজর পত্রিকাকে এক সারিতেফেলে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির দোষে দোষারোপ করেছেন (২৮/২/৯৫সংখ্যা)। প্রবন্ধকারের এই প্রচেষ্টা যে উদ্দেশ্যমূলক তা এদেশের পাঠক সমাজ ভাল করেই জানেন। এও জানেন যে, বাংলাবাজার পত্রিকা তার জন্মলগ্ন থেকেই স্বাধীন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী একটি নির্ভীক বলিষ্ঠ পত্রিকা। যে পত্রিকা কারো রক্তচক্ষুকে গ্রাহ্য করে না। পক্ষান্তরে আলোচ্য তিন প্রবন্ধকারদের পত্রিকাগুলি বাস্তববিবর্জিত বানোয়াট খবরের কাগজ এবং বিশেষ বিশেষ দল ও গোষ্ঠীর মুখপত্র হিসেবে পরিচিত। যে পত্রিকা বানোয়াট এবং ভুল তথ্যের সংশোধিত তথ্য পাঠালেও তা ছাপার প্রয়োজন বোধ করে না, পাছে প্রবন্ধকারদের জ্ঞানের বহর ফাঁস হয়ে যায় এই ভয়ে। তাদের একগুয়েমির এমন উদাহরণের অভাব নেই। এজন্য অবশ্য তাঁদের দোষ দেয়া যায় না। কারণ এই আচরণ তাঁদের ইচ্ছাকৃত নয়। এই আচরণ ও নীতি তাঁদের আদর্শগত। ভুল তথ্য পরিবেশন এবং আক্রমণ করা তাঁদের অন্যতম প্রধান আদর্শ। প্রকৃত অর্থে তাঁরা যদি প্রগতিশীল হতেন তাহলে এতদিনে তাঁদের আদর্শে এবং নীতিতে বিশ্বাসী সমস্ত দেশে প্রগতির জোয়ার বইতো। কিন্তু তা হয়নি। বরং তাঁদের ভাবভঙ্গি ও প্রচারসর্বস্ব উল্টো প্রগতির প্রবল স্রোতে তাঁদের সাধের সাম্রাজ্য গেছে ভেসে। যে সাম্রাজ্যের প্রভুদের অনেক তাবেদারই আজ মত ও নীতি পাল্টিয়ে বলে বেড়াচেছন যে আগে বুঝতে পারিনি সমাজতন্ত্রী, প্রগতিশীলদের মধ্যে লুকিয়ে ছিল অসংখ্য বিষধর সর্পরূপী বিকৃত রুচির মানুষ। যাদের বিষাক্ত ছোবল, যাদের দংশনে ধ্বংস হয়েছে ভিন্ন মতাবলম্বী যুক্তিবাদী প্রকৃত উদারনৈতিক মুক্ত মনের অগণিত মানুষ। এই বিষাক্ত মতাদর্শের মানুষদের কাছে অন্যের অভিমতের

www.pathagar.com

কোন মূল্য নেই। অথচ সর্বক্ষণই তাঁরা ন্যায়নীতি ও গণতন্ত্রের বুলি কপচান। তাঁদের কাজেকর্মে প্রগতির কোন চিহ্ন না থাকলেও তাঁরা স্বঘোষিত প্রগতিশীল। আর এজন্যেই অতি আক্ষেপে ভারতের 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক বলেছেন, 'এইসব প্রগতিশীলরাই পশ্চিমবাংলার কত প্রতিষ্ঠা যে রুগ্ন এবং ঝাঁঝরা করে দিয়েছেন তার সীমা সংখ্যা নেই (১৩/৮/৯৪ সংখ্যা)। দেশ সম্পাদকের এই মন্তব্যে এটা সুস্পষ্ট যে, এদের বক্তব্য, আদর্শ ও নীতি প্রকৃত অর্থে পরস্পর বিরোধী ও প্রগতি পরিপন্থী এবং ধ্বংসাত্মক। তানাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে 'সূর্যাস্ত' আইনেরই কোন অস্তিত্ব নেই তাদের সেই মনগড়া আইনের বিরূপ ব্যাখ্যায় আমাদের ছাত্রীদের 'খারাপ' হবার বা গর্ভধারণের বিষয়টিকে টেনে আনতেন না। পশ্চিমের উদাহরণ টেনে এনে ছাত্রীদের কলঙ্কিত করবার দুরভিসন্ধিমূলক কাজে লিপ্ত হতেন না। এবং রাতে কিংবা দিনে ছাত্রীদের মেলামেশার প্রসঙ্গটিও উত্থাপন করতেন না। কারণ ছাত্রীদের দাবির সঙ্গে এ সকল বিষয়ের কোনরূপ সম্পর্ক নেই। অথচ লক্ষ্যণীয় যে প্রগতিশীল নামে পরিচিত যারাই এ বিষয়ে লিখছেন তারাই এই সকল বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন। অনেকেই বিশ্ববিদ্যায়ল কর্তৃপক্ষকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে দায়ী করেছেন। বিষয়টি হচ্ছে নিয়ম-নীতির। যা কেউ ইচ্ছে করলেই প্রচলন কিংবা বাতিল করতে পারেন না। কারণ সবকিছুর সঙ্গে কতগুলি প্রক্রিয়া যুক্ত থাকে। অথছ উল্লিখিত প্রগতিশীল এবং নারীবাদী পোষ্টমোর্টেমকারী প্রবন্ধকারদের তর সইছে না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কমিটি গঠন এবং অভিভাবকদের মতামত যাচাইকে তাঁরা পছন্দ করছেন না। তাঁরা ১০ ভাগ নয়, সকল ছাত্রীকে একযোগে আন্দোলনে শরীক হতে উস্কানি দিয়ে চলেছেন। বলছেন যদি অভিভাবকদের অভিমত 'না' সূচক হয় তাহলে তা হবে সংবিধান এবং মানবাধিকার পরিপন্থী। তাঁদের মতের ও পথের অনুসারী নয় এমন প্রবন্ধকারদের তাঁরা অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিয়ে যাচ্ছেন। ভাবছেন এমনিভাবে জুজুর ভয় দেখিয়েই তারা কার্যোদ্ধার করবেন। কিন্তু তাতো হবার নয়। কারণ এর পুরোটাই নির্ভর করছে সামাজিক নিয়ম-নীতি, পরিস্থিতি এবং সর্বোপরি অভিভাবকদের গ্রহণযোগ্যতার উপর। ততাকথিত প্রগতিশীল পরস্পরবিরোধী মতবাদের পেশাদার প্রবন্ধকারদের উপর নয়। কারণ তাঁরা নিজের মেয়ের জন্য এক নীতি অন্যের মেয়ের জন্য ভিন্ন নীতিতে বিশ্বাসী। তাঁরা নিজ সন্তানদের ইংরেজিমাধ্যমে ভিন্ন স্কুলে পড়ান এবং অন্যান্য স্কুলে ইংরেজি প্রচলনের বিরোধিতা করেন। মুক্তচিন্তার বিশ্বদ্যিালয়ে না পড়িয়ে নিজ মেয়েকে পড়ান জেলখানা সাদৃশ্য কাঁটাতারসহ উঁচু প্রাচীর ঘেরা মেয়েদের জন্যে নির্দিষ্ট কলেজে। অন্যপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া মেয়েদের অভিভাবককে নারী-পুরুষের, ছাত্র-ছাত্রীদের সমঅধিকার,সংবিধান এবং মানবাধিকারের যুক্তি দেখান। 'আমি অভিভাবক এবং নারী। একসময় ছাত্রীও ছিলাম। সেসময় যেমন এখনো তেমনি সন্ধ্যায় এখনো বের হতে সাহস করি না। মেয়ের জন্য তো বটেই ছেলের জন্যও সন্ধ্যায় বাইরে থাকা পছন্দ করিনা' (মালেকা বেগম, ভোরের কাগজ, ১৬-২-'৯৫)। মুক্তচিন্তার অধিকারী, নারী আন্দোলনের নেত্রীর নিজের এবং নিজ মেয়ে সম্পর্কে এহেনো রক্ষণশীল বক্তব্যই তাঁদের দ্বিমুখো

www.pathagar.com

নীতির চিত্রকে সুস্পষ্ট করে এবং তাঁদের দাবি এবং নীতির উপর যে আস্থা স্থাপন করা যায় না সে বিষয়কেও পরিস্ফুট করে।

একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, 'স্বাধীনতা' হচ্ছে 'নিয়ম'-এর পরিপূরক একটি শব্দ। যে নিয়ম মানুষকে প্রথা, পদ্ধতি, প্রনালী, আইন, অভ্যাস, বিধান, সংযম, ইন্দ্রিয় দমন, শাস্ত্রবিহিত কৃচ্ছ্রতা সাধন, সংযত আচরণ প্রভৃতি বিষয়ে সচেতন করে এবং একই সাথে স্বাধীনতাকেও অর্থবহ করে। নিয়মহীন স্বাধীনতা স্বেচ্চাচারিতার শামিল। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, প্রগতিশীল নারী আন্দোলনের নেত্রীদের অনেকেই এই নিয়মহীন স্বাধীনতার প্রবক্তা। তারা সুন্দরকে দেখেন অসুন্দর দৃষ্টিতে। যা বিশ্বাস করেন তা বলেন না। আবার যা বলেন তা বাস্তবে করেন না। সুতরাং আমি মনে করি শুধু মাত্র সূর্যাস্ত আইন নয়, যে কোন বিষয়ে আমাদের সকলের বক্তব্য, দাবি, উদ্ধৃতি জাতির সার্বিক স্বার্থে, জাতির কল্যাণার্থে সুন্দর, সুষ্ট, যৌক্তিক ও গঠনমূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেদিকেই আমাদের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ১৭-৩-১৯৯৫।

www.pathagar.com

গণতন্ত্র এবং সংবাদপত্রের সম্পর্ক

কোন দেশে গণতন্ত্র আছে , কি নেই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় সে দেশের প্রেস বা সংবাদপত্রসমূহের মাধ্যমে। প্রেস বা সংবাদপত্রসমূহ যদি স্বাধীন তথা অনন্যনির্ভর থাকে, স্বাধীন মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধাহীন থাকে তাহলে সেদেশে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রও আছে বলে প্রমাণিত হবে। আর যদি লক্ষ্য করা যায় যে, সংবাদপত্রসমূহ স্বাধীন নয়, স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধাহীন নয়, তাহলে সে দেশে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র নেই বলে প্রমাণিত হবে। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে এই যে বাধা এবং বাধাহীন-এর কথা বলা হচ্ছে এই বাধা এবং বাধাহীনতা গণতন্ত্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। শুধু গণতন্ত্র থাকলেই চলবে না। সেই গণতন্ত্রকে স্বাধীনও হতে হবে। পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হলেই চলে না, সেই পত্রিকায় মত প্রকাশের স্বধীনতা থাকতে হয়। না হলে সেই পত্রিকাকে স্বাধীন বলা যায় না। একইভাবে গণতন্ত্র থাকলেও হয় না, গণতন্ত্রকেও স্বাধীন হতে হয়। না হলে সেই গণতন্ত্র থাকে না। গণতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হয়। ব্রিটিশ শাসিত ভারতের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সে সময় না ছিল গণতন্ত্র না ছিল স্বাধীন প্রেস। কারণ ধূর্ত ব্রিটিশরা সর্ব বিষয়ে ভারতবাসীকে তাদের অধীন রাখতে চেয়েছিল। তাদের অধীনে রেখে ভারতবাসীর রত্নগর্ভা ভারতকে শোষণ করতে চেয়েছিল। যারা শোষণ করতে চায়, শোষণ করে নিজেদের উদর পূর্তি করতে চায় তারা কখনো কোন ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা দেয় না। প্রেসকে তো নয়ই। ব্রিটিশরাও তাই করেছে। অথছ সেই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিস্টার ম্যাকডোন্যাল্ড তৎকালে লণ্ডনের সংবাদপত্র সভার ৯৪তম ভোজসভায় বলেছিলেন, 'আমি স্বাধীন প্রেসের পক্ষে' এবং আমি যদি মেথুসেলার মত দীর্ঘজীবী হই তাহলেও এ বিশ্বাস যাবে না। কারণ স্বাধীন প্রেস স্বাধীন গণতন্ত্রের একটি শর্ত এবং স্বাধীন গণতন্ত্র স্বাধীন প্রেসের একটি শর্ত(প্রবাসী, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ৪৩১, ১৩৪১)। সুতরাং উল্লিখিত বক্তব্যে এটা স্পষ্ট যে, সুস্থ, স্বাভাবিক এবং স্বাধীন গণতন্ত্রের জন্যে স্বাধীন প্রেস বা স্বাধীন সংবাদপত্র অপরিহার্য। অথচ পাকিস্তান এবং বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশেও কোন সময়ই সংবাদপত্র স্বাধীন ছিল না। এখনও নেই। পাকিস্তান আমলে সামরিক শাসকচক্র বারবার সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকার বাকশাল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে একই সাথে সংবাদপত্র এবং গণতন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ করেছে। পরবর্তী সময়ে বিএনপি সরকার কর্তৃক সংবাদপত্র মুক্ত হলেও পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেনি। বর্তমানে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেও

www.pathagar.com

ভোগ করছে না। বিভিন্নভাবে সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের ওপর আঘাত হানা হচ্ছে। এমন কি সাংবাদিকদের হত্যা পর্যন্ত করা হচ্ছে। সুতরাং বুঝতে কারোই অসুবিধা হবার কথা নয় যে, এই হত্যা এবং অত্যাচারের মধ্য দিয়ে সংবাদপত্রের ওপর যে আঘাত হানা হচ্ছে তা গণতন্ত্রের ওপর আঘাত হানারই শামিল। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হোক এটা কেউই কামনা করেননি। আর এ জন্যই বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় বসার পরপরই সংবাদপত্রসমূহের সম্মানিত সম্পাদকবৃন্দ তাঁকে সন্ত্রাস দমনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন যে, কঠোর হস্তে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে। শুধু মুখে বললেই চলবে না, তা বাস্তাবায়িত করতে হবে। সন্ত্রাসের সাথে জড়িত সকল দলের লোকদের আটক করতে হবে। এমন কি আপনার নিজের দলেরও। (৭ জুলাই,১৯৯৬, প্রধানমন্ত্রীর সাথে সম্পাদকবৃন্দের সভা)।

৭জুলাই, ১৯৯৬ তারিখ রাতে উল্লিখিত সভায় সম্মানিত সম্পাদকদের আশ্বস্ত করে প্রধানমন্ত্রীও বলেছিলেন যে, 'ক্ষমতা ভোগ করতে আমরা আসিনি। আমরা এসেছি জনগণের জন্যে কিছু করতে'। তিনি তাঁর ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের প্রধানদের ডেকে বলেছিলেন, সন্ত্রাস করলে সহ্য করা হবে না, কঠোর হস্তে দমন করা হবে, এ কথাগুলো জাতীয় দৈনিকগুলোতে প্রকাশ করা হয়েছিল এবং এ সকল বক্তব্যের জন্যে পত্র-পত্রিকায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসাও করা হয়েছিল। কিন্তু সমগ্র জাতি অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলো যে, প্রধানমন্ত্রীর দেয়া আশ্বাসবাণীর কোনরূপ প্রতিফলন বাস্তবে পরিলক্ষিত হচ্ছে না, বরং উল্টো ফল ফলছে সর্বত্র। আর এর মধ্য দিয়েই প্রধান মন্ত্রীকে দেয়া সম্পাদকমণ্ডলীর পরামর্শ নিষ্ফলে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংবাদপত্র হাল ছাড়েনি। সরকার এবং সরকার সমর্থক বিভিন্ন সংগঠনের অন্যায় কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ জানাতে ভুল করেনি।

২১/৮/৯৬ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্যে সরকার এক তরফাভাবে ছাত্র দলকে দায়ী করতে চাইলে দেশের প্রায় সকল দৈনিকই বিভিন্নভাবে তার প্রতিবাদ করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। ২৫/৮/৯৬ তারিখে প্রকাশিত একটি দৈনিকের মন্তব্য প্রতিবেদনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেছে যে, 'ক্যাম্পাস সংঘর্ষে ছাত্রলীগের সশস্ত্র ক্যাডাররা যে গুলি করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাহলে তাদের গ্রেফতার করা হলোনা কেন? নাকি যে অস্ত্র তারা ব্যবহার করেছে তা বৈধ ছিল, সরকারের সরবরাহকৃত? গ্রেফতার যাদের করা হয়েছে তারা শুধু ছাত্রদলের নেতা-কর্মী বলে জানা গেছে। ....ছাত্রদলের সশস্ত্র ক্যাডারদের একাংশ অস্ত্রসহ ছাত্রলীগে যোগ দিয়ে মুহসীন হল দখল করলো। সভা করে বক্তৃতা দিল, অমনি তারা জায়েজ হয়ে গেল? ছাত্রদল ছেড়ে ছাত্রলীগে যোগ দিলে সন্ত্রাসী কি আর সন্ত্রাসী থাকে না মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী? আপনার সরকার কি ছাত্রলীগে এসে দলের ক্যাডারদের আশ্রয় দেয়ার প্রজেক্ট নিয়েছে'? সরকারের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মদদে বিগত পাঁচ বছরের সন্ত্রাসী সর্মকাণ্ড, হত্যাকাণ্ড এবং লুটপাটের ঘটনার বিষয়ে এমনিভাবে যে সকল পত্রিকা সাহসী উচ্চারণ করেছে সেসকল পত্রিকার বিরুদ্ধে, সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সরকার এবং সরকার সমর্থক সন্ত্রাসী গডফাদারদের পক্ষ

www.pathagar.com

থেকে জুলুম অত্যাচার বৃদ্ধি পেয়েছে। এ জুলুম অত্যাচার এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এ বিষয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করে সাংবাদিক এবং সুধীজনদের প্রতিবাদ পর্যন্ত কতে হয়েছে। সম্প্রতি 'নাগরিক' সমাজ ও 'কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিষ্ট' আয়োজিত আলোচনা সভার সভাপতি ডঃ কামাল হোসেন বলেছেন 'সন্ত্রাস এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনকারীরা সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছেন'। এবিএম মুসা এই আলোচনা সভার অন্যতম বক্তা ছিলেন। তিনি বলেছেন যে, 'যারা সাংবাদিকদের ওপর আঘাত করে, আক্রমণ করে তরা এখন এ আক্রমণ পরিচালনার জন্যে বড়াই করে বেড়ান।' হলি ডে সম্পাদক এনায়েত উল্লা খান বলেছেন, 'একটি ছায়া শরীর অবিরাম আমাকে তাড়া করছে, আর বলছে সত্য কথা বলতে পারবে না। কেউ যাতে কথা বলতে বা লিখতে না পারে তার জন্যেই এই ছায়া শরীর তৈরি করা হয়েছে। আইনের শাসন, যদি দলের শাসন হয় তাহলে গণতন্ত্র টিকবে কিভাবে'? ডেইলী স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম বলেছেন, 'সাংবাদিকদের স্বাধীনতা হরণ করার অর্থ গণতন্ত্র হরণ করা' (দৈনিক ইত্তেফাক,৭জুন, ২০০০)। আলোচ্য সভায় আর যাঁরা বক্তব্য রাখেন তাঁদের মধ্যে প্রবীন সাংবাদিক ও কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্ট-এর সভাপতি আতাউস সামাদ, ফয়েজ আহমদ, যায় যায় দিন সম্পাদক শফিক রেহমান, অর্থনীতিবিদ ডঃ মোজাফফর আহমদ, ডঃ আহমদ কামাল, মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মোঃ ইবরাহিম, সাংবাদিক আব্দুল কাইয়ুম , এডভোকেট এলিনা খান, কামরুল হাসান মঞ্জুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সকল বক্তা শাসনযন্ত্রের উপর নির্ভরশীল ফ্যাসিবাদকে মোকাবেলা করে গণতন্ত্র এবং সংবাদপত্রসমূহের স্বাধীনতা রক্ষার যে আহ্বান জানিয়েছেন সেই আহ্বানের প্রতি শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন সকলেরই সমর্থন জানানো উচিত। ২৮-৬-২০০১।

www.pathagar.com

সমঝোতার পথই শ্রেয়

'Democracy is a form of government in which the supreme power is vested in the-elected representative of the people.' অর্থাৎ গণতন্ত্র হচ্ছে এক বিশেষ সমাজ ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থায় দেশের প্রাপ্ত বয়স্ক নর-নারীর ভোটে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের দ্বারা দেশ পরিচালিত হয়। দেশ পরিচালনার জন্য সর্বময় ক্ষমতা তাদের উপর ন্যস্ত করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও নির্বাচিত বিরোধী দলের গণপ্রতিনিধিরাও গণতন্ত্রের আওতায় দেশ পরিচালনার কাজে সরকারকে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকেন। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী সকল নির্বাচিত গণপ্রতিনিধির গুরুত্ব অপরিসীম। এ ব্যবস্থায় নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে দেশ পরিচালনার সর্বময় ক্ষমতা লাভ করলেও বিরোধী দলের গঠনমূলক পরামর্শ ও কার্যক্রমকে সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। এইটিই নিয়ম। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্য, আমাদের বাংলাদেশে এর কোন প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় না। ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী সকল দল পরস্পরকে শত্রু মনে করে। এই অবস্থা যে সাম্প্রতিক কালের তা নয়। পাকিস্তান আমল থেকেই চলে আসছে এই ঐতিহ্য। বলা যায় এই ঐতিহ্য তারও পূর্বেকার। যারা ইংরেজদের খাস গোলামে পরিণত হয়ে তাদের আশীর্বাদপুষ্ট হয়েছেন। যারা ইংরেজ বেনিয়াদের দেয়া বিভিন্ন খেতাবকে স্বর্গপ্রাপ্তি ভেবেছেন এবং অধিক থেকে অধিকতর তাঁবেদারে পরিণত হয়েছেন মাটির মানুষদের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। যেনো মাটিতে পা রেখে নয়, তারা হাওয়ায় ভেসে চলতেন। সমগোত্রীয় যারা তারা বাদে নিম্নের আর কাউকে তারা মানুষ জ্ঞান করেননি। ইংরেজ অমলে যেমন পাকিস্তানেও তেমনি বহাল ছিল এই ঐতিহ্য। ফলে এদেশের উপর মহলের অনেক বাঙালিই পাকিস্তানী প্রভুদের কৃপাদৃষ্টি লাভের জন্য চলনে বলনে তাদের মত হবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তখনকার অনেক বাঙালিই উর্দু বলতে পারা এবং উর্দুওয়ালাদের মত চালচলনে অভ্যস্ত হতে পারাকে গর্বের এবং সৌভাগ্যের মনে করতেন। ইংরেজ আমলে ক্ষমতলোভী এক শ্রেণীর মানুষ যেমন তাদের তাঁবেদার হতে কুণ্ঠাবোধ করতো না, পাকিস্তান আমলেও তেমনি এক শ্রেণীর বাঙালি স্রেফ ক্ষমতা এবং সুযোগ লাভের অভিলাষে উর্দুভাষীদের তাঁবেদারি করতেও ঘৃণাবোধ করেনি। সুতরাং ইংরেজ ও পাকিস্তনী শাসকদের তাঁবেদারের দল সেই ঐতিহ্য ভুলে কি করে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ঠিকই কিন্তু সেই তাঁবেদার গোষ্ঠীর অভ্যাসের পরিবর্তন হয়নি। সেই অভ্যাস, সেই ঐতিহ্য লালন করে চলেছেন সাফল্যের সঙ্গে। উদ্দেশ্য ঐ একই। বিভিন্ন

www.pathagar.com

দলের প্রধান এবং ক্ষমতাসীনদের প্রিয়পাত্র হওয়া এবং তাদের আশির্বাদপুষ্ট হয়ে আখের গোছানো। এদের কাছে গণতন্ত্র হচ্ছে সুবিধামত দল বদল করা, যেনোতেনো প্রকারে ক্ষমতাসীন দলে যুক্ত হওয়া, রাজনৈতিক স্রোতের অনুকূলে সাড়া দেওয়া, আমদানি-রফতানির লাইসেন্স পাওয়া, ব্যাংকের অর্থ লোপাট করা, সময় সুযোগ অনুকূলে থাকলে সরকার উৎখাতে অংশ গ্রহণ করা এবং মাঠে ময়দানে, পত্র-পত্রিকায় প্রগতিশীল বক্তব্য প্রদান এবং প্রবন্ধ নিবন্ধ লেখা। এই হচ্ছে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রূপ। গণতন্ত্রের চিত্র। এই রূপ, এই চিত্র এক শ্রেণীর ক্ষমতা ও সুবিধাভোগের লালসায় আক্রান্ত অগণতান্ত্রিক এক দল যাত্রা মঞ্চের অভিনেতা অভিনেত্রীরূপী মানুষদের মধ্যেই প্রধানত সীমাবদ্ধ। সাধারণ খেটে খাওয়া কৃষক ও মধ্যবৃত্ত শ্রেণীর মানুষ-এর আওতাভুক্ত নয়। আর এ কারণেই বাংলাদেশের গণতন্ত্রে হাজারো সমস্যা। এই সমস্যা গণতন্ত্রের সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ত না হবার সমস্যা। যে গণতন্ত্রের সাথে সাধারণ মানুষের কোন সম্পৃক্ততা নেই সেই গণতন্ত্র কখনই প্রকৃত গণতান্ত্রিক রূপ পেতে পারে না। সাধারণ মানুষকে গণতন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত করতে না পারলে এ দেশে কখনও প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করবেনা। গণতন্ত্রের মুক্তি আসবে না। গণতন্ত্র বন্দী হয়ে থাকবে ক্ষমতালোভী, অর্থলোভী রাজনৈতিক যাত্রা মঞ্চের কতিপয় অভিনেতা অভিনেত্রীদের হাতে। যারা ইচ্ছে মত গণতন্ত্রের রূপ দেবেন। সুবিধামত ব্যাখ্যা দিয়ে তাঁদের গড়া গণতন্ত্রকে ব্যবহার করবেন। আর ভোটের প্রয়োজন হলেই তাঁরা আবির্ভূত হবেন রাজনৈতিক যাত্রামঞ্চে। বিভিন্ন দলের দলীয় প্রতীক ও পোশাকে সজ্জিত হয়ে নানা কৌশলে দেশকে, দেশের মানুষকে সুখ সাগরে ভাসিয়ে দেবার কথা বলে মঞ্চের চারপাশে সমবেত অগণিত হাড্ডিসার নির্বোধ, নিরক্ষর মানুষদের মোহগ্রস্ত করবেন। বিনিময়ে পাবেন মুহুর্মুহু করতালি আর তাদের মহামুল্যবান ভোট। বাংলাদেশের এই ভোট লাভের অভিনব গণতন্ত্রেরই চর্চা চলছে বিগত কয়েক দশক ধরে। হয়তো আরও চলবে। কারণ নিরক্ষর নির্বোধ মানুষগুলো অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন না হলে, সচেতন না হলে এর কোন পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।

পাকিস্তান আমলে এদেশের মানুষ বহুরূপী গণতন্ত্রের স্বাদ ভোগ করেছে। প্রত্যক্ষ করেছে গণতন্ত্রের রূপ। দেখেছে কেউ ক্ষমতায় গেলে ক্ষমতা ছাড়তে চায়নি। যারা স্বাভাবিকভাবে ক্ষমতায় যেতে পারেনি তারা ক্ষমতায় গেছে ভিন্ন পথে। গেছে বুলেটের জোরে। কিন্তু সভা, সমিতি, মঞ্চে তারাই আবার গণতন্ত্রের বুলি কপচিয়ে মুখে ফেনা তুলেছে। ক্ষমতাসীনরা কখনই বলেননি যে তারা অগণতান্ত্রিক। কিন্তু বিরোধীরা বলেছেন। এখনও তারা একই কথা বলছেন। তারা বলছেন বাংলাদেশের বর্তমান ক্ষমতাসীনরা অগণতান্ত্রিক। সুতরাং হটাও তাদের। ডাকো হরতাল। করো অবরোধ। অচল হোক দেশ। যদি ধ্বংসও হয় হোক। কিন্তু ক্ষমতাসীনদের বিতাড়িত করতেই হবে। তাদেরকে ক্ষমতা ছাড়তে হবে। কিন্তু ক্ষমতা তারা ছাড়ছেন না। ক্ষমতাসীনরা বহাল আছেন ক্ষমতায় এবং থাকবেনও বলছেন। এ এক অকল্পনীয়, অসহনীয়, জটিল পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতি নিরসনে নিনিয়ানরা এলেন। থাকলেন। আবার এক সময় চলেও গেলেন। কিন্তু পরিস্থিতির

www.pathagar.com

জটিলতা গেল না। গেল না হরতাল, অবরোধও।

হরতাল, অবরোধ হচ্ছে। শুধু তাই নয়, হরতাল এখন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। অসৎ কর্মকর্তাদের কর্মতৎপরতা আর বিদ্যুত চুরির কারণে দেশে উৎপাদিত পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় তা ক্রেতা সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। ফলে সস্তা বিদেশী পণ্যে বাজার ছেয়ে যাচ্ছে। দেশের অর্থ যাচ্ছে বিদেশে। দেশের ব্যবসা হচ্ছে ধ্বংস। অথচ হরতাল অবরোধ তার জন্য হয়নি। হচ্ছে না। হরতাল হচ্ছে ক্ষমতা লাভের জন্য এবং এই হরতালের পক্ষে বিপক্ষে অভিমত ব্যক্ত হচ্ছে। হরতালে যে দেশের ক্ষতি হচ্ছে তা অনস্বীকার্য। কিন্তু তবু কেউ কেউ বিশেষ করে কোন কোন দলের স্তাবক বুদ্ধিজীবীরা বলছেন হরতালে দেশের ক্ষতি হয় না। কারণ হরতাল গণতন্ত্রের অংশ। বলছেন বিশেষ কোন নেতা নেত্রী ক্ষমতায় বসলে দেশে স্বর্গসুখ বয়ে যাবে। অনাবিল প্রশান্তিতে ভরে যাবে দেশ। যারা বলছেন তারা নিজেরাও জানেন যে, এই বিপুল জনগোষ্ঠীর সমস্যাসংকুল দেশে কারও পক্ষেই রাতারাতি স্বর্গসুখ এনে দেয়া সম্ভব নয়। কোটি কোটি বাঙালির সমর্থন ও ভালবাসায় ধন্য বঙ্গবন্ধু যা পারেননি তা বর্তমানে বহুদলে বিভক্ত দেশে তার চেলাচামুণ্ডরা বা অন্য কেউ পারবেন এটা অবিশ্বাস্য এবং অসম্ভব যে, একথাও তারা ভাল করেই জানেন। কিন্তু তবুও বলছেন । বলছেনঐ পরম্পরাগত ক্ষমতা লাভ ও সুবিধা ভোগের ঐতিহ্যের আলোকে। বলছেন দলীয় প্রধানের বিশেষ আশীর্বাদ লাভের আশায়। বলছেন দলীয় প্রধানের বিশেষ দলটি ক্ষমতায় গেলে মন্ত্রিত্ব অথবা নিদেন পক্ষে অন্য কোন সুবিধা লাভের আশায়। এই স্তাবকী স্বভাব যাদের তাদের জোর প্রতিযোগিতা চলছে কে কার চেয়ে অধিক স্তাবকে পরিণত হতে পারেন তার। স্তাবকদের এই অশুভ প্রতিযোগিতায় শংকিত হয়ে দলের শুভাকাঙ্ক্ষী কেউ কেউ যখন এদেরে সম্পর্কে দল এবং দলীয় প্রধানকে সতর্ক হতে বলছেন তখন সতর্ককারীকে তাদের কেউ কেউ অশ্রাব্য ভাষায় আক্রমণ করে প্রবন্ধ নিবন্ধ প্রকাশ করছেন। এই হরতাল, এই গালাগাল, ক্ষমতা লাভের এবং ক্ষমতা আঁকড়ে থাকবার মোহ আর কত কাল? গোটা জাতি আজ অতিষ্ঠ। তারা এর অবসান চায়। চায় সুষ্ঠু, সুন্দর , সৌম্য রাজনীতি। চায় সকল দলের মাঝে সম্প্রীতি।

বোধ করি সময় এখনও আছে। আছে গঠনমূলক সঠিক কর্মপদ্ধতি গ্রহণপূর্বক সঠিক পথে অগ্রসর হবার সময়। এখনও সময় আছে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সঠিক সমাধানে পৌঁছুবার। অন্যথায় পরিণতি কি হতে পারে তা সার-কংকট চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। অরাজনৈতিক খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া কোন পর্যায়ে পৌঁছুতে পারে তা এদেশের মুনাফাখোরী সুবিধাভোগী মানুষ আতংকের সাথেই প্রত্যক্ষ করেছে। আক্রান্ত হয়েছেন মন্ত্রী থেকে শুরু করে এমপি, জেলা প্রশাসকসহ আরও অনেকেই। সহায় স্ববলহীন অসহায় হাড় জির জিরে মানুষগুলো সাহসে তাঁদের আক্রমণ করেছে। বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েই তারা কাজটি করেছে। আমার যেনো মনে হয়েছে কৃষকদের এই জেগে ওঠা অন্ধকারে আলোর ঝলকানি। নিরাশার অতল গহ্বরে আশার আলো।

www.pathagar.com

প্রয়োজনে এমনি করেই কখনও কখনও তারা জেগে ওঠে অমিত তেজে। রাজনৈতিক কুমন্ত্রণা দিয়েও যা করা সম্ভব হয় না। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী উভয় পক্ষই অবশ্য রাজনৈতিক চাল চেলে চলেছে। এক পক্ষ আর এক পক্ষকে দায়ী করছে। হতে পারে উভয় পক্ষের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিই সার সংকটের কারণ। কিন্তু কৃষকদের জেগে ওঠাতে কোনরূপ কৃত্রিমতা ছিল না। এই কথাটি সকল রাজনৈতিক দলেরই স্মরণে রাখা উচিত। এই মহূর্তে বিষয়টি কোন কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে গিয়েছে মনে হলেও বিষয়টি আদৌ তেমন নয়। কারণ মনে রাখতে হবে যারা যেগে উঠেছে তারা কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক নয়। হরতাল ও রাজনৈতিক নোংরামি তাদেরকে কোনভাবেই প্রভাবিত করে না। তারা দিন রাত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ক্ষেত খামারে কাজ করে। তারা রাজনীতি বুঝে না। তারা শুধুমাত্র বেঁচে থাকবার ন্যূনতম অধিকার চায়। আর সেই অধিকার থেকে যারা তাদের বঞ্চিত করতে চায় তারাই আক্রমণের শিকার হয়। সুতরাং এই কৃষক আন্দোলন থেকে সকল দলেরই শিক্ষা নেয়া উচিত। অন্যথায় হয়তো এমন দিন আসবে যেদিন উচ্চ পদে আসীন ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন দলের নেতা-নেত্রী ও ক্ষমাতাসীনদের কেউই রাজধানী ও অন্যান্য শহরের বিলাসবহুল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ থেকে রাস্তায় বেরোতে পারবেন না। হবেন আক্রমণের শিকার। সুতরাং অনুগ্রহপূর্বক দেশের কথা ভেবে, দেশের নিরন্ন মানুষদের কথা স্মরণ করে সকল দল মিলে সমঝোতায় আসুন। হরতাল দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে সমস্যার সমাধান করুন। নিজের স্বার্থ নয়, দলীয় স্বার্থ নয়, দেশের স্বার্থকে নিয়ে ভাবুন। একগুঁয়েমী নয় নমনীয়তা প্রদর্শন করুন। দেশের মানুষকে ভালবাসতে শিখুন। তাদের আস্থা অর্জনে সচেষ্ট হোন। তারাই আপনাদের ক্ষমতায় বসাবে। ক্ষমতার জন্য সংগ্রামের প্রয়োজন হবে না। হবে না হরতাল অবরোধের। জনগণই আপনাদের হাতে ক্ষমতা অর্পন করবে। ২১-৪-১৯৯৫।

www.pathagar.com

একাত্তর স্মরণে

জুলাই ১৯৭১। আমি ঢাকাগামী একটি বাসের যাত্রী। নাটোর জেলার আহমদপুর থেকে ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছি। পরবর্তী বাস ষ্টপেজ বনপাড়া পৌঁছার পর মন ভীষণভাবে অশান্ত হলো। কারণ বনপাড়া থেকে আমার পার্শ্ববর্তী গ্রামের ৩/৪ ব্যক্তির বাসে ওঠার কথা ছিলো। যাদের সঙ্গে আমার ঢাকা যাবার কথা। কিন্তু তাদের কাউকে না পাওয়ার কারণে একা ঢাকা যাওয়া উচিত হবে কিনা সে বিষয়ে ভাবতে শুরু করলাম। মনের ভেতর তোলপাড় শুরু হলো। কিন্তু বাস থেমে থাকলো না। দ্রুত বেগে ছুটে চললো। ঢাকা যওয়া ঠিক হবে কিনা এ কথা ভাবতে ভাবতেই পাবনা শহরের উপকণ্ঠে বাস গিয়ে থেমে গেল। থামার সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রধারী জনাকয়েক পাক হানাদার বাহিনীর জোয়ান বাসে উঠে সকল যাত্রীর আইডেনটিটি কার্ড এবং ব্যাগ তল্লাশি করতে শুরু করলো। আমার আত্মা খাঁচা ছাড়ার অবস্থা। যদি খাঁচারূপী দেহ থেকে আত্মার উড়ে যাওয়া সম্ভব হতো তা হলে তখন অবশ্যই উড়ে যেত। কারণ আমার সঙ্গে কোন অইডেনটিটি কার্ড ছিল না। জোয়ানরা একের পর এক তল্লাশি করে আমার দিকে যতই এগিয়ে আসতে লাগলো আমার মানসিক অবস্থা ততই খারাপ হতে থাকলো। খারাপ হবার আরও কারণ হচ্ছে আমার মাথার লম্বা চুল। চুল দেখে বাসের কণ্ডাক্টর এক সময় বলেছিল চুল ছোট করে কেটে আসা উচিত ছিল। কারণ পাকিস্তানী জোয়ান, রাজাকার এবং আলবদরের সদস্যরা লম্বা চুল দেখলেই মুক্তিবাহিনীর সদস্য মনে করে। আমার মাথায় একে লম্বা চুল, তার উপর ছাত্র এবং সঙ্গে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রদত্ত কোন আইডেনটিটি কার্ডও নেই। সুতরাং ধরেই নিলাম এ যাত্রা রক্ষা পাবার আর কোন উপায় নেই। মহা তোলপাড়ে হৃদয় নামক ছোট্ট মাংসপিণ্ডটির ভীষণ নাজুক অবস্থা। এই তোলপাড় এই স্পন্দন বন্ধ হয়ে যায় যায় অবস্থা। কতবার, কতভাবে যে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করেছি সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্য তা হিসেব করে বলা অসম্ভব। ভয়াল চেহারাযুক্ত একজন জোয়ান এবার আমার সামনের আসনে বসা একজন সুদর্শন যুবকের সঙ্গে কথোপকথনে ব্যস্ত। যুবকটি পাকিস্তানি। অর্থাৎ উর্দ্দুভাষী। সে খাতির জমানোর জন্য স্বদেশী জোয়ানের সঙ্গে উর্দ্দুতে নানা কথা বলছে। এই কথা বলতে বলতেই জোয়ান তার কাছে আইডেনটিটি কার্ড চাইলো এবং ব্যাগও ভালভাবে হাতড়ে দেখে নিল। স্বদেশী বলে জোয়ান কিন্তু যুবকটিকে খাতির করলো না। এবার আমার অবস্থা আরও সঙ্গীন। নিজ দেশের যুবককেই

www.pathagar.com

যখন খাতির করেনি তখন আমাকে তো খাতির করবার প্রশ্নই ওঠে না। আমি আর কি করবো। পূর্ব থেকেই কাপড় চোপড় ভর্তি ব্যাগটির চেইন খুলে হাঁ করে ধরে রাখলাম। সৃষ্টিকর্তার কি অপার মহিমা, জোয়ানটি আমার কাছে এসে ধরে রাখা ব্যাগের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখেই পিছনের সিটের যাত্রীদের কাছে চলে গেল। আমাকে আর কিছুই জিজ্ঞেস করলো না। বেমালুম আইডেনটিটি কার্ড চাইতে ভুলে গেল। সৃষ্টিকর্তার অসীম রহমতে অলৌকিকভাবে বিপদমুক্ত হলাম আমি। সবার আইডেনটিটি কার্ড এবং ব্যাগ পরীক্ষার পর পাক জোয়ানরা নেমে গেলে বাস পুনরায় চলতে থাকলো, কিন্তু কিছুক্ষণ চলার পর শহর পেরিয়ে আবারও থেমে গেল, এবং আবারও পাক জোয়ানদের তল্লাশি শুরু হলো। এবার সকল যাত্রীকে বাস থেকে নামিয়ে রাস্তার পাশে লাইন করে দাঁড় করানো হলো। কয়েকজন জোয়ান বাসে উঠে তল্লাশি করলো। বাকি জোয়ানরা লাইনে দাঁড়ানো যাত্রীদের সামনে দিয়ে যাত্রীদের প্রতি নজর রেখে হেঁটে গেল। এবার আর তারা আইডেনটিটি কার্ড দেখতে চাইলো না। এরপর যাত্রী নিয়ে বাস নগরবাড়ী ঘাটের উদ্দেশে ছুটে চললো।

বাস যখন নগরবাড়ী ঘাটে পৌঁছুলো তখন দুপুর গড়িয়েছে। বাসের সকল যাত্রী নেমে গেলেও আমি বাস থেকে নামার সাহস করলাম না। কারণ পুরো এলাকায় পাক-জোয়ানদের জোরদার টহল দেখে না নেমে বরং ঐ একই বাসে বাড়ি ফেরার সিদ্ধান্ত নিলাম। বাসে বসে পাক বাহিনী এবং তাদের দোসর রাজাকার আলবদরদের হাত থেকে রক্ষা পেতে বার বার সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করছি এমন এক মুহূর্তে আরিচা থেকে ছেড়ে আসা ফেরীর যাত্রী নিয়ে বাস নাটোরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। পাবনা শহরের উভয় প্রান্তে আবারও পাক জোয়ানদের তল্লাশি হলো। তবে এবার তারা খুব বেশি কড়াকড়ি করলো না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম পাবনা পার হতেই। রাস্তায় রাত হয়ে যাওয়ায় বাড়ি (চকবড়াই গ্রামে) যাওয়া সম্ভব হলো না। পথের পাশে এক আত্মীয় বাড়িতে রাত কাটিয়ে পর দিন বাড়ি ফিরে যাই এবং কয়েক দিন পর ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের দেয়া আইডেনটিটি কার্ড নিয়ে ঢাকা আসি। তখন বড় বড় নদীগুলোর উপর ব্রিজ হয়নি। ফলে নৌকাযোগে নদী পার হয়ে নদী পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা বাস ধরে ঢাকা আসতে হতো। এ কারণে আরিচা ঘাট থেকে ঢাকা পর্যন্ত রাস্তার সর্বত্র পাক সেনা এবং রজাকারদের সম্মুখীন হতে হয়েছে অসংখ্যবার। সামনের দিকে তাক করা বন্দুক হাতে পাক সেনারা সর্বত্র টহল দিতো এবং রাজাকাররা পাক সেনাদের অনুসরণ করত। রাজাকারদের সংখ্যা এবং তাদের দাপট পাক সেনাদের তুলনায় অনেকগুণ বেশি ছিল। সমগ্র রাস্তায় কতবার যে রাজাকারদের আইডেনটিটি কার্ড দেখাতে হয়েছে তার হিসেব দেয়া কঠিন। প্রথমবার ঢাকা না এসে বাড়ি ফেরার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তা যে যথার্থ ছিল তা রাজাকারদের দাপট দেখে বুঝতে পেরেছিলাম।

ঐ সময় ঢাকায় যে ক'দিন অবস্থান করেছিলাম সে ক'দিনও অস্থিরতার মধ্য দিয়েই কাটাতে হয়েছিল। কারণ নিউমার্কেটের পাশে অবস্থিত আমাদের চারুকলা ইনস্টিটিউটের

www.pathagar.com

ছাত্রাবাসে গিয়ে দেখতে পাই যে, আমার রুমসহ সমস্ত রুমের জিনিসপত্র লুটপাট করে নিয়ে গেছে এবং ছাত্রাবাসের পাশের বিশাল বস্তিটি পাক সেনারা পুড়িয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয় শুনলাম তারা গুলি চালিয়ে নির্বিচারে বস্তির অগণিত নিরিহ সাধারণ মানুষকে হত্যা করেছে। সব চেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটেছে ছাত্রাবাসেরই দোতলার একটি কক্ষে। আমার সহপাঠী একান্তই গোবেচারা, ভদ্র, নম্র শাহনেওয়াজ পাক সেনাদের ভয়ে একটি কক্ষের দরজা বন্ধ করে আশ্রয় নিলেও শেষ পর্যন্ত সেদিন নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। বর্বর পাক সেনাদের কয়েকজন দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে সহপাঠী বন্ধু শাহনেওয়াজকে গুলি করে হত্যা করে। আমি যখন ঐ কক্ষে প্রবেশ করি তখনও রক্তের জমাট বাধা দাগ এবং দেয়ালে বুলেটের গর্ত বিদ্যমান ছিল। সেই দাগ এবং দেয়ালের গর্তগুলো তখনও পাক সেনারা কিপরিমাণ বর্বর আচরণ করেছিল তার নিদারুণ তথ্য স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল।

ছাত্রাবাস থেকে শাহবাগে অবস্থিত তৎকালীন চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে গিয়ে দেখি শতবৃক্ষ ঘেরা বিচিত্র বর্ণের হৃদয় দোলানো ফুলে ফুলে ভরা, ছায়া-সুশীতল বিশাল অঙ্গনটি বিরান ভূমিতে পরিণত হয়েছে। সর্বদা আনন্দ উৎসব ও জন কলরবে মুখরিত, চারুকলার গর্বিত শিক্ষক, অফিসার, কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের পদচারণায় প্রাণচঞ্চল প্রাঙ্গনটি মৃতপুরির রূপ ধারণ করেছে। কারণ এই প্রাঙ্গনটিও বর্বর পাক বাহিনীর অত্যাচার থেকে রক্ষা পায়নি। তারা এখানে ঢুকেও হত্যা করেছে কয়েকজন নিরীহ কর্মচারীকে, যারা এখনও ঘুমিয়ে আছে এই প্রাঙ্গনেরই পবিত্র মাটির অভ্যন্তরে। তারা ধ্বংস করেছে চারুকলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছাত্রীদের অনুশীলনের লক্ষ্যে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ছোট চিড়িয়াখানাটিও। চিড়িয়াখানার অনেকগুলো হরিণী এবং শৃঙ্গধারী হরিণ খেয়ে সাবাড় করেছে তারা। আর বাদবাকী জীবজন্তু-পশুপাখি ছেড়ে দিয়েছে। তারা তাদের অপবিত্র পদচারণায় সৌন্দর্য চর্চার বিদ্যাপিঠের পবিত্র অঙ্গনকে করেছে অপবিত্র। অপবিত্র করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমগ্র অঙ্গনকে। হত্যা করেছে অগণিত ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক বুদ্ধিজীবীদেরকে। যাদের মধ্যে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আনোয়ার পাশা অন্যতম। আনোয়ার পাশা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক হলেও আমারও শিক্ষ ছিলেন। আমি যখন পাবনা এডোয়ার্ড কলেজের ছাত্র, তিনি তখন সেখানে বাংলা বিষয়ের শিক্ষ ছিলেন। একেবারেই সাদাসিধে নম্র স্বভাবের সেই শিক্ষককেও রাজাকার, আলবদর, আল শামসের সদস্যরা হত্যা করবার জন্য তুলে দিয়েছিল নরপশু জল্লাদরূপী হানাদার পাক বাহিনীর হাতে। সহপাঠী, বন্ধু শাহনেওয়াজ, তৎকালীন চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের (বর্তমানে চারুকলা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) কর্মচারী এবং শিক্ষক আনোয়ার পাশার হত্যাকাণ্ডের কথা সে দিন নিদারুণভাবে ব্যথিত করেছিল আমকে। শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের প্রাক্কালে তাদেরকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। স্মরণ করি দেশের সকল শহীদ শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী, ছাত্র এবং অগণিত জানা অজানা শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের। বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য যারা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে বাংলাদেশের মাটিকে

www.pathagar.com

রক্তিম করেছেন, সবুজের বুকে লাল টকটকে রক্তিম সূর্য খচিত পতাকা উপহার দিয়ে শহীদ হয়েছেন এবং বাংলাদেশের পবিত্র মাটিকেই আপন করে নিয়েছেন, তারা যেনো পরপারে সুখ পান, শান্তি পান এবং স্বর্গবাসী হন। সৃষ্টিকর্তার কাছে এই প্রার্থণার মধ্য দিয়ে তাদেরকে আবারও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। ১২-১২-২০০১।

চারুকলা ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গন

www.pathagar.com

রাজনীতি ও সন্ত্রাসবাদ

'সন্ত্রাসবাদ' এবং 'সন্ত্রাসবাদী' দু'টি শব্দ সম্পর্কে দেশের প্রায় প্রতিটি মানুষই সচেতন। তবে সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসবাদীদের সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট নয়। কারণ তাদের ধারণা হচ্ছে শব্দ দু'টির সঙ্গে যাদের সম্পর্ক তারা দেশের অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীর সাধারণ গুণ্ডা-পাণ্ডা, চোর-ডাকাত, মাস্তান, ক্যাডার কিংবা খুনী। অর্থাৎ তারা হচ্ছে অপরাধ জগতের অন্ধগলির অপরাধ প্রবণ ঘৃণিত মানুষ। কিন্তু সন্ত্রাসের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেও সন্ত্রাসবাদের ক্ষেত্রে এদেরকে খুব বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় না। কারণ প্রকৃত অর্থে সন্ত্রাসবাদ বলতে বুঝায় রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য হত্যা, অত্যাচার ইত্যাদি কার্য অনুষ্ঠান নীতি এবং 'নস্ত্রাসবাদী' বলতে বুঝায় 'রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের জন্যে হত্যাকাণ্ড সংঘটনের পক্ষপাতী রাজনৈতিক অঙ্গনের ব্যক্তিবর্গ (terrorist)। অভিধানে স্পষ্টাক্ষরে কথাগুলো লেখা রয়েছে (ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী, পৃঃ ১০২৪)। সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসবাদী বলতে রাজনীতি এবং রজনীতিবিদদেরই যে বুঝানো হয়ে থাকে তার সমর্থন মহাত্মা গান্ধীর বক্তব্যেও সুস্পষ্ট। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকারীদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, 'I am in deadly earnest about this greatest of weapons at the disposal of mankind. It is claimed for Satyagraha that it is a complete substitute for violence or war. It is designed, therefore, to reach the hearts both of the so- 'called terrorists' and the rulers who seek to root out the 'terrorists' by emasculating the whole nation. (প্রবাসী, ১ম খণ্ড, ৩৪শ'ভাগ বৈশাখ, ১৩৪১, পৃঃ১৪৬)। 'Terrorist' বলতে এখানে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যসহ যারা সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন তাদের সকলকেই বুঝানো হয়েছে। তাছাড়া তৎকালে বাংলার গভর্নর ঢাকার পুলিশ প্যারেডে যে বক্তব্য দিয়েছিলেন তাতেও সন্ত্রাসবাদী বলতে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গকেই বুঝানো হয়েছে। (প্রবাসী ৩৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড, আষাঢ়-১৩৪১, পৃঃ ৪৩৬ দ্রঃ)। সম্প্রতি আমাদের মহামান্য প্রেসিডেন্টও বলেছেন, 'রাজনৈতিক দলগুলো মাস্তান,সন্ত্রাসী ছাড়া চলতে পারে না(বাংলার বাণী, ১২/৭/৯৯)। সুতরাং সন্ত্রাস কিংবা সন্ত্রাসবাদ কি এবং সন্ত্রাসী কিংবা সন্ত্রাসবাদী কারা তা বুঝতে কারো অসুবিধা হবার কথা নয়। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, আমাদের দেশের লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং এ বিষয়ের যারা গবেষক ও বিশ্লেষক বলে নিজেদের প্রচার করেন তারা বিষয়টি বোঝেন না। কিংবা বুঝেও না বোঝার ভান

www.pathagar.com

করেন। এদের ধারণা রাজনীবিদরা ধোয়া তুলসী পাতা। তারা সন্ত্রাস করে না। সন্ত্রাস করে না ছাত্ররাও, কারণ তারা বই-খাতা- কলম নিয়ে দিন রাত মহাব্যস্ত থাকে। ছাত্রদের নাম ভাঙ্গিয়ে সন্ত্রাস করে গুটিকয়েক বহিরাগত ক্যাডার আর মাস্তান। বলতে দ্বিধা নেই যে এসকল কথা যারা বলেন, লেখেন এবং ভাবেন তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে সত্য গোপন করেন। 'আজকের কাগজ' আয়োজিত 'ছাত্র রাজনীতি, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও আমাদের করণীয়' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে (৯/৫/৯৮) দেশের রাজনীতিবিদ ও প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীরা উল্লিখিত অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। ৭/৭/৯৯ তারিখে বাংলাবাজার পত্রিকার উপসম্পাদাকীয়তে 'নতুন প্রজন্ম ও ছাত্র রাজনীতি' নামক প্রবন্ধেও একজন খ্যাতিমান গবেষক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক একই সুরে কথা বলেছেন। আমি সবিনয়ে সকলের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে বলতে চাই যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোসহ দেশের সর্বত্র সন্ত্রাসের যে তাণ্ডব চলছে তা গুটিকয়েক ক্যাডার বা মাস্তানের দ্বারা সম্ভব নয়। সমগ্র দেশে সন্ত্রাস যে মহামারীর রূপ নিয়েছে তাতে নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, এই সন্ত্রাসে সর্বস্তরের মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ ছাড়া সম্ভব নয়। এই সমস্ত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে এত অধিক সংখ্যায় মানুষ অংশ গ্রহণকরছে যে, তা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকেও হার মানিয়েছে।

অখণ্ড ভারতের রাষ্ট্রীয় পরিষদে মিঃ হ্যালেটের তথ্যে জানা যায় যে, ১৯৩১সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারি এই তিন বছর এক মাস সময়ে বাংলায় সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে মোট ২১০টি। এর মধ্যে খুনের ঘটনা ঘটে ১৩১টি, অত্যাচারের ঘটনা ৩৭টি, ডাকাতি ৭৬টি, লুণ্ঠন ৪৬টি, লুণ্ঠনের চেষ্টা ১৪টি, বোমা ফাটানো ৫টি, সশস্ত্র লুণ্ঠন ১টি। এছাড়া এই সময়কালে অন্যান্য প্রদেশে যে সকল সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে তার মধ্যে মাদ্রাজে ৬, বোম্বাইয়ে ১৭, বিহার ও উড়িষ্যায় ১৪, আসামে ১৩, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৬, মধ্য প্রদেশে ৬, পাঞ্জাবে ২০ এবং দিল্লিতে ৪ (প্রবাসী, ৩৪ ভাগ, ১ম খণ্ড, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১, পৃঃ ২৯২)। অর্থাৎ তৎকালে বিশাল ভারতবর্ষে ব্রিটিশবিরোধী যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সেই আন্দোলনে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ সত্ত্বেও গড় হিসেবে মাসে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে মাত্র ৮টি। সে ক্ষেত্রে বর্তমানে বাংলাদেশে যে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটছে তার সংখ্যার সঠিক হিসেব নিলে হয়তো দেখা যাবে মাসে নয় প্রতি ঘন্টায় ৮টিরও বেশি সন্ত্রাস সংঘটিত হচ্ছে। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, দেশে কত বিরাট সংখ্যক মানুষ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে রাজনীতিবিদ, রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠনের সদস্য, ছাত্র, শিক্ষক, অফিসার, কর্মকর্তা, বুদ্ধিজীবীসহ আরও অনেকে। এর যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়। তবে তার সংখ্যা অতি নগণ্য। এবং এ সকল সন্ত্রাসীরাও রাজনৈতিক দলের নাম ভাঙ্গিয়ে সন্ত্রাস করে থাকে। যে কারণে সন্ত্রাস সমগ্র দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অলিগলি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। পত্র পত্রিকার পাতা উল্টালেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ক্ষমতায় যাওয়া এবং প্রাপ্ত ক্ষতমা যেনোতেনো প্রকারে কুক্ষিগত করে রাখা আমাদের দেশের রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য হওয়ায় রাজনৈতিক সন্ত্রাস

www.pathagar.com

তীব্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। এই সন্ত্রাসের ব্যাপকতা এবং তীব্রতার অন্যতম কারণ দেশে সকল স্তরের মনুষকে রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভূক্ত করা। যেমন ছাত্র সামজ। দেশের ছাত্র সামাজের সিংহভাগই কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য। ফলে স্ব-স্ব রাজনৈতিক দলের সহায়ক শক্তি হিসেবে বছরব্যাপী তাদেরকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকতে হয়। রাজনৈতিক দলের আদেশ-নির্দেশ পালন করতে হয়। রাজনৈতিক দলের আদেশ-নির্দেশ পালন করতে গিয়ে প্রতিপক্ষ দলের সঙ্গে সংঘর্ষে তথা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়তে হয়। এমনকি হত্যাকাণ্ডও সংঘটিত করতে হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছাত্রাবাস ও হলসমূহে নিজ দলের প্রভাব বিস্তার করতে এবং সেগুলো দখলে রাখতে অনিবার্য কারণেই সংঘর্ষ কিংবা সন্ত্রাসে লিপ্ত হতে হয়। দেশে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দেশের সর্বত্রই ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করছে। ফলে স্বাভাবিক কারণেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অচলাবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে হত্যা এবং অচলাবস্থা সৃষ্টির জন্য ছাত্ররা দায়ী হলেও এমনকি আগ্নেয়াস্ত্র হাতে প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করলেও সঙ্গত কারণেই কর্তৃপক্ষ তো দূরের কথা পুলিশের পক্ষেও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। যদিও বিরোধী দলের কোন কোন ছাত্রকে কখনো কখনো গ্রেফতার করতে দেখা যায়। বিশেষ বেকায়দায় পড়লে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রকেও ধরতে দেখা যায়, তবে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির কারণে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রকে বেশিক্ষণ ধরে রাখা যায় না। তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস, খুন ও ধর্ষণের মত মারাত্মক অপরাধের অভিযোগ থাকলেও ছেড়ে দিতে হয়। কারণ তারা শক্তিধর নেতা-নেত্রীদের আশীর্বাদপুষ্ট। আশীর্বাদপুষ্ট হওয়ার কারণে এ ধরনের ছাত্ররা নিজেদেরকে মহা শক্তিধর মনে করে থকে, এবং অমার্জনীয় অপরাধ করেও আইনের আওতার বাইরে মহা দাপটের সাথেই বসবাস করে। তাদের দাপটের কাছে সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষ অসহায় বোধ করে। অশান্তির মধ্যে বসবাস করে। 'চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপে এক ঘন্টা বন্দুক যুদ্ধ, রাস্তায় ব্যারিকেড, ভাঙচুর, আহত দশ' ' ছাত্রলীগে অন্তর্দ্বন্দ্ব-সূর্যসেন হল থেকে ২ ছাত্রলীগ কর্মীকে গ্রেফতার, পরে মুক্তি, হলে উত্তেজনা'। 'আইনের হাত থেকে বাঁচার জন্যে গ্রহণ করে রাজনৈতিক শেল্টার - আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হাতে রাজধানীর টপ টেররা একের পর এক খুন হচ্ছে। 'ট্রিপল মার্ডার মামলার আসামী চট্টগ্রামের টপটেরর প্রাক্তন ছাত্রলীগ নেতা (বর্তমনে আওয়ামী লীগ নেতা) নাসের গ্রেফতার, বিক্ষোভ, ভাঙচুর'। 'পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে চরম উত্তেজনা প্রতিপক্ষের গুলীতে ছাত্র সংসদের ভিপি সোহেল নিহত,' 'ফেনীতে ছাত্রলীগের কর্মীদের গুলিতে স্কুলছাত্রী নিহত'। 'গতকাল কাদের সিদ্দিকীর নিজ শহর টাঙ্গাইলে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে সড়ক অবরোধ ছাড়াও তার বিপক্ষে ছাত্রলীগের সমাবেশে হামলা, বোমা বিস্ফোরণ, পুলিশের টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। শহরে থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে।' ৫, ৬, ৭, ৮, ১২, ১৫, জুলাই '৯৯ তারিখের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত এসকল সংবাদ এবং সংবাদের শিরোনামগুলো ছাত্র- রাজনীতি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র। অতীতের ক্ষমতাসীন এবং

www.pathagar.com

অন্যান্য দলের ছাত্র সংগঠনগুলোর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডেরও এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। বিগত বছরগুলোর পত্র-পত্রিকার পাতা উল্টালেই এর ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যাবে। অথচ রাজনৈতিক বিশ্লেষক, গবেষক, লেখক এবং বুদ্ধিজীবী (?) সম্প্রদায় এ সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী করে থাকেন গুটিকয়েক অছাত্র বহিরাগত ক্যাডারদের!

ছাত্র রাজনীতি এবং তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অনুরূপ ভয়াবহ অবস্থা প্রত্যক্ষ করা যাবে দেশের অফিস, আদালতের চাকরিজীবী, বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষকসমাজের ক্ষেত্রেও। কারণ চাকরিজীবী, বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষকবৃন্দও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় বিভক্ত হয়ে রয়েছেন। তারাও ছাত্রদের মতই বছরব্যাপী স্ব-স্ব রাজনৈতিক দলের পক্ষে নানাভাবে রাজনীতি করে থাকেন। পরিণতিতে বিভিন্ন স্থানে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক কোন্দলের কারণে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডও সংঘটিত হয়। তারা মিছিল করেন। বক্তৃতা করেন। উস্কানি দেন। প্রতিপক্ষকে শাসান। প্রতিপক্ষও তাদের রাজনৈতিক শক্তির সাহায্য ও সমর্থন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ফলে দেশের সর্বত্রই অশান্তি বিরাজ করে। অফিস-আদালতের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়। সাধারণত ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকদের দাপট বিস্তৃত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে হয় লোমহর্ষক। সমর্থকরা দলের পক্ষে একদিকে শ্লোগান দেয়, অন্যদিকে অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়। আন্যায় করা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দল সমর্থকদের লালন করে বিধায় অন্যায়ের প্রতিকার হয় না এবং চক্রবৃদ্ধি হারে সমাজে অন্যায় বিস্তার লাভ করে। এমনিভাবে প্রতিটি সরকারের আমলেই কম বেশি সন্ত্রাস হয়ে থাকে। বর্তমান সরকারের আমলে সন্ত্রাস কি পরিমাণ বিস্তার লাভ করছে তা ব্রিটিশ সরকারের বক্তব্যে সুস্পষ্ট।

বাংলাদেশে অবস্থানরত ব্রিটিশ নাগরিকদের পরামর্শ দিতে গিয়ে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, 'এ দেশে প্রায় হরতাল, সভা-সমাবেশ, বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। এর কিছু কিছু সংঘাতপূর্ণ এবং এতে বোমা ও অন্যান্য বিস্ফোরণও ঘটে থাকে। এমনকি মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে। পুলিশ ক্ষমতার অপব্যবহার করে বলে অভিযোগ রয়েছে। রাতে আন্তঃশহর সড়কগুলোতে সশস্ত্র ব্যক্তিদের উপস্থিতি থাকে। যাত্রীবাহী ট্রেন, দূরপাল্লার বাস এবং ফেরিতে সংঘবদ্ধ চুরির ঘটনা ঘটে থাকে। এছাড়া স্বর্ণালংকার ব্যাগ, ছিনতাই-এর ঘটনা নিয়মিতই ঘটছে'। বলা হয়েছে 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের দিক থেকে বাংলাদেশে ব্রিটিশ স্বার্থের প্রতি ক্রমবর্ধমান হুমকি রয়েছে' (দৈনিক ইত্তেফাক' ২৫ মার্চ '৯৯)।

দেশের এহেন নাজুক পরিস্থিতিতে যে শিল্পী সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবী সমাজ জাতীয় সংকটকালে সরকার এবং রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীদের সৎ পরমর্শ দেবে, সংকট উত্তরণের জন্য সঠিক পথ বাতলে দেবে, জাতিকে উন্নত ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাবে, সেই সাহিত্যিক ও বৃদ্ধিজীবী সমাজের সম্মানিত সদস্যবৃন্দের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে কট্টর সমর্থকরূপে বিভক্ত হয়ে পড়া জাতির জন্য মহা শংকার কারণ। মহাশংকার কারণ এ জন্যে যে, এসকল, শিল্পী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা স্ব-স্ব দল বিশেষ করে ক্ষমতাসীন দলের অন্যায় অপকর্ম ও হত্যাকাণ্ডসহ জাতীয় স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডের কোনরূপ প্রতিবাদ

www.pathagar.com

করার সাহস করে না। কারণ তাতে দলের প্রতি তাদের আনুগত্যের ব্যাঘাত ঘটে। এমনিভাবে তারা স্ব-স্বার্থ ও ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থে জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে জাতীয় সর্বনাশ ডেকে আনেন। তারাও ক্ষমতাসীন এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সমর্থনে নানাভাবে সন্ত্রাসী কার্যে অংশগ্রহণ করে থাকেন। শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী সমাজের এহেনো জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থী কর্মকাণ্ডের প্রতি লক্ষ্য রেখেই শিক্ষা সংস্কৃতি ও শান্তি প্রচারে নিবেদিত, দেড় কোটি সদস্যের বৌদ্ধ জনসংগঠন, জাপানের সোকা গক্কাইয়ের সভাপতি দাইসাকু ইকেদা বলেছেন যে, 'যে সব শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী মধ্যপন্থা অনুসরণ করতে পারেন নি তারা প্রায়ই ক্ষমতার শিকারে পরিণত হয়েছেন, যার ফলে তারা নিজেদের সৃজনশক্তি অঙ্কুরিত হওয়ার বিনষ্টিসাধন করছেন'। বলেছেন, 'শিল্পী এবং বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে রাজনীতিতে উৎসাহিত হওয়া বা তাদের সমসাময়িক পরিস্থিতির সংস্কারসাধনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকাটা দোষের নয়। অন্যদিকে প্রধানত গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে যে রাজনীতিতে গভীরভাবে জড়িত হওয়াটা তাদের পরিহার করা উচিত। যাতে তারা ক্ষমতার অশুভ শক্তির নিকট আত্মবিসর্জন দিয়ে নিজেদের ও অন্যদের সর্বনাশ ডেকে আনতে না পারেন' (সৃজনমূলক জীবনের দিকে ও একটি কথোপকথন, আর্নল্ড টয়েনবি, দাইসাকু ইকেদা, ইউপিএল, ১৯৯৮.পৃঃ ৬৭, ৬৮)। আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাবে যে, দার্শনিক সক্রেটিস নিজে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন নি। আবার রাজনীতি একেবারে এড়িয়েও যাননি। আর এজন্যেই (প্রখ্যাত পত্রিকা 'টাইম'-এর মতে) আইনস্টাইন শোয়াইৎজার বা বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মত আন্তর্জাতিক ঋষি আর্নল্ড টয়েনবি বলেছেন 'রাজনীতিতে যাওয়ার চেষ্টা নয় বা রাজনীতি এড়িয়ে যাওয়াও নয়-সক্রেটিসের এই আচরণ আমার মনে হয় শিল্পী এবং বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে যথার্থ আচরণ (ঐ, পৃঃ ৬৮) কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে- আমাদের দেশের শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের সিংহভাগই সক্রেটিস অনুসৃত নীতির বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তাদের অনেকেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পালন করাকে নিজেদের নৈতিক দায়িত্ব মনে করে থাকেন। ফলে সন্ত্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। একজন শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবী একসময় বলেছেন যে, 'হরতাল ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই। এটা হচ্ছে সর্বশেষ গণতান্ত্রিক অস্ত্র। এ অস্ত্র ব্যবহার করার পরও যদি সরকার দাবি না মানে তবে সংঘর্ষে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই' (আজকের কগজ, ৬/১০/৯৫)। এ বক্তব্যই প্রমাণ করছে আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা কতটা রাজনীতিপ্রবণ তথা সন্ত্রাসবাদী । এই সন্ত্রাসবাদী আচরণের কারণেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থক শিল্পী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের পারস্পরিক সংঘাতে লিপ্ত হতে দেখা যায়। তাদের কিংবা তাদের সমর্থকদের দ্বারা অনেককেই প্রকাশ্য রাজপথে আক্রান্ত হতেও দেখা যায়। অনেকে শালিনতা বিবর্জিত বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করেও থাকেন।

একইভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অফিস আদালতে অফিসার-কর্মচারীদের মধ্যে, পাড়ায় মহল্লায় যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে, কলে কারখানায় শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে, হাটবাজারে

www.pathagar.com

দোকান-কর্মচারীদের মধ্যে হিংসা, দ্বেষ, সংঘাত তথা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড লেগেই আছে। ফলে সমগ্র দেশটাই আজ সন্ত্রাসী দেশে পরিণত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সকল শ্রেণীর মানুষকে ব্যাপক হারে রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভূক্ত করার কারণেই এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। বর্তমানে ছাত্র-শিক্ষক ও সরকারি অফিসার কর্মকর্তাদেরও রাজনীতি করবার ঢালাও অধিকার প্রদান করা.হয়েছে। ফলে অনিবার্য কারণে দেশের সর্বত্র অপ্রতিরোধ্য সন্ত্রাস প্লেগের মত ছড়িয়ে পড়ছে। রাজনীতি যাদের পেশা সেই সকল রাজনীতিবিদের মধ্যে রাজনীতি করবার অধিকার সীমাদ্ধ থাকলে লাগামহীন সন্ত্রাস হতে পারতো না । সুতরাং সন্ত্রাস নির্মূল করবার অসার আস্ফালন না করে রাজনীতিবিদদের দ্বারা রাজনীতি এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড করবার পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে এবং রাজনীতি যাদের পেশা নয়, রাজনীতি যাদের জন্য প্রযোজ্য নয় তাদের উপর থেকে রাজনীতি করার অধিকার প্রত্যাহারের মধ্য দিয়ে সন্ত্রাস কমিয়ে আনবার পদক্ষেপ নেয়া উচিত। যাতে সাধারণ মানুষের জীবনযাপনে কোন ব্যাঘাত না ঘঠে। সার্থকভবে এই কাজটি করতে পারলে তবেই সন্ত্রাসের ব্যাপকতা কমে আসবে। রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে সীমিত সংখ্যায় সন্ত্রাস থাকলেও সাধারণ মানুষের জীবনে শান্তি ফিরে আসবে। যা আমাদের সকলেরই কাম্য। ২৬-৭-১৯৯৯।

www.pathagar.com

কোরবানীর গোস্তঃ সামাজিক ও রাজনৈতিক উপাখ্যান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। ঈদ-উল-আযহা'র ছুটিসহ মেটামুটি লম্বা ছুটিই। ঈদ উপলক্ষে গরু-ছাগল নিয়ে দিন কয়েক ব্যস্ততার মধ্যেই কেটেছে বলা যায়। কিন্তু সেই ব্যস্ততারও শেষ। অর্থাৎ ঈদ শেষ হয়েছে একদিন আগে। পত্র-পত্রিকা বন্ধ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ক্লাবও বন্ধ। দোকান-পাট, প্রায় সবই বন্ধ। সর্বত্রই ফাঁকা। যেনো বিরোধী দলের অঘোষিত হরতাল চলছে। যেনো নিত্যদিনের সেই পরিচিত ঢাকা শহর নয়। সর্বত্রই উদাস ভাব। মাঝে মধ্যে কাকদের আনাগোনা। ক্যাম্পাসে অবস্থানরত অধ্যাপক বন্ধুদের সাথে কচিৎ দেখাশোনা। এমনি এক পরিবেশে গরম হাওয়ার এক অলস বিকেলে হাতে এলো ছোট্ট এক চিঠি। ছ' লাইনের হাতে লেখা চিঠি। লিখেছেন "সাত্তার সাহেব, আস্‌সালামু আলাইকুম। আগামীকাল শনিবার রাত নয়টায় আমার বাসায় ভাবীকে নিয়ে আসবেন। একটু খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করেছি। চাউলের গুঁড়ির পিঠা আর গোস্ত। জমবে ভাল, কী বলেন? পত্রের মাধ্যমে দাওয়াত, মনে করলেন নাতো কিছু? আমরা এখানকার বন্ধু-বান্ধবরাই একত্রিত হবো শুধু। ইতি।" চিঠিটা লিখেছেন আমারই এক অধ্যাপক বন্ধু। মন্দ কি, তপ্ত হাওয়ার অলস দিনে খাওয়াটা বড় কথা নয়। ক'জনায় মিলিত হবো, তারপর দেখাশোনা, খোশ গল্প, কোরবানীর অভিজ্ঞতা, শুভেচ্ছা বিনিময়। এক রাশ আশা নিয়ে আনন্দঘন পরিবেশের মুহূর্তটির অপেক্ষায় রইলাম। আরও এক দিনের অপেক্ষা।

রাত ৯টা বেজে পনের হবে। তখনও কেউ কেউ আসছেন। দেখা গেল গৃহকর্তাসহ আমরা মোট ৯জন একত্রিত হয়েছি। অনেকেই সস্ত্রীক এসেছেন। মহিলারা স্বভাবগত কারণেই আলাদা স্থানে অবস্থান নিয়েছেন। খাবার শূন্য গোল টেবিলকে ঘিরে তাঁদের আড্ডা জমে উঠেছে। আমাদের আড্ডা ড্রইং রুমে। রুমটি সুন্দর, গোছালো। রুমের দেয়ালে পেইন্টিং-এর রিপ্রডাক্‌শন ঝুলানো। সখ আছে, রুচি আছে, আছে শৈল্পিক মন, কিন্তু সামর্থ নেই, তাই অগত্যা অরিজিনালের পরিবর্তে রিপ্রডাক্‌শন। রুমের একদিকে পুরো দেয়াল জুড়ে মূল্যবান গ্রন্থের আলমারী সাজানো। সেদিকে ইঙ্গিত করে একজন বলে উঠলেন- আদর্শ অধ্যাপকের আদর্শ কক্ষ। কিন্তু এই প্রশংসা বাক্যে গৃহকর্তা অধ্যাপক বন্ধুটি খুশি হবার পরিবর্তে বিষন্নবোধ করলেন। বললেন- এসব এখন আর বুদ্ধিবৃত্তির

www.pathagar.com

উপাত্ত নয়। নয় উপাদান। এগুলো এখন আমার জন্য যন্ত্রণাদায়ক বোঝা। কারণ এখন সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি হতে, সমাজের উপর কাঠামোয় অবস্থান পেতে, এমনকি শিক্ষা ক্ষেত্রেও বড় পদটি পেতে জ্ঞান বা গ্রন্থের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন সন্ত্রাসী, অসৎ ব্যবসায়ী, লুটপাটে সিদ্ধহস্ত অফিসার ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের আশীর্বাদ। যে আশীর্বাদের জোরে অযোগ্য প্রার্থী উচ্চ পদে আসীন হয়। যে আশীর্বাদে কেউ কেউ আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ, নয় বিশাল বটবৃক্ষে পরিণত হয়। যে আশীর্বাদের গুণে ২য় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা জানা দেহ ব্যবসায়ী সুন্দরী ফারাহ নামক যুবতী ঢাকার আকাশচুম্বী ব্যয়বহুল কনকর্ড টাওয়ারে বিলাসবহুল জীবন-যাপনে সমর্থ হয়। ঢাকার সর্বাধিক বিলাস বহুল হোটেল সোনারগাঁওয়ের হেলথ ক্লাবের সদস্য হয়। হোটেলের সুইমিংপুলে সাঁতার কাটতে সাহসী হয়। অধ্যাপক বন্ধুর এই বক্তব্যের এক পর্যায়ে অন্য অধ্যাপক বলে উঠলেন- অথচ দেখুন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সর্বোচ্চ মেধা ও সর্বোচ্চ শিক্ষার অধিকারী হয়েও বাসা ভাড়া বাদে যে বেতন পান তা দিয়ে মাসের প্রথম বাজারের প্রয়োজনীয় সামগ্রীও কিনতে পারেন না। কোরবানীর এক হাট থেকে আর এক হাটে ছুটতে হয়। কোথায় কম দামে গরু পাওয়া যায় তার জন্যে।

কোরবানীর গরুর কথা উঠতেই গৃহকর্তা অধ্যাপক পুনরায় বলে উঠলেন- কোরবানীর গোস্ত নিয়ে বড়ই মনোবিকারে ভুগছি। চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করছি। গোস্ত নিয়ে তাঁর মানোবিকারের কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, আমার এক বন্ধু ১০/১২ কেজির মত বিরাট দু'খণ্ড কোরবানীর গরুর গোস্ত দিয়ে গেছেন। কিন্তু তার গরু বৈধ অর্থে কেনা নয়। এই অবৈধ গোমাংসই মনোপীড়ার কারণ। তিনি জানালেন এই মাংসদানকারী বন্ধুরা পাঁচ ভাই। বাবা পুলিশের একজন নগণ্য সেপাই ছিলেন। দু'বেলা তাদের পেটপুরে খাওয়াতেও পারতেন না। এমন এক পরিবারের সেই বন্ধুটি এখন প্রায় কোটি টাকায় নির্মিত নিজের বাড়িতে বসবাস করেন। ১০/১২ লক্ষ টাকার গাড়িতে চড়েন। উচ্চ মূল্যে গরুও কিনেন। এরপর যে তথ্য তিনি দিলেন তা শুনে সকলেই থ হয়ে গেলেন। তিনি চাকরি করেন ৩২০০/-টাকা বেতনে। কেউ কেউ বললেন, এত অল্প বেতনে, এত অল্প সময়ে এই বিশাল সম্পত্তির মালিক হলেন কি করে? অধ্যাপক বন্ধুটি বললেন হবে না! তিনিতো কাস্টমস-এ চাকুরি করেন। অর্থাৎ তিনি আমদানি রফতানি শুল্ক বিভাগের একজন ৩২০০/-টাকা বেতনের চাকুরে। এবার বুঝুন উপর মহলের আশীর্বাদ কাকে বলে। আশীর্বাদ থাকলে কম বেতন কোন সমস্যাই নয়। এই হচ্ছে বাংলাদেশের আসল চিত্র। বাংলাদেশ লুটপাটের আখড়া ছাড়া আর কিছু নয়। উপর মহলের কর্মকর্তা আর ক্ষমতাসীনদের প্রায় সকলেই এই লুটপাট সমিতির সদস্য। যে কথা বিরোধীদলের নেত্রী প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন সভা সমিতি বা বিবৃতিতে বলে থাকেন। । এই সদস্যদের লুটপাটের কারণে দেশের সাধারণ মানুষ সর্বস্বান্ত হচ্ছে। উন্নতির পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে দেশ ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হচ্ছে। দেশের মানুষ নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হচ্ছে। দরিদ্র মানুষের আহাজারী আর আর্তনাদে দেশের সর্বত্র বিষাদের ছায়া নেমে আসছে। সাধারণ মানুষ

www.pathagar.com

সকল দলের নেতা-নেত্রী-কর্মী ও শাসকদের প্রতি আস্থা হারিয়ে তাদের প্রতি সন্দিহান হয়ে পড়ছে। যে কারণে দেশের ভবিষ্যত ত্রাতারূপে সর্বাধিক প্রচারিত বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার দেয়া আশ্বাসেও মানুষ আশ্বস্ত হতে পারছেন না। সন্দেহমুক্ত হতে পারছেন না। কারণ ক্ষমতায় যাবার পূর্বে সবাই একই কথা বলেন। আর সে কারণেই কেউ কেউ শেখ হাসিনাকে বলেন 'মাগো কথাতো ঠিক, ক্ষমতায় গেলে মনে থাকবে তো'? (বাংলাবাজার পত্রিকা,১৪/৫/৯৫)।

বাংলাদেশে গত কয়েক দশকে এমন নিদর্শন আছে কী যে, শাসককূল কৃষক শ্রমিক ও সাধারণ মানুষদের মনে রেখেছেন? রাখেননি। মনে রাখলে দেশের অবস্থা ভিন্নতর হতো। মানুষের মুখে হাসি ফুটতো । তবে একেবারেই যে মনে রখেননি তা নয়। মনে রেখেছেন, এবং এখনও রাখছেন। মনে রাখেন ঐ ভোট ভিক্ষার ক'দিন । কিন্তু ভোট পেলেই সব ভুলে যান। শুধু তাই নয় মনে মনে লজ্জানুভব করেন। সামান্য ভোটের জন্য ঘামে ভেজা নোংরা, ময়লা ও বিটকেলে গন্ধযুক্ত শতছিন্ন কাপড় পরিহিত অস্পৃশ্য অচ্ছুত মানুষদের সান্নিধ্যে যাওয়া ও হাতে হাত মেলানোর দুঃসহ যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতার কথা ভেবে অস্থির চিত্ত হন। দামী বিদেশী সুগন্ধি সাবান দিয়ে বার বার হাত ধুয়েও স্বস্তি পান না। গা ঘিন ঘিন করে। এ হেনো অভিজ্ঞতালব্ধ অনুভূতিকে সহজে ভুলতে পরেন না। তবে দিন কয়েকের ব্যবধানে সব কিছু ভুলে যান। ভুলে যান তখন যখন চারদিকে অর্থের গন্ধ পান। ঝকঝকে কড়কড়ে নতুন টাকার বাণ্ডিলের গন্ধ কৃষক-মজুরের বিটকেলে ঘামের গন্ধ ভুলিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, নতুন টাকার গন্ধ নেশা ধরিয়ে দেয়। যে নেশা কারও কারও না খেতে পাওয়া অতীতকে ভুলিয়ে দেয়। ভুলিয়ে দেয় দেশ ও দেশের মানুষকে, শিক্ষা-দীক্ষা, আদর্শকে। ভুলিয়ে দেয় ন্যায়-নীতি, সমাজনীতি ও মনুষ্যত্ববোধকে। যে কারণে ক্ষমতাসীনদের সাথে সাথে তাদের পিয়ন আর্দালীরা পর্যন্ত নেশায় আক্রান্ত হয়। আর সে কারণেই বিশেষ বিশেষ অফিস ও সংস্থার পিয়ন আর্দালীরাও একাধিক বহুতল ভবনসহ অবৈধ অগাধ সম্পত্তির মালিকে পরিণত হয়। হয় দুরর্দণ্ড প্রতাপশালী। ফলে দুর্নীতিবাজ মন্ত্রী, এমপিসহ এই সমস্ত দুর্নীতিবাজ আমলা, অফিসার, কর্মচারীদের দুর্নীতির তদন্ত করতে গেলে তদন্তকারী অফিসার ও সৎ মানুষদের উপর নেমে আসে অত্যাচারের স্টিমরোলার। গত ১০ই মে, '৯৫ তারিখে একটি দৈনিকের খবরে প্রকাশ ৪ জন মন্ত্রী, একাধিক সরকার দলীয় এমপিসহ সরকারের বিভিন্ন দফতরের বাঘা বাঘা দুর্নীতিবাজদের স্বরূপ উন্মোচন করায়, প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের ৬০ ভাগ কিভাবে তাদের পকেটে যায় সেকথা বলে ফেলায় এবং দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান চালানোর অপরাধে দুর্নীতি দমন বিভাগের ডিজিকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। কি অবিশ্বাস্য ভয়ংকর ঘটনা! হিন্দি ফিল্মের হুবহু অনুকরণ। লুটেরা ও অপরাধীদের অপরাধ তদন্ত করা যাবে না। অপরাধীর শাস্তি হবে না। কারণ তারা উপর মহলের মানুষ। যত তদন্ত, যত শাস্তি সবই ঐ ভোটদাতা হাড্ডিসার সাধারণ সৎ মানুষদের জন্য! এর পরেও ক্ষমতাসীন এবং ক্ষমতালিপ্সুরা ভোট চাইতে সাহস পায়!

www.pathagar.com

দেশের যে নাজুক অবস্থা তাতে সর্বস্তরে সকল মানুষের সোচ্চার দাবি ওঠা উচিত- এখন আর ভোট নয়। ভোটের আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকারও নয়। ভোটের আগে হিসেব-নিকেশের প্রয়োজন! প্রয়োজন বোঝাপড়ার। এ বোঝাপড়া ভোটদাতা এবং ক্ষমতাসীনদের বোঝাপড়া। ক্ষমতালিপ্সুদের সাথে বোঝাপড়া। ভোটের আগে বোঝাপড়া হোক কি করে কাস্টমস-এ ৩২০০/-টাকা বেতনের চাকুরে কোটি টাকার বাড়িসহ অগাধ সম্পত্তির মালিক হয়। কি করে নগণ্য একজন পিয়ন বহুতল ভবনের মালিক হয়। কি করে উপর মহলের আমলা অফিসারদের গর্দানের মাংস বৃদ্ধি পায়। কি করে চামচারা রাতারাতি কোটিপতি হয়। কি কারণে মন্ত্রী-এমপিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হয়। পক্ষান্তরে কোন অভিশাপে সাধারণ মানুষ দিনের পর দিন অভুক্ত থাকে। নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। অর্থের অভাবে, সারের অভাবে কৃষকের জমি অনাবাদি থাকে। এ ধরনের হাজারো সমস্যার সমাধান প্রয়োজন। প্রয়োজন পাহাড় প্রমাণ বৈষম্যের অবসান। হরতাল, অবরোধ নয়, সকল রাজনৈতিক দল বসে লুটপাট ও দুর্নীতির উৎস চিরতরে বন্ধের ব্যবস্থা করুন। কেউ ক্ষমতায় গেলে তার যেনো পুনরাবৃত্তি না হয়। পকেটস্থ নয়, বৈদেশিক সাহায্যের সকল অর্থ রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যয়ের বিষয় নিশ্চিত করুন। লুটেরা ও দুর্নীতিবাজদের অবৈধ পথে উপার্জিত অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে এনে তাদের অপরাধের শাস্তি বিধান করে সাধারণ ভোটারদের আস্থা বৃদ্ধি করুন। যাতে কেউ অপনাদের বিষয়ে আশংকা প্রকাশ না করেন। অবিশ্বাসী না হন। প্রশ্ন না করেন ক্ষমতায় গেলে ওয়াদার কথা, আমাদের কথা মনে থাকবে তো? ২০-৫-১৯৯৫।

www.pathagar.com

বরফ গলছে না তাই

একুশ বছরের দীর্ঘ সংগ্রাম শেষে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকার এখন ক্ষমতায়। কিন্তু ক্ষমতা এ সরকারকে শান্তি দিতে পারছে না। পাহাড় প্রমাণ সমস্যা অক্টোপাসের মত চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। উপরন্তু সরকারের টেকনোক্র্যাট মন্ত্রীদের অযোগ্যতা এবং অদূরদর্শিতার কারণে নব নব সমস্যা সরকারকে আরো বিপদগ্রস্ত করছে। শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতা এবং শেয়ার কেলেঙ্কারি এসবের অন্যতম। পানি চুক্তিসহ ভারতের সাথে স্বাক্ষরিত সাম্প্রতিক চুক্তিসমূহও গলার ফাঁসরূপে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে। তাছাড়া রাজনৈতিক হত্যা, সন্ত্রাস ও অরাজকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও দেখা দিয়েছে বিশৃঙ্খলা। সীমান্তের ওপার থেকে অবৈধভাবে অবাধে পণ্যসামগ্রী এসে দেশের বাজার গ্রাস করছে। একইভাবে ভিনদেশী নাগরিকদের অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটছে। পত্রপত্রিকার তথ্য মতে ব্যাংকগুলো শূন্য হতে চলেছে। আর এই সুযোগে সরকার বিরোধী আন্দোলনের জোর প্রস্তুতি চলছে। এহেন সমস্যার ও চাপের কারণে ন'মাসের শিশু সরকার চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করেছে। এমতাবস্থায় কেউ কেউ অসহায় সরকারকে আশ্বস্ত করে বলছেন, এগুলো কিছু নয়। সবই বিরোধী দলের কারসাজি। বিদ্যুৎ টাওয়ার ভাঙ্গাসহ যাবতীয় কিছু করছে বিরোধী দল বিএনপি। এসব স্যাবোটাজ ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং স্যাবোটাজ যারা করছে তাদের জেলে পুড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে। যেমন পরামর্শ তেমন কাজ। শেখ হাসিনার সরকার, সরকারি প্রচারযন্ত্র এবং সরকারের স্তাবক বুদ্ধিজীবী, লেখক সকলে মিলে বিএনপির বিরুদ্ধে স্যাবোটাজের অভিযোগ এনে জোর প্রচারণায় নেমে পড়েন এবং এক পর্যায়ে বিদ্যুৎ টাওয়ার ভাঙ্গার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে বিএনপির চার নেতাকে গ্রেফতার করে বলা হলো গোয়েন্দা সংস্থা চার নেতার ষড়যন্ত্র উদঘাটন করে রিপোর্ট দেয়ায় সুস্পষ্ট অভিযেগের ভিত্তিতে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার তাদের বিরুদ্ধে আনীত কোন অভিযোগই প্রমাণ করতে পারেনি। ফলে হাইকোর্ট চার নেতার গ্রেফতারকে বেআইনি ঘোষণা করে তাদের মুক্তি দিয়েছে। আর এর মধ্যদিয়ে স্যাবোটাজের অভিযোগ উদ্দেশ্যমূলক ও মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে। অপরপক্ষে গঙ্গার পানিচুক্তি নিয়ে কথা বলায় একইভাবে আওয়ামী সরকারের বিরুদ্ধে বিএনপির ষড়যন্ত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু তাও ধোপে টেকেনি। কারণ পানি চুক্তি যে অসম , উদ্দেশ্য মুলক, অকার্যকর এবং লোক দেখানো তা ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টর হচ্ছে। অস্পষ্ট, অসম, অকার্যকর পানিচুক্তির প্রকৃত অবস্থাকে

www.pathagar.com

ধামাচাপা দিতে প্রচারের নানা কৌশল অবলম্বন করেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। ৩০ বছরের পানি বণ্টন চুক্তি যে শুভঙ্করের ফাঁকি তা গোপন রাখতে পারছেন না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানিক মিয়া এভিনিউ-এর জনসভায় ৭ এপ্রিল তারিখে বলেছেন 'দীর্ঘদিনের বিরাজমান পানি সমস্যা, ফারাক্কা সমস্যার সুরাহা করেছি, ঐতিহাসিক পানি চুক্তি করেছি, গঙ্গার পানিতে আমাদের ন্যায্য হিস্যা আদায় করেছি' (বাংলাবাজার পত্রিকা, ৮/৪/৯৭)। কিন্তু তার এসকল দাবিও ভ্রান্ত পমাণিত হয়েছে। কারণ প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পাশাপাশি একই দিনে একই পত্রিকার মাধ্যমে পানি বণ্টন চুক্তির প্রকৃত অবস্থা জনগণ জানতে পেরেছে। বাংলাদেশ ও ভারতের পানি বিশেষজ্ঞদের অভিমত তুলে ধরে পত্রিকায় বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশ গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির শর্ত অনুসারে পানি পাচ্ছে না। ঐদিন একই পত্রিকার সম্পাদকীয়তে মন্তব্যে বলা হয়েছে চুক্তিহীন অবস্থায় পদ্মায় যে প্রবাহ থাকতো, চুক্তি হওয়ার পর প্রবাহ তার চেয়ে কমে গেছে। মার্চের শেষদিকে ৩০ হাজার কিউসেকের স্থলে পদ্মায় প্রবাহ ছিল মাত্র ৯ হাজার কিউসেক। গত ৫০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ এই সর্বপ্রথম এতো কম পরিমাণ পানি পেল (বাংলাবাজার পত্রিকা, ৮/৪/৯৭)। অন্যান্য পত্রিকার ভাষ্যমতে পদ্মায় পানি প্রবাহ ছিল ৯ হাজার কিউসেকেরও কম।

পানি চুক্তির যে এমনই করুণ পরিণতি হবে তা চুক্তির সঙ্গে যুক্ত আওয়ামী সরকারের কর্মকর্তাবৃন্দ বুঝতে না পারলেও এদেশের ভুক্তভোগী সচেতন মানুষ ঠিকই বুঝতে পেরেছিল। যে কারণে এ চুক্তির ব্যাপক বিরোধিতা হয়েছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার সরকার তাতে কর্ণপাত করেনি, বরং তাড়াহুড়ো করে দু'চার পাঁচ বছর নয় ৩০ বছরের পানি চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। প্রথমে স্বল্প মেয়াদী চুক্তি হবে বলে শোনা গেলেও পরে ৩০ বছরের দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি হয়েছে। চুক্তি দীর্ঘমেয়াদী হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী ও তার সরকার এবং সরকারের তল্পিবাহক বুদ্ধিজীবী ও লেখক সম্প্রদায় আনন্দে আত্মহারা হয়েছেন। কিন্তু পানি চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত জ্যোতিবসু এবং অসীম দাশগুপ্ত তাদের এই আত্মহারা অবস্থা দেখে মুচকি হেসেছেন। হেসেছেন বিজয়ের হাসি। সে হাসির মর্ম আওয়ামী সরকারের আত্মহারা ব্যক্তিবর্গ বুঝতে না পারলেও বর্তমান কোলকাতার সম্পাদক বরুন সেনগুপ্ত ঠিকই বুঝেছিলেন। বুঝেছিলেন যে, শেখ হাসিনা ও তার সরকারকে ফাঁকি দিয়ে জ্যোতিবসু ও অসীম দাসগুপ্ত ভারতের জন্যে অধিক পানি প্রবাহ নিশ্চিত করেছেন। আর নিশ্চিত করেছেন বলেই কোলকাতায় তারা স্পষ্ট করেই বলেছিলেন যে, ফারাক্কা বাঁধ হওয়ার পর থেকে ভাগীরথী-হুগলি শুখা মরসুমে যত জল পেয়েছে বর্তমান চুক্তিতে তার চেয়ে বেশি জল পাবে (বাংলাবাজার পত্রিকা, ২৬/১২/৯৬)। জ্যোতি বাবু এবং অসীম বাবুদের এই বক্তব্যের মধ্যেই লুকিয়ে আছে পানি চুক্তির মূল রহস্য। অথছ কোন দেশেরই সরকারি পর্যায়ে কিংবা বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে এ রহস্যের কথা সরাসরি স্বীকার করা হচ্ছে না। বরং কৌশল করে বলা হচ্ছে ভিন্ন কথা। সম্প্রতি ভারতীয় পানি বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশে এসে বলে গেছেন যে, গঙ্গার উৎসমুখে পানি ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এই পানি ঘাটতির

www.pathagar.com

ফারাক্কার পানি চুক্তি ও পানি প্রাপ্তি

কারণ হিসেবে বলা হয়েছে বৃষ্টিপাত কম হচ্ছে এবং হিমালয়ের বরফও গলছে না। এজন্যেই পদ্মায় পানি দেয়া যাচ্ছে না। এরূপ হাস্যকর যুক্তির কথা বংলাদেশের পক্ষ থেকেও জানা গেছে। পানি চুক্তির পর থেকে পদ্মায় পানি আসছে না পানি আসছে না বলে কিছু পত্রপত্রিকা সোচ্চার হলে তখন বলা হলো- পানি ঠিকই আসছে, তবে দীর্ঘদিন শুকনো থাকার ফলে শুকনো মাটি ও বালি পানি শুষে নিচ্ছে। ফলে পানি প্রবাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। কিন্তু এরপরেও যখন পানি আর বৃদ্ধি পেল না তখন সবাই চুপ। তবে মাঝে মধ্যেই পত্রপত্রিকায় এ বিষয়ে নানা কথা বলা হচ্ছে। কথা যেভাবেই বলা হোক না কেন পানি চুক্তিতে যে গভীর রহস্য রয়েছে তা সকলেই আজ অনুমান করতে শুরু করেছেন। অবশ্য এ বিষয়ে বর্তমান কোলকাতার পত্রিকা সম্পাদক বরুন সেনগুপ্ত বহু পূর্বেই অনুমান করেছিলেন এবং বলেছিলেন-'গঙ্গার জলভাগের এই চুক্তির পেছনে যে বেশ কিছু রহস্য

www.pathagar.com

আছে তাতে সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই রয়েছে কিছু স্বার্থ ও শক্তির খেলা' (বাংলা বাজার পত্রিকা ২৬/১২/৯৬)।

সম্পাদক বরুন সেনগুপ্তের বক্তব্যে বাংলাদেশের প্রতি ভারতের যে মনোভাব তার খানিকটা প্রকাশ পেয়েছে। এবং এতে করে বাংলাদেশের স্বার্থে নয় বরং ভারত যে ষোলআনা নিজের স্বার্থে কাজ করেছে তাও সুস্পষ্ট হয়েছে। অবশ্য ভারতের এই মনোভাব নতুন নয়। অনেক পুরনো। ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে যে সক্রিয় সহযোগিতা করেছে তাও তার নিজেরই স্বার্থে করেছে। বংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে একটি মর্যাদাসম্পন্ন স্বাধীন দেশ হিসেবে মাথা উচু করে দাঁড়াবে সেজন্যে তারা সাহায্য করেনি। সাহায্য করেছে পাকিস্তানিদের উৎপাত থেকে নিজেদের নির্বিঘ্ন করতে। সাহায্য করেছে বাংলাদেশকে তাদের অনুগত কিংবা আজ্ঞাবহ রাষ্ট্রে পরিণত করতে। কিন্তু বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাদের এই পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হতে দেননি। কারণ তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন কারো আজ্ঞাবহ হবার জন্যে নয়। তাই তিনি চেয়েছিলেন বাংলাদেশ প্রকৃতই একটি স্বাধীন অস্তিত্ব নিয়ে সামনের দিকে সসম্মানে এগিয়ে যাক। যে কারণে তৎকালে দিল্লির কর্তাব্যক্তিরা অপছন্দ করা সত্ত্বেও তিনি লাহোর ইসলামী সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। আর এরই মধ্যদিয়ে তিনি যে জাতীয়তাবাদী নীতি এবং স্বাধীন সত্তার অধিকারী ছিলেন তাও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এ কারণে ভারতের তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারক, পরারাষ্ট্র সচিব এবং গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালক মিলে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে একটি ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করেন, যা মিসেস গান্ধীকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল। ফলে তখন থেকেই ভারত বংলাদেশের স্বার্থ বিরোধী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকে। যার মধ্যে গঙ্গার পানি প্রদান বন্ধকরণ প্রক্রিয়া ছিল অন্যতম। তাছাড়া এই চুক্তির শর্তানুযায়ী বাংলাদেশ পানি না পাওয়ায় সমালোচনার পথ আরো অনেক বেশি উন্মুক্ত হয়েছে এবং একই সাথে বিষয়টি দেশবাসীকে শঙ্কিত করেছে। যা কোনভাবেই কাম্য ছিল না। এই অবস্থা দীর্ঘদিন চলতে দেয়া উচিত নয়। কারণ এতে দেশের ক্ষতি। ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষতি। ক্ষতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার দলের। সুতরাং সমালোচনার পথ বন্ধ করতে, দেশবাসীকে শঙ্কামুক্ত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এগিয়ে আসা উচিত। তার নিজের স্বার্থে, দলের স্বার্থে এবং দেশের স্বার্থেই এগিয়ে আসা উচিত। ১৪/৫/১৯৯৭।

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রীকে সতর্ক থাকতে হবে

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাবার সাথে সাথে দ্রুততর গতিতে অনেকগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য এবং বিতর্কিত সিদ্ধান্ত হচ্ছে 'জাতীয় ঐকমত্যের সরকার ' এবং অন্যটি অফিস আদালতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ছবি ঝুলানো সংক্রান্ত নির্দেশ। সম্প্রতি জাতীয় সংসদ ভবনে কেবিনেট কক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর ছবি নামানোকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অঙ্গন বেশ উত্তপ্ত হয়েছে। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মোঃ হানিফ অবিলম্বে এই ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের হোতাদের গ্রেফতার করে প্রচলিত আইনে বিচার করার দাবি জানিয়েছেন। মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বলেছেন, 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধুর ছবির অবমাননাকারীদের দাঁত ভেঙ্গে দিতে হবে। পক্ষান্তরে ৮-৭-৯৬, তারিখে একটি দৈনিকে শেখ মুজিবের ছবি টানানোর আইনগত ভিত্তি নেই, মর্মে খবর পরিবেশিত হয়েছে। বর্তমানে 'জাতীয় ঐকমত্যের সরকার' এবং বঙ্গবন্ধুর ছবিকে কেন্দ্র করে পত্রপত্রিকায় ব্যাপক বিতর্ক চলছে। আওয়ামী লীগ সমর্থকরা শেখ হানিসার সরকারকে জাতীয় ঐকমত্যের সরকার বলে জোর প্রচারণা চালাচ্ছেন। পক্ষান্তরে বিএনপিসহ অন্যান্য পক্ষ বলছে জাতীয় ঐকমত্যের সরকার নয়, এটা রব, এরশাদ এবং শেখ হাসিনার ত্রিদলীয় কোয়ালিশন সরকার। কারণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ দলের প্রতিনিধিত্ব করছেন। অনেকে আবার বলছেন, বাকশাল সৃষ্টির নতুন কৌশল। মোট কথা আওয়ামী লীগ সরকারের যাত্রা বিতর্কিত হল। যা কারো কাম্য ছিল না। কাম্য ছিল না শেখ মুজিবের ছবি নিয়েও বিতর্ক হোক। কিন্তু হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন এ বিতর্কের জন্যে দায়ী আওয়ামী সরকারের তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত। আজ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে বলেই শেখ মুজিবের ছবি ঝুলানোর নির্দেশ জারি হচ্ছে, ছবি দেয়ালে ঝুলছে। কাল বিএনপি ক্ষমতায় আসলে ছবি আবার নেমে যাবে। এটাই স্বাভাবিক। বিগত সময়েও তাই হয়েছে। এটা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। এতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সম্মান কমছে বই বাড়ছে না। বঙ্গবন্ধুকে যদি জাতির পিতার মর্যাদা দিতে হয় তাহলে দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ ও সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের প্রয়োজন। এই কথাটি আমি গত ৩-৪-৯৬ তারিখে বাংলাবাজার পত্রিকার এই পাতাতেই বলতে চেষ্টা করেছি। বলেছি, সবদল কিছু মৌলিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। বলেছি গত ২৫ বছরেও জাতি তার নেতাদের যোগ্য মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়নি। জাতির কল্যাণেই দীর্ঘদিনের বিতর্কিত এবং বিব্রতকর এই অবস্থার অবসান ঘটানো উচিত এবং তা করা উচিত সকল দলের ঐক্যের এই শুভলগ্নে এবং নির্বাচনের পূর্বেই। সে

www.pathagar.com

সময় বিষয়টি নিয়ে কোন পক্ষই চিন্তা ভাবনা করেনি। অথচ এই বিষয়টি নিয়ে ঐকমত্য সিদ্ধান্ত জরুরি ছিল।

জেনারেল এরশাদের ছবি ব্যবহারের মাধ্যমে দলীয় সভা সমিতি ও নির্বাচনে প্রচারকার্য চালানোর অর্থ হলো তিনি জাতীয় পার্টির প্রধান কিংবা জনক। পোস্টার, ব্যানারে মরহুম জিয়াউর রহমানের ছবি ব্যবহার এবং প্রচারের মাধ্যমে নির্বাচন এবং সভা সমিতি করবার অর্থ হল, জিয়াউর রহমান বিএনপির জনক। একইভাবে ব্যানার, লিফলেট এবং পোস্টারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ছবি ব্যবহারের মাধ্যমে দলীয় প্রচার প্রচারণা, নির্বাচন এবং সভা সমিতি করবার অর্থ হল, বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের দলীয় সম্পদ। আওয়ামী লীগ তাকে জাতির পিতা বলে দাবি করলেও জাতির পিতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ আওয়ামী লীগ তাকে দেশের ১২ কোটি মানুষের হৃদয় আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার পরিবর্তে স্বদলে কুক্ষিগত করে রাখার মধ্যদিয়ে ফায়দা লুটেছে। তাকে দলীয় হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। ফলে মরহুম কিংবা বিদায়ী অন্যান্য দলের রাষ্ট্রপ্রধানদের মত শেখ মুজিব একজন রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা দলীয় প্রধান কিংবা দলীয় সম্পদ ছাড়া আর কিছু নন এমন কথা বলবার সুযোগ করে দিয়েছে। জাতির পিতা কখনও কোন বিশেষ দলের তারকা হতে পারেননা। তিনি হবেন দলমত নির্বিশেষে দেশের ১২ কোটি মানুষের তারকা, যে তারকা কোন বিশেষ দলকে আলোকিত করবে না, আলোকিত করবে গোটা জাতিকে। জাতির পিতা কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের সম্পদ, গর্ব কিংবা অহংকারের বিষয় হবেন না। তিনি হবেন গোটা জাতির সম্পদ, গর্ব কিংবা অহংকার। আওয়ামী লীগ এই কাজটি করতে ব্যর্থ হয়েছে। বলা যায়, বঙ্গবন্ধুর জাতির পিতারূপে স্বীকৃতি পাবার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগই প্রধান অন্তরায়। বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতারূপে প্রতিষ্ঠা দেবারক্ষেত্রে যে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা নেবার প্রয়োজন ছিল আওয়ামী লীগ তার প্রয়োজন মনে করেনি। পক্ষান্তরে সরকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে ঐকমত্যের প্রয়োজন ছিল না আওয়ামী লীগ সেই অপ্রয়োজনীয় প্রচেষ্টায় মশগুল রয়েছে। আওয়ামী লীগ দলীয় সরকার গঠন করলেই অধিক মঙ্গলজনক হত এবং বিতর্কিত হবারও সম্ভাবনা থাকত না। অথচ জাতীয় ঐকমত্যের সরকার গঠন করতে গিয়ে আওয়ামী সরকার এখন বিতর্কিত। বিতর্কিত দলের বাইরে যেমন তেমনি দলের অভ্যন্তরেও।

বিতর্কিত শুধু সরকার গঠনের ক্ষেত্রে নয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য প্রদানের জন্যে আওয়ামী সরকার এখন বিতর্কিত। ২৩ জুন ৯৬ তারিখে বাংলাবাজার পত্রিকার সাথে এক সাক্ষাতকারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ডঃ ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন (যা বাংলাবাজার পত্রিকায় ২৪-৭-৯৬ তারিখে ছাপ হয়েছে) 'নতুন বির্বাচিত সরকারের জন্যে একটি স্থিতিশীল ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতি রেখে যেতে পারছি এটা ভেবে ভাল লাগছে। নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব শুরু করার মুহূর্তে যাতে অর্থনীতি নিয়ে দুর্ভাবনায় না থাকেন তার জন্যে আমরা চেষ্টা করেছি, সফল হয়েছি। এখন সরকার গণতন্ত্রকে শক্তিশালী ও সুসংহত করার জন্যে পূর্ণভাবে মনোযোগ দিতে

www.pathagar.com

পারবেনা'। অর্থ উপদেষ্টা উল্লিখিত বক্তব্যে এটা স্পষ্ট যে, অর্থ নিয়ে নতুন সরকারের বিচলিত হবার কোন কারণ নেই। অথচ নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন জনসভাসহ সর্বত্র সর্বক্ষণই বলে বেড়াচ্ছেন বিএনপি সরকার সব কিছু লুটপাট করে খেয়ে ফেলেছে। সম্পূর্ণ দেউলিয়া অর্থনীতি নিয়ে শূন্য হাতে যাত্রা শুরু করেছি। বলছেন, আমার হাতে আলাদিনের চেরাগ নেই। আমি সময় চাই। প্রধানমন্ত্রীর এ ধরনের বক্তব্যের কারণে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্তিতে ভুগছে। তারা জানতে চাইছে কে সঠিক বলছেন। অর্থ উপদেষ্টা, নাকি প্রধানমন্ত্রী? অর্থ উপদেষ্টার বক্তব্য যদি সঠিক হয় তাহলে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন! কিংবা প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যই যদি সত্যি হয় তাহেল অর্থ উপদেষ্টা অসত্য তথ্য দিয়েছেন। এই পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের একটি স্বচ্ছ চিত্রের প্রয়োজন। বিষয়টি উল্লেখ করালাম এ জন্যে যে, প্রধানমন্ত্রী সকল বিষয়ে স্বচ্ছতার প্রতি জোর দিয়েছেন এবং বলেছেন-'আমার যদি কোন ভুল-ত্রুটি হয় সরাসরি আমাকে জানান। অমি তা সাথে সাথে শোধরাবার সবরকম চেষ্টা করব। এ ওয়াদাই আমি দিয়ে গেলাম'।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমাজ ও রাষ্ট্র উন্নয়নের লক্ষ্যে এ যাবত যতগুলো বক্তব্য দিয়েছেন তার সিংহভাগ বক্তব্যেই আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছে। বক্তব্যগুলোতে আন্তরিকতার ছাপ যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে নতুনত্বের আভাস। এই আন্তরিকতাপূর্ণ বক্তব্যের জন্যে প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাই এবং সেই সাথে এ বিষয়ে বিনীত অনুরোধ রাখতে চাই, আর তা হচ্ছে-বক্তব্য কিংবা আদেশ নির্দেশ দিলেই চলবে না ব্যক্তিগতভাবে খোঁজ রাখতে হবে আদেশ নির্দেশগুলো যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কি না। কারণ ইতোমধ্যেই এ বিষয়ে পত্রপত্রিকায় বক্তব্য আসতে শুরু করেছে। বলা হচ্ছে-প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সাথে বাস্তবতার কোন মিল নেই। কথার সাথে কোন সামঞ্জস্যতা নেই। কথাগুলো বলা হচ্ছে সচিত্র প্রতিবেদনের সাহায্যে। উদাহরণ সহযোগে। সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ ও বরিশালের একটি দৈনিকের অফিসসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে যে সকল হামলা, ভাংচুর ও সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটছে তার কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না কেন, সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে না কেন, এ সকল প্রশ্নের জবাব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এড়িয়ে যাচ্ছেন বলে পত্রিকায় খবর আসছে। অথচ সন্ত্রাস নির্মূলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ওয়াদাবদ্ধ। প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা গ্রহণের পর হতে দেশের সর্বত্র ক্রমবর্ধমান হারে যেভাবে সন্ত্রাস বেড়ে চলেছে তাতে নবগঠিত সরকারের সন্ত্রাস নির্মূলের ওয়াদা ভেস্তে যেতে চলেছে। এক দিনের দুটি পত্রিকার খবর হচ্ছে-১. ছাত্রলীগ-ছাত্রদলের সন্ত্রাস- ঢাকা মেডিক্যাল বন্ধ ঘোষণা, ২. ছাত্রী উত্যক্ত করার জের- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উত্তেজনা, ৩. স্বামীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গৃহবধূকে ধর্ষণ, ৪. সন্ত্রাসীদের হাত থেকে পরীক্ষার্থীরাও রেহাই পায়নি, ৫. চট্টগ্রাম মার্কেটে ডাকাতি-সরকারি দলের চাপে পুলিশ দিশেহারা ৬. স্বামীর হাতে স্ত্রী ও প্রেমিক খুন, ৭. কুমিল্লায় সন্ত্রাসী হামলায় জিয়া সংসদের নেতা হারুন নিহত, ৮. নরসিংদীতে বিক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীদের হামলাঃ ভাংচুর, ৫০ জন আহত, ৯. ১ নম্বর আসামী প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে- পুলিশ গ্রেফতার করছে না, ১০. বিশেষ মহলের চাপ- থানায় ছিনতাই মামলা

www.pathagar.com

নিতে অপারগতা প্রকাশ, ১১. প্রতারকের খপ্পরে যুবক- ৯ হাজার টাকা ছিনতাই, ১২. চালক প্রহারের জের- নারায়ণগঞ্জ থেকে ডেমরা নরসিংদী ও দাউদকান্দি রুটে বাস চলাচল বন্ধ, ১৩. হবিগঞ্জে ৩ জনের মৃত্যু, ১৪. বড়লেখায় সন্ত্রাসী ঘটনা দেশবাসীকে উদ্বিগ্ন না করে পারে না। এ সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে যেমন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ জড়িত তেমনি জড়িত অরাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ। সরকারী দলের কর্মী-সমর্থক যেমন জড়িত আছে তেমনি আছে বিরোধী দলের সমর্থকও। অথচ ৭ জুলাই '৯৬ তারিখে জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকদের সাথে আলোচনাকালে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন-'ষড়যন্ত্র চলছে। সুগভীর ষড়যন্ত্র। নয়া সরকারকে হেয় করবার জন্যে, ব্যর্থ করবার জন্যে'। প্রধানমন্ত্রীরতো ভুলে যাবার কথা নয় যে, সব সরকারই ক্ষমতায় এসে এই একই অভিযোগ করে থাকে। জনগণ ক্ষমতাসীন সরকারের এটা একটি রুটিন বক্তব্য বলে জানে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন তিনিও একই কথা বলেছেন। বলেছেন দেশের উন্নয়নকে বিঘ্নিত করার জন্যে দেশকে ধ্বংস করার জন্যে, বিএনপি সরকারকে হেয় করার জন্যে বিরোধী দলগুলো গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। সতরাং নয়া প্রধানমন্ত্রীর এ জাতীয় বক্তব্য জনমনে বিশেষ কোন অভিব্যক্তির জন্ম দেবে বলে মনে হয় না। আর তাছাড়া বাঙালি ষড়যন্ত্রকারী জাতি হিসেবে পূর্ব থেকেই পরিচিত। বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার নির্মম পরাজয় ও তাকে হত্যা করার ঘটনাই এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। সুতরাং ষড়যন্ত্র, সন্ত্রাস, অশান্তি থাকবেই। এ সকল সন্ত্রাস ও সমস্যাকে জয় করে দরিদ্র ও দুঃখী দেশকে সোনার বাংলায় পরিণত কারার জন্যেইতো প্রধানমন্ত্রীর আগমন। সেই আশ্বাস দিয়েইতো প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতারোহণ। সুতরাং ষড়যন্ত্র যদি কিছু থেকেই থাকে তাকে ভয় পেলেতো চলবে না। তাকে জয় করতে হবে। আর সমস্ত ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাস বিরোধী দলের মধ্যে খুঁজলে চলবেনা। নিজ দলের প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। শুধু তাই নয়, বিরোধী দলের চেয়ে নিজ দলের সন্ত্রাসীদের প্রতি, শান্তিভঙ্গকারীদের প্রতি কঠোরতর হতে হবে। তবেই না অন্য দলের সন্ত্রাসীদের প্রতি কঠোর হওয়া যৌক্তিক ও সমর্থনযোগ্য হবে। ষড়যন্ত্রকারী কিংবা সন্ত্রাসী যে ক্ষমতাসীন দলেও রয়েছে সে কথাতো একই সাক্ষাতকারে প্রধানমন্ত্রী অকপটে স্বীকার করেছেন। পত্রিকায় প্রধানমন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে 'তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেছেন- পুলিশ তার দলের লোকদেরকেও আটক করছে। তার কাছে তদবির এসেছিল এই গ্রেফতার বন্ধ করার জন্যে। তিনি তাদের বলেছেন, অপরাধ করলে সাজা ভোগ করতেই হবে'। এছাড়া একটি দৈনিক পত্রিকা অফিসে হামলা ভাংচুরের অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ায় সম্প্রতি ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারি দলের পক্ষ থেকেও যে ব্যাপক সন্ত্রাস সর্বত্রই হচ্ছে এসব ঘটনা এবং পূর্বে উল্লিখিত তথ্যসমূহ তারই প্রমাণ বহন করছে। সুতরাং দলমত নির্বিশেষে সকল দলের সন্ত্রাস সম্পর্কেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সজাগ থাকতে হবে। সজাগ থাকতে হবে আমলা ও পুলিশবাহিনী সম্পর্কেও। কারণ তারা কী করতে পারেন আর পারেন না তা আজীবন ক্ষমতায় থাকলেও

www.pathagar.com

কারো পক্ষে সম্পূর্ণ বুঝে ওঠা সম্ভব বলে মনে হয় না। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে বলতে শুনেছি 'আমলাদের সব কর্মকাণ্ডের জন্যে সরকারের দুর্নাম হয়।' আর পুলিশ! পুলিশের কর্মকাণ্ডের কথাতো প্রায় প্রতিদিনই পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। এই প্রবন্ধ যখন লিখছি তখন এক ফাঁকে পত্রিকায় চোখ বুলাতে গিয়ে দেখলাম, বাংলাবাজার পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠায় শেষ কলামে লেখা হয়েছে 'পুলিশ কর্তৃক আটককৃত মোটর সাইকেলের মালিক আসহাব মিয়া প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখানো সত্ত্বেও ৫০ হাজার টাকা উৎকোচ না দিলে তাকে নারীঘটিত কেলেংকারিতে জড়িয়ে মামলা ঠুকে দেবার ভয় দেখানো হয়েছে'। দিনাজপুরের ইয়াসমিন হত্যার সাথে জড়িত পুলিশ কর্তৃক ইয়াসমিনকে পতিতা সাজাবার নাটকের মহড়ার কথা আজও দেশবাসী ভোলেনি। সম্পাদকদের সাথে সাক্ষাতকার কালে একজন সম্পাদক প্রধানমন্ত্রীকে তো বলেছেন আমার কাছে প্রমাণ আছে আপনার দলের একজন এমপি থানায় ফোন করে বলেছেন মামলা সাজিয়ে বিরোধী দলীয় কর্মীদের গ্রেফতার করতে হবে। সুতরাং রাজনৈতিক কারণে দলের লোকজনদের গ্রেফতার ও হয়রানি করা হচ্ছে বলে বিরোধী দলগুলোর পক্ষ থেকে যে দাবি উত্থাপন করা হচ্ছে তাকে একেবারে অকারণ কিংবা অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দেয়া ঠিক হবে না। আগামী ২০ জুলাই সর্বদলীয় সম্মেলনে সিদ্ধান্তের পর সন্ত্রাস দমনের যে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে তারই প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে একটি বিনীত অনুরোধ, নিরীহ জনগণ যাতে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে লাঞ্ছিত কিংবা নিগৃহীত না হন সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। প্রধানমন্ত্রী আপনাকে এ বিষয়ে আরও অধিক সতর্ক দৃষ্টি রাখতে অনুরোধ জানাই, কারণ এ দেশের পুলিশ এবং সংশ্লিষ্ট মহলের মধ্যে কাউকে ডেকে আনতে বললে বেঁধে আনবার এবং প্রকৃত সন্ত্রাসীর পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রে নিরীহদের ধরে আনবার প্রবণতা প্রবল ভাবে উপস্থিত। ১৭-৭-১৯৯৬।

www.pathagar.com

সব দল কিছু মৌলিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে

রাজনৈতিক অবস্থা এখন একটি স্বস্তিকর পর্যায়ে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়েছে। জয় পরাজয় নিয়ে কিছু রেষারেষি থাকলেও পরিস্থিতি মন্দ নয়। জাতীয় কিছু মৌলিক সমস্যা সম্পর্কে এখন জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হতে পারে। এ সিদ্ধান্ত অবশ্যই মেধার ভিত্তিতে হতে হবে। যাতে সর্বজন গ্রাহ্য হয়। সুতরাং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সকলকে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হবে।

মেধার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ধীশক্তি, বোধশক্তি, স্মরণশক্তি, স্মৃতিশক্তি প্রভৃতি। লক্ষ্যণীয় যে, চারটি শব্দের সঙ্গেই 'শক্তি' ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এইটি এমন এক শক্তি যার তেজস্বীতায় একজন মানুষ বিগত বিষয়াদির, অতীত স্মৃতির কিংবা অতীত বিষয় বা ঘটনাবলীর অলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করে থাকেন। অতীতের কোন ভুলভ্রান্তি কিংবা অশান্তির পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সে বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তও নিয়ে থকেন। বিষয়টি সহজ মনে হলেও এই সহজ কাজটি করা অনেকের পক্ষেই সহজ হয় না। কিন্তু সর্বোচ্চ মেধার অধিকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং বুদ্ধিজীবী সমাজের পক্ষে এইটি তেমন কোন কঠিন কাজ নয়। কারণ তারা জাতির বিবেক। বিপদের দিনে জাতিকে, সমাজকে, সমাজের মানুষকে দিকদর্শন দেয়াই তাদের কাজ। এই কাজই তাদের ধর্ম। এই ধর্ম থেকে যারা বিচ্যুত হন তারা আর যাই হোক না কেন তারা প্রকৃত মেধার অধিকারী কিংবা বুদ্ধিজীবী নন। জাতির পরম দুর্ভাগ্য যে, এই ধর্মচ্যুত বুদ্ধিজীবীর সংখ্যাই দেশে সর্বাধিক। যারা সুবিধাভোগের লালসায় বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করেন। ফলে সর্বস্তরের নাগরিকদের দ্বারা তারা সমালোচিত হন। নিন্দিত হন। নিন্দিত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দও। কারণ দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা বিশ্ববিদ্যালয়েরই শিক্ষক। তারা নিন্দিত হন কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদা, নীল, গোলাপী বর্ণের আড়ালে তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষে নির্লজ্জ ভূমিকা পালন এবং দলীয় ভিত্তিতে ছাত্রদেরকেও ব্যবহার করেন সেজন্যে। এ কারণে তারা 'ক্যাডার বুদ্ধিজীবী এবং কর্দমাক্ত বুদ্ধিজীবী' হিসেবে চিহ্নিত হন (বাংলাবাজার পত্রিকা, ২০/৩/৯৬)। উচ্চারিত এ সমস্ত অভিযোগ শুধু যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেরই তা নয়। এ অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনের ভেতরেরও। ১৯৮৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের

www.pathagar.com

শহীদ অধ্যাপক ডঃ শামসুজ্জোহা স্বরণে আয়োজিত সভায় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন উপাচার্যের পঠিত প্রবন্ধেও উচ্চারিত হয়েছে এই সমস্ত অভিযোগ। কিন্তু প্রকৃত অর্থে এ সকল অভিযোগ সকল শিক্ষকের ক্ষেত্রে যে আদৌ প্রযোজ্য নয় সেকথা আমি গত ২৮/১২/৯৫ তারিখের বাংলাবাজার পত্রিকার এই পাতাতেই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছি। উল্লেখ করেছি যে, শিক্ষকদের বিভিন্ন দলের যে বর্ণ-সাদা, নীল, গোলাপী কিংবা সবুজ তা একান্তই দল বিভাজন বা গ্রুপ চিহ্নিতকরণ চিহ্ন মাত্র। এই বর্ণ কিংবা চিহ্ন কোন রাজনৈতিক দিকনির্দেশক নয়। এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, বর্ণ যদি রাজনৈতিক দিকনির্দেশকই না হবে তাহলে বর্ণভুক্ত শিক্ষকরা বিশেষ বিশেষ দলের পক্ষে রাজনীতি করেন কিভাবে? এ বিষয়ে ঐ একই প্রবন্ধে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে যার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন মনে করছি না। তবে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান হারে যে সমালোচনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা যে একেবারেই উদ্দেশ্যমূলক কিংবা অর্থহীন তা মনে করবার কোন কারণ নেই। কারণ কোন কোন শিক্ষকের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ রয়েছে, যা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মাঝে সংক্রামিত হচ্ছে কিনা এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজনৈতিক অঙ্গনে পরিণত করা হচ্ছে কিনা তা তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। কারণ যারা জাতির বিবেক তাদের নিকট জাতি অবশ্যই শিক্ষকসুলভ আচরণ, বুদ্ধিদীপ্ত, নিরপেক্ষ ও গঠনমূলক ভূমিকা প্রত্যাশা করে। বিশেষ করে দেশের বর্তমান অভাবনীয় মারাত্মক সঙ্কটকালে জাতির এ প্রত্যাশা আরও অনেক গুণ বেশি। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনগুলোতে যেভাবে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার লাভ করছে এবং অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সচিবসহ অন্যান্য সরকারি কর্মচারী, আইনজীবীসহ অন্য কর্মকর্তাবৃন্দ যেভাবে রাজনীতি চর্চা কিংবা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে সরাসরি সমর্থন করছেন এবং রাস্তায় নেমে শ্লোগানসহ মিছিল করছেন তাতে শঙ্কিত হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। পেশাজীবী সংগঠনগুলোর এই সমস্ত অরাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের রাজনৈতিক ভূমিকা জাতীয় জীবনে গোদের উপর বিষফোঁড়ার অবস্থা সৃষ্টি করেছে। এদের অনাকাঙ্খিত রাজনৈতিক রেষারেষির কারণে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান রণাঙ্গনে পরিণত হয়েছে। ফলে জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলো ক্রমান্বয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। অসুস্থ হয়ে পড়ছে গোটা জাতি। আজীবন রাজনীতি চর্চাকারী এবং রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত সদস্য কিংবা রাজনীতিবিদদের তুলনায় রাজনৈতিক দলগুলোতে পেশাজীবী পতিষ্ঠানের নেতা কিংবা প্রধান হবার কারণে অনেকেই অধিক প্রাধান্য পেয়ে থাকেন। শুধু তাই নয় কখনও কখনও তারা মন্ত্রিত্বও লাভ করেন। ফলে রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে অসন্তোষ দানা বাঁধে এবং দল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পক্ষান্তরে মন্ত্রিত্ব লাভ কিংবা রাজনৈতিক দলগুলোর আশীর্বাদ লাভের অদম্য আকাঙ্ক্ষায় তাড়িত হয়ে পেশাজীবীদের অনেকেই অসুস্থ প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেন, যা জাতীয় উন্নয়ন ও শৃঙ্খলার জন্যে মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। এই পরিস্থিতি থেকে জাতিকে মুক্ত করা জরুরি। জাতীয় জীবনে উন্নয়ন ঘটাতে কিংবা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে রাজনীতির সঙ্গে না জড়িয়ে পেশাজীবীদেরকে স্বাধীনভাবে কাজ করবার সুযোগ দিতে হবে এবং একই সাথে

www.pathagar.com

জাতির অমীমাংসিত সমস্যাগুলোরও স্থায়ী সামাধান করতে হবে। জাতীয় জীবনে অগণিত অমীমাংসিত সমস্যা রেখে কেবল নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্বাচন দিয়ে দেশের এবং দেশের বার কোটি মানুষের কল্যাণ করা যাবে না। সুতরাং সকল রাজনৈতিক দল মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে অমীমাংসিত সমস্যাগুলোর স্থায়ী সমাধান করতে হবে। যে যেভাবেই ব্যাখ্যা দিক না কেন জাতীয় জীবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান এই দুই মহান নেতার রাজনৈতিক অবদানকে কোনভাবেই খাটো করে দেখা যায় না। জিয়াউর রহমান স্বধীনতা যুদ্ধের ডাক কিংবা ঘোষণা বঙ্গবন্ধুর পক্ষে দিয়েছিলেন, না কি একা নিজের উদ্যোগেই দিয়েছিলেন এ বিষয়ে বহুল বিতর্ক সত্ত্বেও একথা সকলেই বুঝেন যে, যে কোন সময় যে কেউ হুটকরে স্বাধীনতার ডাক কিংবা ঘোষণা দিলেই কোন জাতি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না। এর জন্যে পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। যে প্রস্তুতির পর্বটি বঙ্গবন্ধু সার্থকতার সাথেই সম্পন্ন করে রেখেছিলেন। গোটা জাতিকে যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে প্রস্তুত করেই রেখেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, একাত্তরে পাক হনাদার বহিনীর বর্বর আক্রমণে জাতি হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিল। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ায় জাতি নেতৃত্বহীন এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। সুতরাং সমগ্র জাতির ঠিক সেই মুহূর্তে জিয়ার যুদ্ধের ডাক কিংবা ঘোষণা জাতিকে অসীম সাহসে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে যে উদ্বুদ্ধ করেছিল সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা হাজার বছরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি, আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর নেতা নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস-এর কথা জানি। যিনি ভারতকে স্বাধীন করার ডাক দিয়ে নিজেও যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এবং জাতির পিতা না হয়েও বিশাল জাতীয় সম্মানের অধিকারী হয়েছেন। অথচ বাঙালি জাতির কি দুর্ভাগ্য বিগত ২৫ বছরেও জাতি তার নেতাদের যোগ্য মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়নি। জাতির কল্যাণেই দীর্ঘদিনের বিতর্কিত এবং বিব্রতকর এই অবস্থার অবসান ঘটানো উচিত।

উচিত একাত্তরের পাক হানাদার বাহিনীর সমর্থক শক্তি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল জামায়াতের নেতা গোলাম আযম এবং অন্য নেতা-কর্মীদের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচারের আদৌ কোন বৈধতা কিংবা যৌক্তিকতা আছে কিনা তারও সিদ্ধান্ত নেয়া। যদি থাকে তাহলে সে বিষয়ে সকলকে সর্বসম্মত সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত দিতে হবে। আর যদি না থাকে তাহলে রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াত যখন প্রতিষ্ঠিত, স্বীকৃত এবং সকল রাজনৈতিক দলের নিকট সমাদ্রিত তখন জুজুর ভয় দেখিয়ে লাভ কি ? তাতে বরং দেশের ক্ষতি। কারণ সকল দলের সম্মানজনক সহাবস্থান এবং রাষ্ট্রীয় কল্যাণে সমভাবে অংশগ্রহণ ছাড়া কোনভাবেই রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন এবং রাষ্ট্রে শান্তি স্থাপন করা সম্ভব নয়।

শান্তি এবং রাষ্ট্রীয় কল্যাণে প্রকৃত জবাদিহিমূলক জনকল্যাণকামী সরকার কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় সে বিষয়েও সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের প্রয়োজন। যাতে সরকারের সম্মানিত কোন সদস্যের পক্ষে জনকল্যাণ বিরোধী অসৎ কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ সম্ভব না হয়। যাতে কেউ কারও বিরুদ্ধে অসম্মানজনক উক্তি করবার, কোন অসৎ ও অন্যায় কাজের জন্যে

www.pathagar.com

অভিযুক্ত করবার সুযোগ না পায়। একই সাথে নিশ্চিত করতে হবে আইনের শাসন, যাতে ধনী-গরিব সমভাবে তার সুফল ভোগ করতে পারে । গরিব এবং সাধারণ মানুষ চির অবহেলিত এবং সর্ববিষয়ে বঞ্চিত। তাদের পক্ষে কথা বলবার, তাদের পক্ষাবলম্বন করবার মানুষের বড়ই অভাব। এককালে যারা তাদের জন্যে সদাসর্বদাই কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করতেন তারা আজ অসৎ বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়াদের পক্ষাবলম্বন করে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত। সুতরাং বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষদের জন্যে ভাত-কাপড়ের সাথে সথে চিকিৎসার বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া কালো টাকার অসৎ মানুষদের নিরুৎসাহিত করে নির্বাচনে কঠোর বিধি-বিধানের মাধ্যমে সংসদে প্রকৃত দেশপ্রেমী সৎ মানুষের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। ঘুষ ও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তি বিধান নিশ্চিত করবার মধ্য দিয়ে ঘুষ ও দুর্নীতির অবসান ঘটাবার প্রক্রিয়া নির্ধারণ করতে হবে। এমনি হাজারো সমস্যার প্রকৃত সমাধানের পথ ও পদ্ধতি নির্ধারণের মাধ্যমে প্রকৃত জনকল্যাণকামী সরকার প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করতে হবে এবং তা করতে হবে সকল দলের ঐক্যের এই শুভলগ্নে এবং নির্বাচনের পূর্বেই।

সকলেই যখন রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রের মানুষের সুখ-শান্তি এবং কল্যাণ কামনা করেন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্বাচনের মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তখন উল্লিখিত সমস্যাবলীর অবশ্যই সমাধান করতে হবে। অন্যথায় অগণিত মানুষের আত্মত্যাগে অর্জিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং সেই সরকারের নির্বাচন জাতির জন্যে পরিহাস ছাড়া আর কিছুই হবে না। মনে রাখতে হবে একানব্বুই এবং ছিয়ানব্বুই যেমন এক নয় তেমনি একানব্বুই এবং ছিয়ানব্বুইয়ের নির্বাচনও এক হবে না। একানব্বুইতে বৃহৎ দুটি দলই নিজ নিজ বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল বলেই নির্বাচন নির্বিঘ্ন হয়েছে। কিন্তু ছিয়ানব্বুইয়ের অবস্থা তা নয়। একানব্বুই এবং ছিয়ানব্বুইয়ের অভিজ্ঞতা নির্বাচনী ফলাফল নিজের দলের পক্ষে আনতে দলীয় কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করবেই। সকলের আন্তরিক ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় এই প্রয়াসকে প্রতিহত করতে না পারলে সকলের আত্মত্যাগ, আকাঙ্ক্ষা এবং বিগত বছরগুলোর যাবতীয় মহৎ কাজ অকাজে পরিণত হবে। মহৎ উদ্দেশ্যে নিয়োগকৃত সকল শক্তির হবে অপচয়। সুতরাং মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছিলেন সেই কথারই প্রতিধ্বনি করে বলি-মন যখন কোনমতে জেগেছে, তখন সেই শুভ অবকাশে মনটাকে কষে কাজে লাগিয়ে দাও, অকাজে লাগিয়ে শক্তির অপব্যয় করো না। ৩-৪-১৯৯৬।

www.pathagar.com

স্বৈরতন্ত্র নয় গণতন্ত্রেই মুক্তি

যা হবার কথা নয় ঠিক তাই হয়। অতীতেও হয়েছে বর্তমানেও হচ্ছে, হয়তো ভবিষ্যতেও হবে। বাংলা ইংরেজদের করায়ত্ত হবার কথা ছিল না, কিন্তু হয়েছে। সিরাজউদ্দৌলার পরাজিত হাবার কথা ছিল না, কিন্তু তিনি পরাজিত হয়েছেন। হয়েছেন তারই একান্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তিবর্গের কারণে। ভারত বিভাগের কথা ছিলনা তাও হয়েছে। বিভক্ত হয়ে দুই পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে। উভয় পাকিস্তানের ঐক্য বিনষ্টের কথা ছিল না, কিন্তু পশ্চিমের স্বার্থান্বেষী মহল ও হানাদার বাহিনীর জন্যে ঐক্য বিনষ্টের মধ্যদিয়ে পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ হয়েছে। স্বাধীন সোনার বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের যে করুণ পরিণতি হয়েছে তাও হবার কোন কথা ছিল না, কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে তাও হয়েছে। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা সোনার বাংলার মরুভূমিতে পরিণত হবার কথা নয়, কিন্তু আজ তাও হতে চলেছে। তত্তাবধায়ক সরকারের দাবিতে দেশে যে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে চলেছে তাও ঘটবার কথা নয়, কিন্তু ঘটছে। এবং আন্দোলনরত ত্রিদলীয় সাংসদগণ শেষ পর্যন্ত যে পদত্যাগ করলেন, এমন বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটবার বিষয়টি স্বাভাবিক ছিল কি? ছিল না। কিন্তু দুঃখজনক হলেও অবিশ্বাসষ্যভাবেই শেষ পর্যন্ত ঘটনাটি ঘটেছে। গণতন্ত্র ধ্বংসের অপরাধে জেনারেল এরশাদকে যে জনগণ ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং স্বৈরাচার অপবাদে যখন প্রত্যাখ্যাত তিনি, তখন সেই জনগণই এখন স্বৈরাচারকেই চাইছে। আর একারণেই কে এম সোবহান সাহেব বলছেন 'সাধারণ মানুষ এখন বলছে যে, বর্তমান সরকারের চেয়ে জেঃ এরশাদের সরকারই ভাল ছিল' (বাংলাবাজার পত্রিকা ১৮/১২/৯৮)। ফলে তার মত অনেকেই বলছেন এমনতো হবার কথা ছিল না। কেন এমন হয়? এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া বোধ করি খুব সহজ নয়। কারণ যে উত্তর এর জন্য তৈরি করা যাবে এক পক্ষ তা মানতে চাইলেও মানবে না অন্য পক্ষ। তারা হয়তো প্রস্তুত করবেন ভিন্ন উত্তর। ফলে সংঘাত অনিবার্য হবে। স্বাধীনতার তেইশ বছর অতিক্রান্ত প্রায়,কিন্তু আজও কি এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব হবে মুক্তিযোদ্ধাদের কত অংশ প্রকৃত আর কত অংশ ভুয়া? সম্ভব নয়। আর সম্ভব নয় বলেই বিতর্ক আজও আব্যাহত আছে। জামায়াত, রাজাকার, আলবদর, আলশামসদের স্বাধীনতা বিরোধী ভূমিকার তুখোড় সমালোচনাকারী, মাঠে ময়দানে মঞ্চে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি বলে উচ্চ কণ্ঠে পরিচয় দানকারী বর্তমানের অনেক নেতৃস্থানীয় শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীও প্রকৃত অর্থে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বা স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি কিনা, অথবা এদের কতজন পক্ষের কতজন বিপক্ষের তারও

www.pathagar.com

হিসেব দেওয়া সহজ নয়। কারণ এঁদের সাতান্নজন একাত্তরের মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তির পক্ষে ওকালতি করে বিবৃতি দিয়েছিলেন। হয়তো বলবেন, হয়তো কেন নিশ্চিতভাবেই বলবেন যে, বিপদে পড়ে সেই সময় ঐ বিবৃতি দিতে হয়েছিল। ইচ্ছাকৃতছিলনা ঐ বিবৃতি। আর এই যুক্তির প্রেক্ষিতে যদি বিশ্বাস করতে হয় যে তারা প্রকৃত অর্থেই স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন, তাহলে একই যুক্তি প্রদান করলে জামায়াত, শিবির, রাজাকার, আলবদর, আল শামসদেরকেও কি স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি বুঝতে হবে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও কি খুব সহজ? সহজ হলেও বোধ করি ততটা সহজ নয়। যতটা সহজ মনে করা হয়। কারণ অনেক রাজাকার রাজাকার হয়েও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষেই কাজ করেছে। নানাভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছে। এর পক্ষে স্বাক্ষ্য প্রমাণ দানকারী মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই এখনও জীবিত আছেন। কিন্তু এমন রাজাকারের সংখ্যা কত তারও কোন হিসেব নেই। বাংলার অগণিত বাঙালির হত্যাকারী, মানসম্ভ্র লুণ্ঠনকারী, বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকারী প্রকৃত স্বাধীনতা বিরোধী যারা তাদেরও সঠিক কোন হিসেব নেই। তাদের চিহ্নিত না করেই, তাদের অপরাধের মাত্রা নিরূপণ ছাড়াই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে। এমনও তো হবার কতা ছিল না। নিয়তির কি নির্মম পরিহাস, বাস্তবে তাই হয়েছে। আর এরই মধ্যদিয়ে স্বাধীনতার পক্ষ বিপক্ষ মিলেমিশে একাকার হয়েছে। ভুয়াদের দাপটে প্রকৃতরা চুপসে গেছে এবং দেশ ভরে গছে চোরে। যে কারণে শেখ মুজিবকে বেদনার্ত হৃদয়ে বলতে হয়েছে 'লোকে পায় সোনার খানি, আমি পেয়েছি চোরের খনি'(বাংলাবাজার পত্রিকা ১৮/১২-১৯৯৪।

অপবাদ, দুর্নাম, আর দুর্গতি বাঙালি জাতির চিরসাথী। এ থেকে যেনো বাঙালি জাতির মুক্তি নেই। অদূর ভবিষ্যতেও যে এই রাহুর দশা থেকে মুক্তির কোন সম্ভাবনা আছে তারও কোন অভিজ্ঞান সম্মুখে নেই। সর্বত্রই হতাশার চিত্র। সুস্থ, সুন্দর ও স্বাভাবিক চিত্র যারা গোড়বেন তারা কঠিন রোগে রোগগ্রস্ত আজ। যে রোগের চিকিৎসায় দেশীতো বটেই এমনকি 'এমেকা' 'নিনিয়ান'- দের মত বিদেশী ডাক সাইটে চিকিৎসকরাও ব্যর্থ হয়েছেন। ব্যর্থতার এই মুহূর্তে রাস্তার অসৎ ঝাড় ফুঁকের ওঝা এবং ভেজাল ওষুধের কারবারী টোটকা চিকিৎসকদের কেউ কেউ এই রোগ চিকিৎসার ইচ্ছা প্রকাশ করে তাদের সাথে রুগীদের বসবার আহবান জানিয়েছেন। দুঃসাহস আর স্পর্ধারও তো সীমা থাকে। বাংলাদেশে তারও কোন বালাই নেই, যার যা বলবার নয় তিনি তা বলছেন। যার যা করবার নয় তিনি তাই করছেন। এ এক দুঃসহ যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অস্থিরতাকে কেন্দ্র করে। যে অস্থিতা, যে অসুস্থতা ভয়ংকর মহামারী প্লেগের মতই রাষ্ট্রের সর্বত্রই বিস্তৃত হয়ে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন অংশকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। যেমন ধ্বংস করছে জাতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ শিক্ষা ব্যবস্থাকে। ধ্বংস করে দিচ্ছে পবিত্র শিক্ষাঙ্গনসমূহকে। ধ্বংস করে দিচ্ছে জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার ছাত্র সমাজকে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্বার্থে ব্যবহার করতে গিয়ে পুরো ছাত্রসমাজের ললাটে কালিমা লেপন করছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল পরস্পরের ছাত্র সংগঠনের

www.pathagar.com

সদস্যদেরকে সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, মস্তান, ছিনতাইকারী, খুনী বলে আখ্যায়িত করে প্রকারান্তরে সকল ছাত্র সমাজকে জাতির সবচাইতে কলংকজনক অংশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। 'ছাত্র' শব্দটি এখন আর গৌরবজনক বা সম্মানজনক কোন নিগূঢ় অর্থ কিংবা পরম তত্ত্ব প্রকাশ করে না । শব্দটি এখন বিভীষিকা, সংশয়, আর সন্ত্রাসের প্রতিরূপ রূপে প্রতিষ্ঠিত। রাজনৈতিক নেতা নেত্রীদের হঠকারিতা আর তাদেরই সৃষ্ট ছাত্র নামধারী কতিপয় মস্তান ও সন্ত্রাসীদের কারণে গোটা ছাত্র সমাজের আজ এই পরিণতি। নেতা-নেত্রীদের আশীর্বাদপুষ্ট এই সমস্ত মস্তান ও সন্ত্রাসীদের হাতে শিক্ষা, ব্যবসা, গৃহনির্মাণ, টেণ্ডার অফিস, আদালত, চাকুরীসহ সমগ্র দেশের সুখ শান্তি ও আইন শৃংখলা যখন সম্পূর্ণরূপে জিম্মী হয়ে পড়ছে ঠিক সেই মুহূর্তে প্রধান দুই নেত্রীর ছাত্র সংগঠনের বিশাল বিশাল সমাবেশের ভাষণ সমগ্র জাতিকে আতংকগ্রস্ত করেছে। এরই মধ্যে অনেকেই স্ব স্ব দলের পক্ষে সুবিধামত মত প্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন 'যারা ধ্বংসের রাজনীতি করে, অবরোধ করে, হরতাল করে, ঘেরাও করে, তাদের মোকাবেলার জন্য আমার ছাত্র দলই যথেষ্ট ', প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার এই উক্তি মূলতঃ বিরোধী দলের প্রতি ছাত্র লেলিয়ে দেবার উস্কানি বলে অনেকে মনে করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর শাহাদাত আলী এবং সাধারণ সম্পাদক ডঃ অরেফিন সিদ্দিক বিস্ময় ও উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতিতে বলেছেন 'একজন ক্ষমতাসীন সরকার প্রধানের প্রকাশ্যে এই ধরনের উক্তি শুধু চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয়ই নয় বরং দেশকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দেওয়ার স্পষ্ট ইঙ্গিত। আমরা মেধাবী তরুণদের মস্তানে রূপান্তর করে তাদেরকে ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থে ব্যবহারের চলতি প্রক্রিয়া চিরতরে রোধকল্পে দৃঢ় জাতীয় ঐকমত্য গড়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহবান জানই' (দৈনিক ইত্তেফাক ১/১২/৯৪)। এই বিবৃতিকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২২ জন শিক্ষক প্রতিবাদ স্বরূপ একটি বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিতে বলেন 'প্রধানমন্ত্রীর একটি বিবৃতিকে কেন্দ্র করে শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক শিক্ষকদের মতামত যাচাই না করিয়াই বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। এতে সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিকে ব্যবহার করার এক দুঃখজনক উদাহরণ তৈরি হইয়াছে। ফলে দেশবাসীর চোখে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজের নিরপেক্ষ ও দায়িত্বশীল ভাবমূর্তি প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়াছে। ইহা বিশ্বদ্যিালয়ের সাধারণ শিক্ষকদের বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ করিয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতিকে সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাই' (দৈনিক ইত্তেফাক ৪/১২/৯৪)। এই পাল্টা বিবৃতি প্রদান করলে পুনরায় শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে এই ১২২ জন শিক্ষকের অস্তিত্বকে অগ্রাহ্য করে রাজনৈতিক দলের ভাষায় বিবৃতিতে বলা হয়েছে 'তারা যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সাধারণ শিক্ষকের মতামতই প্রতিফলিত হইয়াছে' (দৈনিক ইত্তেফাক ৫/১২/৯৪)। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের বিরুদ্ধে তারা যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন সে বিষয়ে অবিচল থাকতে সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে উস্কানিমূলক বক্তব্যের মাধ্যমে শুধু কি প্রধানমন্ত্রী একাই দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন?

www.pathagar.com

বিরোধী দলের নেত্রী দেননি? 'কেউ কেউ মসজিদকে রাজনৈতিক দলের কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করছে। মসজিদে রাজনীতি করলে পবিত্রতা নষ্ট হয়। .. কেউ যেনো মসজিদকে কার্যালয় বানাতে না পারে তা দেখতে হবে'। শত সতর্কতার মাঝেও বিরোধী দলীয় নেত্রীর ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে এই বক্তব্যের মধ্য দিয়েই তিনি দেশের বৃহত্তম ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে তাদের লেলিয়ে দিয়েছেন। এই উস্কানি তিনি যে ছাত্রদেরকেই প্রথম দিলেন তা নয়। তিনি ইতিপূর্বেও তার দলীয় কর্মীদেরও এই একই উস্কানি দিয়েছেন। তাহলে রাষ্ট্রের সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি, ও উন্নয়নে বাধাপ্রদানকারী, রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংসকারীদের ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমকে অচল করে দেবার জন্য ছাত্রদলই যথেষ্ট বলায় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য কেন উস্কানি বলে বিবেচিত হবে? কেন রাজনীতি, মস্তানী, সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজি করা শিক্ষাক্রম ও ক্লাসের সাথে সম্পর্কহীন ছাত্রদের উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনা পদত্ত তিন মাসের উদঘুট্টি পড়া লেখার নির্দেশটি প্রশংসিত হয়? এগুতো এক ধরনের উস্কানি। তিন মাস বাদে বাকী সময়টিতে রাজনীতির নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করে দখলে রাখবার উদ্দেশ্যে উস্কানি। এই যে উস্কানির কথা আমরা বলছি এই উস্কানি যে কেবল রাজনৈতিক দল বা নেতা-নেত্রীরাই দিয়ে থাকেন তা নয়। এই উস্কানি প্রবন্ধকারদের মাধ্যমে এক শ্রেণীর পত্রপত্রিকাও দিয়ে থাকে। তারা নিয়মিতভাবেই তা দেন। এবং এদের উস্কানিতে কখনও কখনও জাতির যে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয় নেতা-নেত্রীদের উস্কানিতেও তা হয় না। অথচ এই সকল পত্রপত্রিকা এবং প্রবন্ধকারদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্তা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। কারণ তাতে আবার পত্রপত্রিকা এবং প্রবন্ধকারদের স্বাধীনতা খর্ব হয়। স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে এমনিভাবেই তারা জাতীয় ক্ষতি করেন। যেমন নেত্রীদ্বয়ের ছাত্রবিষয়ক বিবৃতিকে সমর্থন করে ক্ষতি করছেন। অথচ তারা একথা বলতে পারছেন না যে, সর্টকার্ট ও টিকটোকার লেখা পড়ায় মেধাবী নয় জাতি মেধাশূন্য হয়। বলতে পরছেন না যে, ছাত্রদের মস্তান, খুনী কিংবা চাঁদাবাজ বানাবেন না, ছাত্রদের ছাত্র থাকতে দিন। তাদের মাঠে কিংবা রাস্তায় নামাবেন না, তাদেরকে শিক্ষালয়েই থাকতে দিন। অবৈধ অর্থ এবং অস্ত্র দেবেন না, তাদেরকে বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ দিন। ছাত্রদের মস্তান কিংবা সন্ত্রাসের স্বীকৃতি দেবেন না, মেধার স্বীকৃতি দিন। বলতে পারছেন না যে, ছাত্রদেরকে একে অন্যের প্রতি লেলিয়ে দেবেন না, সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে দিন। কথাগুলো দলমত নির্বিশেষে দেশের সকল স্তর থেকেই উচ্চারিত হওয়া উচিত। দেশের বৃহত্তর স্বার্থেই তা হওয়া উচিত। অথছ হচ্ছে না। কিন্তু কেন? এই কেন'র সরাসরি উত্তর দেবার মত সাহসী এবং সৎ মানুষের বড়ই অভাব আজ বংলাদেশে। আশার কথা এই যে, এই অভাবের দিনে অশার বাণী শুনিয়েছেন জনাব ফরহাদ মজহার। অত্যন্ত সাহসের সাথেই দেশবাসীকে তিনি তা শুনিয়েছেন। জাতীয় জীবনে কেন এত সমস্যা এবং সংঘাত তারও দিয়েছেন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। সাংবিধানিক স্বৈরতন্ত্রের ধারা, জঘন্য এবং নোংরা স্বৈরতান্ত্রিক ধরণা এবং

www.pathagar.com

মস্তানতান্ত্রিক রাজনীতির দর্শনই যে এর মূল কারণ তা তিনি অত্যন্ত সাহসের সাথেই উচ্চারণ করেছেন। (বাংলাবাজার পত্রিকা ২৭/১২/৯৪)। সাংবিধানিক দুর্বলতার সুযোগেই যে রাজনৈতিক দল এবং কালো টাকার কারবারীরা লুটেরাদের মত ননী মাখন আর পিঠে ভাগাভাগির মারপিটে অবতীর্ণ হয় এইটি আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কারণ বর্তমান স্বার্থ ভাগাভাগির যে আন্দোলন চলছে এবং যে বিষয়কে কেন্দ্র করে সংসদ থেকে পদত্যাগের ঘটনাটি ঘটলো সেই বিষয়টিতে রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কিংবা জনগণের মানোন্নয়নের কোন দিক দর্শন নেই। ক্ষমতা লাভের বিষয়টি তাদের কাছে এখন মুখ্য। বিরোধী ত্রিদলীয় ঐক্য জোটের দাবি অনুযায়ী জনগণের ন্যায়সঙ্গত ভোটে নির্বাচিত বিএনপি সরকার যদি স্বৈরাচার এবং লুটপাটের সরকার হয় তাহলে যারা ঐ ক্ষমতার মসনদটিতে বসবার জন্যে এত উতলা হয়েছেন তাও যে ঐ লুটপাটেরই আশায় সে কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তা না হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যে তারা যে সংবিধান সংশোধনের কথা বলছেন তার সাথে (তাদের ভাষায়) ক্ষমতায় বসলেই যে কারণে লুটপাটের এবং চুরিচামারীর মহোৎসব শুরু হয় সেই কারণগুলো চিরতরে বন্ধের জন্যে সংবিধান সংশোধনের কথা জুড়ে দিতেন। কিন্তু তা করেন নি। কারণ সেই কাজটি করলে বিরোধী দলগুলোর পক্ষ থেকে যে বলা হচ্ছে তারা সংসদে যাবেন কি যাবেন না, সংসদে না গিয়েও বেতন ভাতা নেবেন কি নেবেন না, গুলশান বনানীসহ অভিজাত এলাকায় কতটি বাড়ির মালিক হলেন, ট্যাক্স-ফ্রি গাড়িসহ কতটা সুযোগ সুবিধা নিলেন এ বিষয়ে কারও কিছু বলার অধিকার নেই। এমনকি কোন আইন আদালতেরও নেই। এই কথাগুলো তারা বলতে পারতেন না। এদেশের গরীব, অশিক্ষিত, নির্বোধ মানুষদের ধোঁকা দেবার মত এর চেয়ে সুন্দর ব্যবস্থা আর কি হতে পারে। একদিকে ভাওতা দিয়ে জনগণকে বোঝানো হচ্ছে জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। অন্যদিকে বলা হচ্ছে তাদের ব্যাপারে কারো কিছু বলার অধিকার নেই। জনগণেরও নেই । আদালতেরও নেই। সুতরার এদেশের জনগণ আর কোন ভাওতা নয় প্রকৃত অধিকার চায়। সংশোধন করে হলেও সংবিধানে সাংসদদের নয় জনগনের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে আদালতের সর্বময় ক্ষমতা। যাতে কেউ বিচার বিভাগকে প্রভাবিত করে অন্যায়ভাবে রায় নিজের পক্ষে নিতে না পারে। যাতে না পারে অন্যায়ভাবে কাউকে সাজা দতি। কিন্তু এই পরিবর্তন করবে কে? চিরকাল সুবিধাভোগী যারা তারা যে কাজটি করতে চাইবে না সে কথা জনাব ফরহাদ মজহার স্পষ্ট করেই বলেছেন। বলেছেন 'বিএনপির শ্রেণী চরিত্র আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি থেকে আলাদা কিছু নয়। অতএব সাংবিধানিক স্বৈরতন্ত্র বা মস্তানতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধান এরা কখনোই বদলাতে চায় না' (বাংলাবাজার পত্রিকা ২৬/১২/৯৪)। আর একারণেই আমি গত ২৫ শে অক্টোবর '৯৪ তারিখে বাংলাবাজার পত্রিকার মাধ্যমে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারঃ নির্বাচন পরিচালনার জন্য নয়, দেশ পরিচালনার জন্য হোক' এই শিরোনামে বলেছিলাম 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আবারও নির্বাচন হলেই যে সর্বদলের নেতা-নেত্রী, কর্মী, সমর্থকগণ রাতারাতি সৎ হয়ে যাবে, এবং যারা ক্ষমতায় যাবে (যদি

www.pathagar.com

পুনরায় বিএনপিও যায়) তাদের আর কেউ ভোট চোর, স্বৈরাচার এবং লুটপাটের সরকার বলবে না এর কোন নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং গোড়ায় গলদ রেখে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করবার পূর্বে দেশ পরিচালনার জন্যে প্রয়োজন এমন একটি সরকার যে সরকারের সদস্যবৃন্দ হবেন আক্ষরিক অর্থেই সৎ, বিদ্যাবুদ্ধিতে তীক্ষ্ণ, ব্যক্তি জীবনে নির্লোভ, নিরপেক্ষ এবং অতি অবশ্যই নির্দলীয়। যারা দূর করবেন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অসংগতি। পুনর্গঠন করবেন ঘুনে ধরা দুর্বল রাষ্ট্রীয় কাঠামোগুলো। এবং প্রতিষ্ঠা করবেন জাতীয় আদর্শ ও ন্যায়নীতি। দেশের স্বার্থে, দেশের মানুষের স্বার্থেই তা করা উচিত। আবারো আহবান জানাই দলমত নির্বিশেষে দেশের সকল স্তরের সচেতন সকলে মিলেই কাজটি করুন। সংঘাতের মহাতংক থেকে জাতিকে মুক্তি দিন। অন্যথায় ক্ষমতার মসনদকে কেন্দ্র করে দলবদলের পালাই চলতে থাকবে, রাষ্ট্রের তথা মানুষের কোন কল্যাণ হবে না। তারা হবেন এই ঘূর্ণায়মান রাজনৈতিক চক্রের স্বীকার। এক মুঠো মোটা ভাত আর মোটা কাপড়ের দাবিদার চির চক্রান্তের স্বীকার, চির বঞ্চিত, সোনার বাংলার এহেন সহজ, সরল, নিরীহ, নিরন্ন নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ বিশ্বে বিরল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠরত সন্তানের জন্য দুঃসহ দুশ্চিন্তায় নিমজ্জিত, দুঃখ বেদনায় ভারাক্রান্ত, সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তায় উদ্বিগ্ন, পুত্রহারা, স্বজনহারা অভিভাবকসহ জেল, জুলুম, গুম, হত্যা, খুন, ছিনতাই, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, টেণ্ডারি, জোচ্চুরি, বোমাবাজি, অস্ত্রবাজি, নকলবাজি, হরতাল, অবরোধ, ভাংচুর, ওষুধ খাদ্যে ভেজালসহ বিভিন্ন ধরনের অন্যায় অত্যাচারে অতিষ্ঠ সকল স্তরের মানুষের কল্যাণে এগিয়ে আসুন। আশ্বস্ত করুন তাদের। জাগ্রত করুন এই অনুভূতি যে, ক্ষমতাসীন এবং ক্ষমতাহীন রাজনৈতিক দলের পদত্যাগকারী সদস্যসহ সকলের আন্দোলন ও কার্যক্রম ব্যক্তিস্বার্থে বা দলীয় স্বার্থে নয়। এই আন্দোলন এবং কার্যক্রম জাতির বৃহত্তর স্বার্থে। জনকল্যাণের স্বার্থে। উপহার দিন সাংবিধানিক স্বৈরতন্ত্রের উপর দাঁড় করানো সংবিধানের পরিবর্তে প্রকৃত 'গণতান্ত্রিক সংবিধান।' সর্বস্তরে ধ্বনিত হোক স্বৈরতন্ত্র নয় গণতন্ত্রেই মুক্তি। ২-১-১৯৯৫।

www.pathagar.com

নেতা-নেত্রী দলকেই ভালবাসেন দেশকে নয়,

সম্প্রতি বগুড়ায় মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য ভাঙ্গার প্রতিবাদে গত ৩রা জুলাই '৯৪ চারুকলা ইনস্টিটিউটে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক জনাব রফিকুন নবী। যারা বক্তব্য রাখেন তাদের মধ্যে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী, শিল্পী আবুল হাশেম খান এবং ভাস্কর শামীম সিকদারের নাম উল্লেখযোগ্য। শামীম সিকদার দেশের প্রধান প্রধান দলগুলোর সাম্প্রতিক ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে তার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এবং বগুড়ায় ধ্বংসপ্রাপ্ত ভাস্কর্যের স্থলে পুনরায় ভাস্কর্য নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন। দেশের প্রখ্যাত শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী সময় উপযোগী বলিষ্ঠ বক্তব্য রেখেছেন। তিনি একজন দার্শনিকের মতই বলেছেন-আমার জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আজ এই চুরানব্বইতে দাঁড়িয়ে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, 'রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা নিজেদের দলকেই ভালবাসেন, দেশকে নয়।' শিল্পীর এই বক্তব্যে তার জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতারই যে প্রতিফলন ঘটেছে তা বলাই বাহুল্য। অতীত এবং বর্তমানের প্রেক্ষিতে লক্ষ্যণীয় যে, ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী সকল দলের একই উচ্চারণ, আর তা হচ্ছে- 'আমরা দল করি, রাজনীতি করি দেশের উন্নয়নের জন্যে , দেশের সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্যে।' এ যে কত বড় ধাপ্পাবাজি, কত বড় ভাঁওতা বাজি তা দেশের সাধারণ ও নিরীহ মানুষ যারা তারা হাড়ে হাড়ে টের পান। তবে উন্নয়ন যে একেবারেই হয় না তা নয়। উন্নয়ন হয়। রাজনৈতিক দলের বিবেচনায়, রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রী এবং কর্মীদের বিবেচনায় যারা জনগণ তাদের উন্নয়ন হয়। অর্থাৎ ঢাকাসহ কয়েকটি শহরে রাজনৈতিক দলের মুষ্টিমেয় নেতা-নেত্রী ও কর্মী, যারা মিটিং মিছিল, হরতাল ও ভাংচুর করেই বিবৃতি দিয়ে নিজেরাই নিজেদেরকে জনগণ বলে আখ্যায়িত করেন, তাদের অর্থাৎ দলীয় জনগণ বা দলীয় সাধারণ মানুষের উন্নতি হয়। এদের অনেকেরই ধানমণ্ডি, গুলশান, বনানীসহ শহরের অভিজাত এলাকায় আলিশান আট্টালিকা উঠে, ট্যাক্স ফ্রি গাড়ি হয়, স্বনামে বেনামে অগাধ সম্পত্তি ও সাদা-কালো অর্থের পাহাড় জমে। অন্যপক্ষে শহর ও গ্রাম গঞ্জের সাধারণ মানুষ, যারা দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠিভুক্ত সাধারণ মানুষ, তাদের মধ্যে যিনি ১০ বিঘা জমির মালিক তিনি ৫ বিঘার মালিকে পরিণত হন। যিনি ২ বিঘার মালিক তিনি কোন না কোন প্রয়োজনে তা বিক্রি

www.pathagar.com

করে নিঃস্ব হন। যিনি নিঃস্ব তিনি আরও নিঃস্ব হয়ে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হন। আর যিনি পৌঁছে গেছেন মৃত্যুর কাছাকাছি তিনি সকল ভাঁওতার আওতামুক্ত হয়ে পাড়ি দেন পরপারে, সকল যন্ত্রণা থেকে হন মুক্ত। এই হচ্ছে দেশের মৌলিক চিত্র। বোধ করি শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী এই চিত্রের মর্ম বেদনা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। আর তাই তার ঐ নির্মম উক্তি।

সভায় আর যারা বক্তব্য রেখেছেন তাদের সকলের বক্তব্যেই দেশ যে একটি কঠিন মুহূর্ত অতিক্রম করছে তা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছে। যেদিন ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় সেদিন সকালে দেশের সকল দৈনিকে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হলো-'আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াত এক সঙ্গে আন্দোলন করবে'। জাতির কি দুর্ভাগ্য, যে আওয়ামী লীগ স্বৈরাচার এবং স্বাধীনতা বিরোধী মৌলবাদী জামায়াতের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করবার জন্যে জাতিকে আহ্বান জানিয়ে আসছে সেই আওয়ামী লীগই কিনা তাদের সাথে আঁতাতের স্বগর্ব ঘোষণা দিচ্ছে। আওয়ামী নেতৃত্বের কি নির্মম পতন। আওয়ামী সমর্থকদের জন্যে এ এক কঠিন পরীক্ষা। তারা কাদেরকে বলবেন স্বৈরাচার? কাদেরকে বলবেন মৌলবাদ? তারা তো এখন নিজেদেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ।

৩ জুলাই '৯৪-এর প্রতিবাদ সভার ঘোষণানুযায়ী ৭ জুলাই '৯৪ ছিল শিল্পীদের প্রতিবাদ মিছিল। প্রচণ্ড বৃষ্টি উপেক্ষা করে শিল্পীরা এদিন তাদের কর্মসূচি পালন করেছেন। প্রেসক্লাবের সামনে মৌলবাদের বিষাক্ত ছোবল প্রতিহত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে একটি বিষধর সাপের মস্তকের প্রতীকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়। মিছিলটি সেদিন চারুকলা ইনষ্টিটিউটে গিয়ে শেষ হয়।

কাকতালীয় ঘটনাই বলতে হয় প্রতিবাদের দিন, অর্থাৎ ৩রা জুলাই স্বৈরাচার এবং মৌলবাদ জামাতের সাথে আওয়ামী লীগের গাঁটছড়া বাঁধবার খবর প্রকাশিত হয়। আবার মিছিলের দিন অর্থাৎ ৭ জুলাই আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক সেই গাঁটছড়া কেন বাঁধা তার ব্যাখা প্রদান করা হয়। তিনি বলেছেন 'অনেকে জিজ্ঞেস করেন সংসদে আমরা কেন জামায়াতের সাথে বৈঠকে বসি। সংসদীয় রাজনীতির চর্চার কারণে বিরোধী দলের নেত্রী হিসেবে তাদের সাথে বাধ্য হয়েই বসতে হয়। তাহলে আমরা কি করবো? পদত্যাগ করবো'? তিনি আরও বলেছেন 'জিয়া-খালেদার বদৌলতে আজ, আমাদের সংসদে তাদের সাথে বসতে হচ্ছে। প্রকারান্তরে তাদের যে বসতে হচ্ছে এর জন্যে তিনি জিয়া-খালেদাকেই দায়ী করতে চেয়েছেন। শুধু তাই নয় তিনি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বিচার হওয়া প্রয়োজন বলে দাবি পর্যন্ত করেছেন। সেই সাথে বলেছেন-বঙ্গবন্ধু সাধারণ ক্ষমা করেছিলেন কিন্তু যারা যুদ্ধাপরাধী তাদের তিনি ক্ষমা করেননি। এমনি আরও অনেক কথা তিনি বলেছে। কথাগুলো বলেছেন শহীদ জননী জাহানারা ইমাম স্মরণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি আয়োজিত শোক সভায়। এদিকে ১৩ জুলাই '৯৪ বাংলাবাজার পত্রিকায় দেখা গেল আওয়ামী লীগ রাজপথে

www.pathagar.com

একক আন্দোলন করবে বলে খবর ছাপা হয়েছে। খবরে বলা হয়েছে- আওয়ামী বুদ্ধিজীবীদের সাথে এ বিষয়ে মতবিনিময় হয়েছে।

ঘন ঘন মত পরিবর্তন অসুস্থতার লক্ষণ। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিককালের ভূমিকা ও বক্তব্যসমূহ তাই প্রামণ করে। ঢাকাসহ সমগ্র দেশ বর্তমানে ভাইরাস জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার মত আওয়ামী লীগ সিদ্ধান্তহীনতার ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। তবে এই ভাইরাসকে সাধারণ ভাইরাস জ্বরের মত অবহেলা করতে করতে এখন কঠিন জ্বরে পরিণত হয়েছে। জ্বরের তাপমাত্রা প্রলাপ বকবার পর্যায়ে পৌঁছায় আওয়ামী লীগের এই বর্তমান অবস্থা। না হলে শেখ হাসিনা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মত একজন মুক্তিযোদ্ধাকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচার দাবি করতে পারতেন না। জামায়াতের সাথে আওয়ামী লীগের সখ্যতার জন্যে জিয়া-খালেদাকে দোষারোপ করতে পারতেন না। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন বাংলাদেশের নির্বোধ সাধারণ মানুষ অতীতের সব কিছু ভুলে বসে আছে, কিন্তু না কেউ কেউ ভুলে গেলেও সবাই ভুলে যায়নি। আর তাইত শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে আজও অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দের অনেকেই বলে থাকেন স্বাধীনতা বিরোধী, বুদ্ধিজীবী হত্যার নীলনকশা প্রণয়ন ও হত্যায় সাহায্যকারী যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা না করবার অনুরোধ জানালে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যা হবার হয়েছে। দেশ এখন স্বাধীন। সময় দেশ গড়ার। সকলে মিলেমিশে কাজ করুন। অনেকের একথাও স্মরণে আছে যে, বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে স্বাধীনতা বিরোধী সকলের জন্যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সাথে যুদ্ধাপরাধীদেরকে ভারতীয়দের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এবং উদারকণ্ঠে এই বলে ঘোষণা করেছিলেন যে, দেখিয়ে দিলাম আমরা ক্ষমা করতে জানি।

ক্ষমার উপরে মহত্ত্বর কোন কাজ নেই। বঙ্গবন্ধু সেই মহত্ত্বর কাজটিই করেছিলেন। আর এরই মধ্য দিয়ে তিনি যে অসাধারণ উদার হৃদয়ের অধিকারী তার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি চিন্তায়, কথায়, কাজে-কর্মে ঐক্য সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই দেশের সকল স্তরের মানুষের বিশ্বাস, ভালবাসা ও আস্থা আর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সকল স্তরের মনুষকে তিনি সমভাবে ভালবেসেছিলেন বলেই বাংলার প্রতি তার নির্ভেজাল ভালবাসাকে কেউ কখনও সন্দেহের চোখে দেখেনি। সেজন্যেই তার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা। 'সাধারণ ক্ষমার' আভিধানিক অর্থ সার্বজনীন বা সর্বসাধারণের জন্যে ক্ষমা। এক্ষেত্রে বাচবিচারের কোন অবকাশ নেই। এরূপ ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে শেখ মুজিব আরও একবার প্রমাণ করেছিলেন যে, তিনি প্রকৃতই 'বঙ্গবন্ধু।' সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড, বিবৃতি এবং উল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করলে আওয়ামী লীগ নেত্রী যে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন সেই চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠে। কারও পরামর্শে নয়, অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে আওয়ামী লীগের নিজস্ব দলীয় অভিমতের উপর ভিত্তি করে মূল নীতি নির্ধারণ করা কর্তব্য। বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবী সমাজের বেশির ভাগ সদস্যই স্বার্থপরতা ও মস্তিষ্ক বিকৃতিজনিত রোগে আক্রান্ত। সুতরাং দীর্ঘ অতীতের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করছে এই সমাজ থেকে আওয়ামী লীগ যতবেশী

www.pathagar.com

মুক্ত হতে পারবে ততবেশি মঙ্গল। কারণ অন্যের পরামর্শজনিত কারণে ঘনঘন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন সাধারণ মানুষকে দ্বিধান্বিত করে, সন্দিহান করে, মানুষের বিশ্বাসে আঘাত করে। যা দেশ ও দল কারও জন্যেই মঙ্গলজনক নয়। সেদিনের সরলপ্রাণ শিল্পীদের সভা ও মিছিলে এ সকল বিষয় সকলকেই ভাবিত করেছে।

যে শিল্পী নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে শিল্প চর্চায় নিমগ্ন থাকেন, যে শিল্পীসমাজ রাজনৈতিক মারপাঁচ্যের সঙ্গে কোনভাবেই যুক্ত নয়, সেই শিল্পীরা যখন পথে নেমে আসেন তখন কারও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, শিল্পীদের ক্ষুব্ধ হাবার কারণ ঘটেছে। পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকেই শিল্প সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত আছে। শিল্প যে কোন জাতির গর্বের বিষয়। শিল্পের সঙ্গে জাতি-ধর্মের কোন বিরোধ নেই। শিল্প সর্বাংশেই নির্মল এবং নিরপেক্ষ। মুসলিম দেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভাস্কর্য শোভা বর্ধন করছে। সুকুমার শিল্পের এহেনো নির্মল নির্বিরোধ শৈল্পিক অনুভূতির উপস্থিতি যে কোন জাতির জন্যে শ্লাঘার বিষয়। সুতরাং শান্তিপ্রিয় শিল্পীর উপর, শিল্পের উপর যে কোন আঘাতকে ধর্ম, বর্ণ, দল-মত নির্বিশেষে সকলেরই প্রতিহত করা উচিত। উচিত নিন্দা প্রকাশে সোচ্চার হওয়া। উচিত প্রতিবাদী স্রোতে শামিল হওয়া। যে স্রোতে ভেসে যাবে গ্লানি, মুছে যাবে কলংক চিহ্ন। জেগে উঠবে সকলের স্বপ্নের দেশ, শান্তির সুকুমারী সোনার বাংলাদেশ। ২২-৭-১৯৯৪।

শিল্পী সৃষ্ট নির্মল চিত্র

www.pathagar.com

পুলিশ ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

'রাজা' শব্দের বাংলা অর্থ নৃপতি, ভূপতি, নরপতি, দেশ শাসক কিংবা দেশের অধিপতি, এবং এর ইংরেজী অর্থ হচ্ছে- A king, a monarch, a prince, a ruler কিংবা a man of a magnificent and towering pesonality. আবার রাজা বা king বলতে অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি কিংবা কোন প্রজাতির বৃহত্তম বা শ্রেষ্ঠতম সদস্যকে বোঝানো হয়ে থাকে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ইলিশ কিংবা পুলিশকে রাজা অভিধায় আখ্যায়িত করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বহুল আলোচিত এবং ব্যাপকভাবে প্রচারিত একটি বিজ্ঞাপনের বদৌলতে দেশের মানুষ ইলিশকে 'মাছের রাজা' হিসেবেই ভাবতে শিখেছে। কিন্তু পুলিশ! হ্যাঁ-পুলিশকেও তাদের কর্মকাণ্ডের জন্যে, তাদের সীমাহীন প্রভাব প্রতিপত্তি এবং দাপটের জন্যে সধারণ মানুষেরা দেশের রাজা হিসেবেই গণ্য করতে অভ্যস্ত হয়েছে।

কিছুদিন আগের কাথা। একদিন দেখাা গেল ঢাকার পলাশী বাজারের ফুটপাতের দোকানগুলো উচ্ছেদ করতে পুলিশ বাহিনীর সদস্যবৃন্দ খুবই তৎপর। তারা দোকানীদের কারও কারও দ্রব্যসামগ্রী গাড়িতে তুলে নিচ্ছেন। অনেক দোকানীকে নিজেদের সামগ্রী অন্যত্র সরিয়ে ফেলতেও দেখা গেল। ফুটপাতে প্রতিষ্ঠিত বাজার ভেঙ্গে দেওয়ায় দোকানীরা অসন্তোষ প্রকাশ করলেও পুলিশ বাহিনী তাতে কর্ণপাত করলেন না। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফুটপাত দোকানশূন্য হয়ে গেল। যেমনটি বার বার, বহুবার হয়েছে। একই দিন নীলক্ষেত ফুটপাতের পত্র-পত্রিকার দোকানের দিকে যাচ্ছিলাম। যেতে যেতে লক্ষ্য করলাম একদল পুলিশ হেঁটে হেঁটে নীলক্ষেত পুলিশ ফাঁড়ির দিকে আসছেন। এসময় পুলিশদের লক্ষ্য করে ফুটপাতের একজন তরুণ উচ্চস্বরে বলে উঠলো-'মাছের রাজা ইলিশ, দেশের রাজা পুলিশ'। তরুণের কথা শুনে পুলিশদের কেউ কেউ একে অপরের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি হাসছিলেন। তারা সেদিন ঐ তরুণের কথায় বিব্রত কিংবা রাগান্বিত হননি। তরুণের বক্তব্যে ক্ষুব্ধ হবার মত কিছু ছিল বলে আমি নিজেও মনে করিনি। কারণ মাছের রাজা ইলিশ, আর বাত্তির রাজা ফিলিপস বলে যে বিজ্ঞাপন টেলিভিশনে প্রচার করা হয় তার উদ্দেশ্য মহৎ। কারণ মাছ এবং বৈদ্যুতিক বাল্বের মহত্ত প্রকাশার্থেই তা বলা হয়ে থাকে। সুতরাং পুলিশকে রাজা আখ্যায়িত করাতেও খারাপ কিছু দেখিনি। যদি কিনা সত্যি সত্যি তা বলা হয়ে থাকে, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রের সমস্যাদি তথা আইন শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে মহত্তম ভূমিকা পালনের জন্যে। আমি বিশ্বাস করি

www.pathagar.com

যথাযথ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে, প্রকৃত বন্ধু হিসেবে বিপদে আপদে জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য সহযোগিতা করবার মাধ্যমে পুলিশ অবশ্যই রাজার সম্মানের অধিকারী হতে পারেন। তাতে একজন নয় হাজার তরুণ, লক্ষ তরুণ, কোটি তরুণ গর্বভরে বলবে, পুলিশ প্রকৃতই দেশের রাজা। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য সেদিনের সেই তরুণের উচ্চারিত শব্দগুলো প্রশংসা সূচক ছিল না। ছিল বিদ্রুপাত্মক। পুলিশ কর্তৃক পিটিয়ে মানুষ হত্যা, ক্ষমতাসীন দলের সহযোগিতায় সাধারণ মানুষের উপর নির্যাতন, ধর্ষণ, ফুটপাতের দোকান উচ্ছেদ এবং অর্থের বিনিময়ে পুনঃস্থাপনসহ কতিপয় পুলিশের সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ডের কারণেই পুলিশের উদ্দেশ্যে ঐ মন্তব্য ছুঁড়ে দেয়া।

পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা কিংবা পুলিশের প্রতি বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য ছুঁড়ে দেয়ার মাত্রা সম্প্রতি বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের বিভিন্ন পত্র পত্রিকার পাতা উল্টালেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্প্রতি একটি পত্রিকায় 'পুলিশ কি বৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী!' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধে পুলিশের বিচিত্রমুখী অপকর্ম এবং অপরাধের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। যেমন- পুলিশকে ঘুষ দিতে জনগণকে বাধ্য করা, তহবিল তসরূপ, প্রতারণা, স্বজনপ্রীতি, জোরপূর্বক ছিনতাইকারীদের মত অর্থ আদায়, অর্থ না পেলে পিটিয়ে হত্যা করা, সম্পদের অপব্যবহার, কর্তব্যে অবহেলা, ধর্ষণ প্রভৃতি। পুলিশের বিরুদ্ধে উত্থাপিত এসকল অভিযোগরে প্রমাণ বহনকারী বিস্তারিত ব্যাখ্যাও পত্রিকায় তুরে ধরা হয়েছে। যা পাঠ করলে পুলিশকে আর পুলিশ ভাবা যায় না। কারণ পুলিশ বলতে যা বুঝায় এবং উল্লিখিত পত্রিকায় পুলিশের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা এক নয়।

প্রাচীনকালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সামরিক বাহিনীর সদস্যরাই পুলিশের দায়িত্ব পালন করতেন। রোমে সম্রাট অগাষ্টাস সর্বপ্রথম 'ভিজিলেস' নামে পুলিশ বাহিনী গঠন করেন (২৭ বি.সি.)। এই পুলিশ বাহিনী গঠনের আদর্শ, উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, Police are Government officers who enforce the law and maintain order. They work to prevent crime and to protect the lives and property of the people of a community. They petrol streets to guard against crime and to assist people with various problems. Police officers direct traffic to keep it running smoothly and safely. The police are often called on to settle family quarels, find lost persons, and aid accident victims. During earthquakes, floods, fires and other disasters. They help provide shelter, transportation and protection for victims. পুলিশ সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে- Police officers enforce criminal law, which covers murder, robery, burglary and othe crimes that threth society. Police officers investigate such crimes, arrest suspected lawbreakers and testify in court trials (The world Book Encyclopedia, Volume 15,p.546).

পুলিশ সম্পর্কে আরও অনেক বিষয়ে তথ্য রয়েছে। তবে পুলিশ বলতে যে অপরাধী

www.pathagar.com

ধৃতকারী কিংবা অপরাধ নিবারণের জন্যে নিয়োজিত সরকারের বিশেষ বিভাগের সদস্যদের বুঝায় এবং তাদের দায়িত্ব যে, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং জনগণের জান মালের হেপাজত করা তা বুঝতে উপরের উদ্ধৃতিই যথেষ্ট। কিন্তু পুলিশ যে, তাদের উপর ন্যাস্ত এই দায়িত্বগুলো পালন করছেন না, কিংবা বলা যায় পালন করতে পারছেন না বরং ঠিক উল্টো কাজগুলোই করছেন কিংবা করতে বাধ্য হচ্ছেন সে কথা সাম্প্রতিক সময়ে পত্রিকাগুলো স্পষ্ট করেই উল্লেখ করেছে। অতি সম্প্রতি ৩ জন পুলিশ নিহত হবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবারও বিষয়গুলো পত্রিকায় গুরুত্বের সাথে আলোচিত হচ্ছে। ১৯/০২/২০০১ তারিখে আরেকটি পত্রিকায় 'পুলিশ কেন বার বার টার্গেট হচ্ছে'? শিরোনামে আবেদ খান লিখেছেন-'পুলিশ তাদের সহজ এবং প্রথম লক্ষ্য বস্তু এই কারণে যে, পুলিশের ভেতরটাও ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। দুর্নীতি এবং দায়বদ্ধহীনতা এদের মেরুদণ্ডটাকে এমনভাবে দুমড়ে দিয়েছে যে, এর ফলে তারা প্রতিহত করবার ক্ষমতাও হারিয়েছে। অবস্থাটা এমনই দাঁড়িয়েছে যে, সন্ত্রাসীকে অস্ত্র নিয়ে চলাচল করতে দেয়া হয়, যদি সেই সন্ত্রাসী বিনিময়ে টাকা দেয়।' অর্থাৎ পুলিশ অর্থের বিনিময়ে তাদের নীতি আদর্শের সবকিছু বিকিয়ে দেয়, আবেদখানের প্রবন্ধে সে কথাই স্পষ্ট হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরেকটি পত্রিকার তথ্যও স্মরণ করা যায়। একই তারিখে এই পত্রিকায় বলা হয়েছে যে, 'পুলিশ জানায় রাজধানীর তেজগাঁও থানা এলাকায় চিহ্নিত সন্ত্রাসী সেলিম ওরফে সেইল্যার নামে হত্যাসহ ১৭টি মামলা রয়েছে। অধিকাংশ মামলাই জননিরাপত্তা আইন ও পুলিশকে মারধর করবার অপরাধে দায়ের করা হয়েছিল। সূত্র মতে, পুলিশের প্রতি সেলিম খুব ক্ষুব্ধ ছিল। সে তেজগাঁও রেল লাইন বস্তিতে মাদক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করতো। প্রতিমাসে এই কারণে সে তেজগাঁও থানায় ১ লাখ টাকা মাসোহারাও দিত। উত্তরায় নিহত পুলিশ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সন্ত্রাসী সেলিম সম্পর্কে পুলিশ এসকল তথ্য প্রদান করেছে। আর সন্ত্রাসী সেলিম ওরফে সেইল্যার ভাষ্য আরও চমকপ্রদ এবং চাঞ্চল্যকর। পুলিশকে মাসে লাখ টাকা প্রদানকারী সেইল্যা পুলিশ রিমাণ্ডে বলেছে যে, সে নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন মায়ার পুত্র দীপু চৌধুরীর বডিগার্ড হিসেবে কাজ করতো। উত্তরার দক্ষিণখানে তারাজউদ্দিন হত্যা মামলার মুচলেকা আদায় ও পরবর্তীতে পুলিশের পক্ষ থেকে থানায় ডায়রী করা নিয়ে তারা পুলিশের উপর ক্ষ্যাপা ছিল। হত্যা মামলাসহ বিভিন্ন ধরনের মামলা থাকা সত্ত্বেও সরকার দলীয় নেতাদের আশীর্বাদপুষ্ট থানা পুলিশ তাকে ধরেনি। ফলে সে এতই বেপরোয়া হয়ে উঠে যে শেষ পর্যন্ত একজন নিরপরাধ পুলিশকে জীবন দিতে হলো। এখানেই শেষ নয় খবর আরও আছে। কিন্তু সেগুলো উল্লেখের আর প্রয়োজন নেই। কারণ পুলিশ বাহিনীতে কি পরিমাণ ধ্বস নেমেছে এবং কতটা অধঃপতন হয়েছে তাদের তা অনুধাবন করার জন্যে এটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু যারা পুলিশ সম্পর্কে এসকল তথ্য দিচ্ছেন, পুলিশের উপর সকল দোষ চাপিয়ে পুলিশের ভাবমূর্তি ধূলায় মিশিয়ে দিচ্ছেন তাদের নিকট সবিনয়ে একটি প্রশ্ন রাখতে চাই আর তা হচ্ছে-পুলিশ বিভাগের এই ধ্বস এবং অধঃপতনের জন্যে দায়ী কে? পুলিশ যে রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের কারণেই

www.pathagar.com

অসহায় এবং রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের কারণেই যে পুলিশ তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে সক্ষম নয়, কিংবা তাদের সামনে গুলি চালনার ঘটনা ঘটলে এমনকি হত্যাকাণ্ড ঘটলেও যে তারা বন্দুকধারীদের কিংবা হত্যাকারীদের গ্রেফতার করতে সক্ষম হন না তা কি দেশে কিংবা বিদেশের মানুষদের নিকট অজানা বিষয়? অস্ত্রধারী, খুনী, সন্ত্রাসীদের যেখানে পুলিশকে যমের মত ভয় পাবার কথা সেখানে উল্টো পুলিশই যে যমের মত ভয় পায় সন্ত্রাসী বন্দুকধারীদের তা কি গত ১৩ ফেব্রুয়ারী '০১ তারিখে ডাঃ ইকবালের মিছিল থেকে গুলি চালনার দৃশ্য প্রামাণ করে না। কিন্তু কেন ভয় করেন? ভয় করেন, কারণ অস্ত্রবাজ, খুনি, সন্ত্রাসীদের সঙ্গে থাকেন রাজনৈতিক দলের বিশেষ করে ক্ষমতাসীন দলের মন্ত্রী , সাংসদ, নেতা-নেত্রী, সমর্থক অন্যান্য সংগঠনের সদস্যবৃন্দ। যাদের কারণে পুলিশের পক্ষে কোন ব্যবস্থা গ্রহণই সম্ভব হয় না। অথচ তাদের কথা না বলে অদক্ষতা, অপারগতা, অবহেলা, পক্ষপাতিত্বসহ সকল বিষয়ে দোষ চাপানো হচ্ছে পুলিশের উপর।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি পুলিশ বিভাগকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন করলে, সরকারি প্রভাবমুক্ত করলে, সকল ভয়ভীতির উর্ধে থেকে কাজ করবার সুযোগ দিলে এবং সংসারের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্যে সম্মানজনক বেতন ভাতা প্রদান করলে পুলিশ বাহিনী ২৪ ঘন্টার মধ্যে সমগ্র দেশকে শান্তি শৃঙ্খলার মধ্যে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবেন। দেশে এরূপ একটি পুলিশ প্রশাসন যাতে তৈরি হতে পারে সেই লক্ষ্যে সকল মহল থেকে জোরালো দাবি উত্থাপন করতে হবে। এরূপ একটি পুলিশ প্রশাসন সৃষ্টির পর পুলিশ যদি কর্তব্যে অবহেলা করেন কিংবা যথার্থ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হন কেবল তখনই পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলে যুক্তিযুক্ত হবে। বর্তমান ব্যবস্থায় পুলিশ সম্পূর্ণ অসহায়। এই অসহায়ত্বের আরও একটি উদাহরণ হচ্ছে রাজশাহীর একটি ঘটনা। প্রবন্ধটি যখন শেষ করছি ঠিক তখনই ঘটনাটির কথা জানা গেছে। ঘটনাটি হচ্ছে- একটি আবাসিক হোটেলে একজন পতিতার সঙ্গে অসামাজিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকার অভিযোগে একজন ছাত্রলীগ নেতাকে পুলিশ গ্রেফতার করলে তাকে (পুলিশকে) প্রহৃত হতে হয়েছে। ফলে পুলিশ এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। সুতরাং এই অসহায় পুলিশদের বিরুদ্ধে নয়, পুলিশদের যারা অসহায় করেছে তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন। ৩-৩-২০০১।

www.pathagar.com

রক্তপিপাসু কাক

পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে কাক মৃত্যু, দুর্ভাগ্য, দুর্ঘটনা এবং মহামারীর প্রতীক। কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, একদা ঈশ্বর দেবতাদের উৎসর্গ করবার উদ্দেশে কাককে পার্শ্ববর্তী প্রস্রবণ থেকে পানি অনতে নির্দেশ করেন। কিন্তু কাক প্রস্রবণের ধারে কিছু ডুমুরের ফল দেখতে পায়। লোভী কাক সেই ডুমুরের ফল ভক্ষণের বাসনায় উদগ্রীব হয়ে ওঠে এবং ফল না পাকা পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষ করে। ফলে কাকের এই নির্দেশ অমান্যজনিত অপরাধের জন্য ঈশ্বর এই বলে অভিসম্পাত দেন যে, কাক গ্রীষ্মকালে তৃষ্ণায় অস্থির থাকবে এবং ভাঙ্গা কর্কশ গলায় কা-কা রবে ডাকতে থাকবে। শঙ্কার প্রতিকরূপি, মৃত্যুর পরোয়ানারূপী কাক আজ বাংলাদেশে অত্যন্ত সুপরিচিত। কাকের কা-কা শব্দে মানুষ বিচলিত হয়। শঙ্কিত হয়। বাংলাবাজার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় এমনি একটি কাকের ছবি দেখে মানুষ শিউড়ে উঠেছে। ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০১ সালের পত্রিকায় ছবিটি ছাপা হয়েছে। রাজপথে লাল টুকটুকে তাজা রক্ত। এই রক্তপানরত একটি কাক। এটি কোন অস্বাভাবিক দৃশ্য নয়। কারণ মানুষ এমন অনেক দৃশ্য দেখেছে। দেখতে অভ্যস্ত। গরু, ছাগল জবাই করবার পর কাকের রক্তপানরত এমন দৃশ্য কারো হৃদয়ে শঙ্কার সৃষ্টি করে না। বাংলাবাজার পত্রিকায় ছাপা এই দৃশ্যটিও শঙ্কার সৃষ্টি করতো না যদি না ছবিটির পাশেই বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকতো 'হরতালে গুলিতে পুলিশসহ ৫জন নিহত, আহত ১০' এবং 'প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করে অস্ত্রধারীদের গুলিবর্ষণ।' পত্রিকার এ শিরোনাম পড়লে বুঝতে কারো অসুবিধা হয় না যে, রাজপথের উক্ত টালটাল রক্ত গরু ছাগলের নয়। শঙ্কা একারণেই। কাকের রক্তপানের দৃশ্য প্রমাণ করছে যে, গরু ছাগলের চেয়ে মানুষের রক্ত কতটা সস্তা হয়েছে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে পকিস্তানের হানাদার বাহিনী এবং তাদের দোসর রাজাকার ও আলবদর বাহিনীর নির্বিচার এবং প্রকাশ্য হত্যাকাণ্ড মানুষের রক্ত-মাংসকে কতটা সস্তা ও মূল্যহীন করেছিল, কিভাবে এবং কত নির্দয়ভাবে পশু-পাখির মত মানুষ হত্যার মধ্য দিয়ে একশ্রেণীর মানুষ মৃত্যু, দুর্ঘটনা আর মহামারীর প্রতীক রক্ত পিপাসু কাকরূপে নিজেদেরকে চিহ্নিত করেছিল। ১৪ ফেব্রুয়ারি পত্রিকায় প্রকাশিত রক্তপিপাসু কাক '৭১-এর ভীতিপ্রদ রক্তপিপাসু কাকরূপী পাকসেনা ও তাদের দোসর রাজাকার, আলবদর, আল সামসদের কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এ দিনের দৈনিকে সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে এই কাকদের স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের কট্টর সমর্থক পত্রিকাগুলোও আওয়ামী লীগের শান্তি মিছিলের

www.pathagar.com

শ্বেত শুভ্র কথিত শান্তির দেবদূতগণের পুলিশের সহায়তায় বিরোধী দলের মিছিলকারীদের ওপর নির্বিচার গুলি বর্ষণের দৃশ্য দেখে লজ্জায় মাথা নত করেছে। তুলে ধরেছে নির্লজ্জ গুলি বর্ষণের চিত্র। সেকেণ্ড সেঞ্চুরী এ.ডি.তে গ্রীক ভূগোলজ্ঞ পোসানিয়াস বলেছেন যে, কাক-এর রঙ পূর্বে বরফের মতই শুভ্র ছিল। কিন্তু অশিষ্ট আচরণের কারণে ঈশ্বরের অভিসম্পাতপ্রাপ্ত হওয়ায় শুভ্র রঙের পরিবর্তে কাক কালো রঙ ধারণ করে। আওয়ামী শান্তি মিছিলকারীদের অবস্থাও হয়েছে তাই।। তাদেরও রঙ আজ কালো। সমগ্র দেশবাসী তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণার সাথে উচ্চারণ করছে মন্দ বাক্য। দিচ্ছে ধিক্কার। তাদের কথা এবং কাজের মধ্যে বিস্তর ব্যবধানজনীত কারণে মুখে দেববানী এবং হৃদয়ে সন্ত্রাসী আর খুনির আদর্শ লালনের ফলে ঈশ্বর প্রদত্ত অভিসম্পাতের কারণেই তাদের কালো চেহারা আজ দেশবাসীর নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ১৫/০২/০১ প্রতিটি দৈনিকই তাদের কালো, কুৎসিত চেহারাকে ব্যাপকভাবে দেশবাসীর নিকট, সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। শান্তি মিছিলের দেবদূতদের প্রধান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সাংসদ ডাঃ ইকবালের চারপাশের অবস্থানরত বন্দুকধারীদের নাম ঠিকানা উল্লেখপূর্বক দৈনিকগুলো জাতীয় দায়িত্ব পালন করছে। জাতির এই দুর্দিনে প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য ও কর্মকাণ্ডের কঠোর সমালোচনা করে বিভিন্ন দৈনিক মন্তব্য প্রতিবেদনও প্রকাশ করেছে। কোন কোন পত্রিকা আওয়ামী লীগের এমন গণতন্ত্রকে সন্ত্রাসী গণতন্ত্র বলে উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পুনরায় জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে আজ ত্রিশ বছর হয়। এই ত্রিশ বছর কম সময় নয়। অথচ এই ত্রিশ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস কি? এই ত্রিশ বছরের ইতিহাস-সন্ত্রাস আর সংঘর্ষের ইতিহাস। খুন-যখম-হত্যাকাণ্ডের ইতিহাস। এই ইতিহাস স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণ চায়নি। অথচ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জনগণকে এই ভয়ঙ্কর অস্থিরতার ইতিহাসই উপহার দিয়েছে। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টির শাসন জনগণ বার কয়েক দেখেছেন। কোন দলই শান্তি কিংবা স্বস্তি দিতে পারেনি। জনগণ এই অশান্তির কারণেই শেখ হাসিনাকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করেছিলো। তাদের আশা ছিল শেখ হাসিনা হয়তো শান্তি দিতে পারবেন। কিন্তু না, শেখ হাসিনার ক্ষমতায় আরোহরণের কিছুদিনের মধ্যেই জনগণের মনে হতাশা দেখা দিল। তাদেরকে বলতে শোনা গেল- ভোট দিয়ে কি ভুল করলাম! আমি নিজেও শেখ হাসিনার কর্মকাণ্ডের প্রতি আশাবাদী ছিলাম এবং ১৭-৭-৯৬ তারিখে বংলাবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁকে সকল বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলেছিলাম। তাঁর দলের নেতাকর্মী ও সমর্থকসহ যারাই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হচ্ছে তাদের সকলকে দমন করবার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলাম। আওয়ামী দলের সমর্থকদের দ্বারা দেশে যে ব্যাপক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটছে একদিনের দুটি পত্রিকা থেকে ১৪টি উদাহরণের সাহায্যে সে কথা উল্লেখ করেছিলাম ওই প্রবন্ধে। কিন্তু না তাতে কোন কাজ হয়নি। জাতি অত্যন্ত উদবেগের সাথে লক্ষ্য করেছে যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর দলের মন্ত্রী ও

www.pathagar.com

নেতৃবর্গ সব সময় সন্ত্রাসের সকল দায়-দায়িত্ব উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিরোধী দলের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজেদেরকে ধোয়া তুলসী পাতা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। ধৈর্যের বাঁধ বলে একটি কথা আছে। ঈশ্বরেরও হয়তো ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। আর সে জন্যই আওয়ামী লীগ যে ধোয়া তুলসী পাতা নয় তা প্রমাণের জন্যে আওয়ামী দলের সাংসদ ডাঃ ইকবালের নেতৃত্বে ১৩ তারিখের হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি জাতির নিকট প্রকাশ করে দিয়েছেন।

সুতরাং জাতির নিকট এটা এখন সুস্পষ্ট যে, কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষেই সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা কিংবা শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। কারণ প্রতিটি দলেই রয়েছে সন্ত্রাসী আর দুষ্টচক্রের প্রভাব। যে প্রভাব থেকে দলকে মুক্ত করা কোন দলীয় প্রধানের পক্ষেই সম্ভব নয়। আর এ কারণেই দেশের জন্যে প্রয়োজন এমন একটি সরকার যেখানে থাকবে না কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য। থাকবে না রাজনৈতিক দলের পদলেহী তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরাও। থাকবে সৎ, সাহসী, সুশিক্ষিত নির্লোভ ব্যক্তিবর্গ। যারা ব্যক্তিস্বার্থ নয় জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেবেন। পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দেবেন প্রচার, আইন-আদালত এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহকে। যাদের কাছে রাষ্ট্র প্রধান থেকে শুরু করে রাষ্ট্র কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত সকলেই তাদের অন্যায় কর্মকাণ্ডের জন্যে জবাবদিহী করবেন। সকল বিষয়ে জাতি পাবে স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ চিত্র। রাষ্ট্রের বিবেকবান সকলের নিকট বিনীত অনুরোধ সকল স্তর থেকে এমন একটি সরকার গঠনের জোর দাবি উত্থাপন করুন। একবার অন্তত এই স্বপ্নের সরকার প্রতিষ্ঠা করে দেখুন জাতীয় জীবনে সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠায় এবং সমৃদ্ধি আনয়নে সেই সরকার সক্ষম হয় কিনা। ২৮-২-২০০১।

www.pathagar.com

সুমহান আত্মোৎসর্গ

পৃথিবীর প্রাণীকূলের মধ্যে এমন অনেক পশু পাখি আছে যারা বিচার বুদ্ধিতে অনেক ক্ষেত্রে মানুষকেও হার মানায়। অনেক প্রাণী দলবদ্ধভাবে বাস করে এবং একে অপরের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল হয়ে থাকে। বিপদে আপদে একে অন্যের প্রতি দুঃখ প্রকাশ করে। এদের মধ্যে অনেকে অন্ন সংস্থানের প্রয়োজনে একে অন্যের সঙ্গে শলা পরামর্শ করে সুপরিকল্পিতভাবে শিকার করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী যার যে পথে যে দিক থেকে যেভাবে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার কথা ঠিক সেই ভাবেই কাজ করে। সে এক অবিশ্বাস্য সংঘবদ্ধ আক্রমণ। মুক্তিযুদ্ধের গেরিলা আক্রমণের সাথেই যার তুলনা করা চলে। পশুরাজ বলে পরিচিত সিংহদের মধ্যে এইটি লক্ষ্য করা যায়। পশু রাজই নয় আকারে ক্ষুদ্র এবং শক্তিতে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও নেকড়েদের যৌথ আক্রমণের কারণে মহা শক্তিধর বাইসন এবং বুনো মহিষও ধরাসায়ী হয়ে পড়ে। প্রাণী জগতের অনেক প্রাণী আবার অতি বিচক্ষণ, ভাবপ্রবণ এবং অভিমানীও হয়ে থাকে। বাড়ীর যে কুকুরটি সেও মনিবের অনুগত হয়। বিপদে আপদে মনিবকে সাহায্য করে। বাড়ী রাখে শত্রুমুক্ত। অথচ ছোট থেকে খাইয়ে পরিয়ে যে মানুষটিকে বড় করলো দেখা যায় সে-ই একদিন সামান্য স্বার্থে মনিবের বুকে কৃপাণ বসিয়ে দিল। দেখা যায় বন্ধু বন্ধুকে, স্বামী স্ত্রীকে , স্ত্রী স্বামীকে, ছেলে মাকে, বাবা ছেলেকে, ছেলে বাবাকে, ভাই বোনকে, বোন ভাইকে, প্রেমিক প্রেমিকাকে, প্রেমিকা প্রেমিককে তুচ্ছ ঘটনার কারণে হত্যা করছে। এতদসত্তেও মানুষই শ্রেষ্ঠত্বের আসনটি রেখেছে দখলে। গ্রীক দার্শনিক এ্যানাকসাগোরাস অবশ্য মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকে বেশী একটা মূল্য দিতে চাননি। তিনি বলেছেন, অন্যান্য প্রাণী আর মানুষের মধ্যে বিরাট কোন পার্থক্য নেই। মানুষের দুটি হাত আছে বলেই অন্য প্রাণী থেকে উন্নত। এনাকসাগোরাসের এই অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য সত্ত্বেও লক্ষ্য করা যায় যে, কোন কোন মানুষ যেকোন জীবজন্তু ও পশুপাখির চেয়ে উন্মুক্ত চিন্তা করবার ক্ষমতায় আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনায় অত্যন্ত দক্ষ হয়ে থাকেন। এবং প্রকৃতির প্রভূ বা নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তারা রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন ও যন্ত্রকৌশলে অভিজ্ঞ এবং সুন্দর অসুন্দরের পার্থক্য নির্মাণে পারঙ্গম হন। এসব সত্ত্বেও অনেক মানুষ সুকুমার শিল্প বিষয়ক জ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়ার সুবাদে শিল্পী হিসেবে পরিচিত হন। একইভাবে প্রাণী জগতে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এমন অনেক প্রাণী আছে যারা মানুষের মত শিল্প দক্ষতাসম্পন্ন। এদের মধ্যে পাখি ও মাকড়সা অন্যতম। পাখি বাসা বাঁধবার ক্ষেত্রে এবং মাকড়সা জাল বুনবার ক্ষেত্রে যে

www.pathagar.com

শিল্প নৈপুণ্য তুলে ধরে তা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদেরকে প্রকৃত শিল্পী না বলে এক ধরনের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের শিল্পী বালা হয়। মানুষের মত জ্ঞানের বিস্তৃত বিশাল জগতে বিচরণ না করলেও পাখিদের কোনভাবেই খাটো করে দেখা যায় না। কথিত আছে গ্রীক এবং রোমানদের মধ্যে কাক প্রোফেট বা দৈব বার্তাবাহী পাখি হিসেবে পরিচিত। শুধু তাই নয় কাক, বিশেষকরে দাঁড় কাক আমাদের দেশেও অনুরূপ বিশ্বাসের পাখি হিসেবে পরিচিত। আর তা ছাড়া অনেক পাখিই বিচার বুদ্ধি, শিল্পনৈপুণ্য, মান অভিমান এবং আত্মমর্যাদার দিক থেকে অত্যন্ত সচেতন। আত্মমর্যাদাবোধের ক্ষেত্রে মানুষও কখনও কখনও পাখির নিকট পরাজয় মানে। যেমন আত্মমর্যাদাহীন এক শ্রেণীর শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য পেশার লোক, যারা স্বার্থের প্রয়োজনে নিজের সত্তাকে বিকিয়ে দিয়ে ক্ষমতাসীনদের পদলেহনে অভ্যস্ত হয়ে পরে। কিন্তু পৃথিবীতে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই যারা তীক্ষ্ণ আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। যারা লোভ লালসার বসে কারও কাছে মাথা নত করে না। আমরা দার্শনিক সক্রেটিসের কথা জানি, যিনি আপোষের পরিবর্তে ক্ষমতাসীনদের দেওয়া মৃত্যুদণ্ডকেই স্বাগত জানিয়েছিলেন।

শুধু মানুষই নয়, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এরূপ অনেক প্রাণীর কথাও জানা যায়। এইতো সেদিন (১৭ জুলাই '৯৪) বাংলাবাজার পত্রিকায় 'আবাবিল পাখির আত্মহত্যা' এই শিরোনামে একটি খবর ছাপা হয়েছে। খুবই ছোট খবর। বিশ্বকাপের ডামাডোলে হয়তো অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়ে থাকবে। বিশ্বকাপতো আর নয়, পাখির মৃত্যু। কি আর এমন খবর। এরকম হয়তো অনেকেই ভেবেছেন যাদের দৃষ্টিসীমায় খবরটি এসেছে। কিন্তু না, খবরটি এতটা অবহেলার ছিল না। বিশ্বকাপে কে কতটা গোল করবে, কে কতটা গোল খাবে, কে কাকে হারাবে, কে জিতবে, এমনি সব অনিশ্চিত বিষয়ে ফুটবল বিশারদদের অনুমান-নির্ভর কলাম এবং খবর যখন পত্রিকার প্রথম পাতা দখল করে রেখেছে তখন এই ছোট খবরটি স্থান পেয়েছে ভেতরের পাতায়। খবরে বলা হয়েছে 'চীনে দুটি আবাবিল পাখি উপর্যুপরি তাদের বাসা ভেঙ্গে ফেলায় মনের দুঃখে আত্মহত্যা করেছে।' পত্রিকার তথ্যানুযায়ী যে চিত্রটি ভেসে উঠে তা হচ্ছে- চীনের একটি শহুরে লোকের বাড়ীর ছাদের এক প্রান্তে পাখি দুটি বাসা বেঁধে সুখে শান্তিতে বসবাস করতো। এবং বছরের একটি বিশেষ সময় বাসা ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যেতো খাবার অন্বেষণে। কিন্তু ফিরে এসে দেখতো গৃহকর্তা তাদের বাসাটি ভেঙ্গে দিয়েছে। তারা যতবারই বাসা বেঁধেছে ততবারই গৃহকর্তা ভেঙ্গে ফেলেছে। এমনিভাবে পাঁচবার বাসা ভাঙ্গার পর তাদের হৃদয়ে লালিত আত্মমর্যাদাবোধেরও বাঁধ ভেঙ্গে যায়। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে এই গ্লানিকর অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং গৃহকর্তার ঘরের দরজায় মাথা ঠুকে ঠুকে আত্মহত্যা করে। কি নির্মম দৃশ্য। পরাজয়ের গ্লানি থেকে চাঁচতে কি নির্মম সিদ্ধান্ত। পাখি দুটির আত্মমর্যাদাবোধ দার্শনিক সক্রেটিসকেও যেনো অতিক্রম করে যায়।

পাখি। সামান্য যে পাখি, তাদের কি তীব্র অনুভূতি। অথচ আমাদেরই সমাজের সর্বস্তরে, আমাদেরই পাশে, আত্মমর্যাদহীন, মেরুদণ্ডহীন, পচে যাওয়া গলে যাওয়া মানুষের

www.pathagar.com

কি অসংখ্য ভীড়। কুচক্রী, লোভী, কুৎসিত সেই মানুষগুলোর দুর্দণ্ড প্রতাপে দেশ, সমাজ, সংস্কৃতি, সততা ধ্বংসের কাছাকাছি আজ। যাদের কাছে সক্রেটিস ও আবাবিলদের আত্মত্যাগ মূল্যহীন, হাসির বিষয়। আবাবিল সামান্য পাখি হলেও রেখে গেছে অসামান্য আত্মত্যাগের স্মৃতি। অবহেলিত, দরিদ্র, পরমুখাপেক্ষি, পরনির্ভর জাতির জন্য এ এক শিক্ষণীয় আদর্শ স্মৃতি। যে দেশ গণতন্ত্র ও শান্তির ধ্বজাধারী পশ্চিমী বেনিয়াদের গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ, পশ্চিমী চাপের মুখে, সরকার, সরকরী সিদ্ধান্ত পর্যন্ত স্তব্ধ, সে দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য আদর্শ দৃষ্টান্ত। আবাবিল দম্পতির সুমহান আত্মোৎসর্গই হোক অবহেলিত, দরিদ্র, নির্যাতিত ও পরাধীন সকল জাতির বেধোদয়ের মহান শিক্ষা। ২-৮-১৯৯৪।

www.pathagar.com

জাতির দুর্দিনে বাঁশি-লাঠির উত্থানঃ অন্ধকারে আশার আলো

শান্তির অর্থ-উৎকণ্ঠাশূন্যতা , চিত্তস্থৈর্য, উপদ্রবহীনতা, উৎপাতশূন্যতা, বিবাদের মীমাংসা, যুদ্ধাবসান প্রভৃতি। যদি তাই হয়, তাহলে বাংলাদেশে শান্তি ছিল, আছে, কিংবা ভবিষ্যতে আসবে একথা কোনভাবেই বলা যাবে না। সুতরাং বাংলাদেশ যে চিরস্থায়ী অশান্তির দেশ একথা বলাটাই যথার্থ। বাংলাদেশের মানুষ ব্রিটিশদের পূর্বে যেমন, তেমনি ব্রিটিশদের আমলেও অশান্তিতে ছিল। অশান্তিতে ছিল পাকিস্তান আমলেও। এখন স্বাধীন বাংলাদেশেও তারা অশান্তিতে আছে। বলা যায়, পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় এখন অনেক বেশি উদ্বেগ আর অশান্তির মধ্যে দিনাতিপাত করছে। অথচ পাকিস্তানীদের হটিয়ে বাংলাদেশ করা হয়েছিল দেশের নির্যাতিত দুঃখভারাক্রান্ত এবং অশান্ত মানুষদের শান্তি দেবার জন্যে। দেশের মানুষকে বলা হয়েছিল ব্রিটিশদের হাত থেকে রেহাই পেলে, ভারতের নাগপাশ থেকে মুক্ত হলে এ অঞ্চলে শান্তি স্থাপিত হবে। কিন্তু হলো না। এরপর বলা হলো পাকিস্তানীদের বিতাড়িত করতে পারলে মানুষ সুখসাগরে ভাসবে। পোড়ামাটির বাংলা পরিণত হবে সোনার বাংলায়। কিন্তু তাও হলো না। হবার কোন সম্ভবনাও দেখা যাচ্ছে না। কারণ বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর যে অবস্থা, তাদের যে অসহিষ্ণুতা এবং ইতিমধ্যে তারা যে সকল কর্মকাণ্ড সংঘটিত করেছে তাতে ভবিষ্যতে অতিমাত্রায় সংঘাত, সন্ত্রাস এবং হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবার সম্ভাবনা শতভাগ। কারণ ইতিপূর্বে সব সরকারের আমলেই কম বেশি সংঘাত, সন্ত্রাস এবং হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। বর্তমানে আওয়ামী সরকারের আমলে আরও অধিকমাত্রায় ঘটছে বলে প্রতিদিনই পত্র-পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। শান্তির যে সংজ্ঞা বা অর্থের কথা প্রবন্ধের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে সেই উৎকণ্ঠাশূন্যতা, উপদ্রবহীনতা, উৎপাতশূন্যতা, বিবাদে মীমাংসা কিংবা যুদ্ধাবসানের কোনকিছু বর্তমান সরকারের আমলে লক্ষ্য করা যায়নি। যায়নি, কারণ দেশের দাগী সাধারণ সন্ত্রাসী,বিভিন্ন দলের সঙ্গে যুক্ত অর্থলোভী সদস্য এবং ক্ষমতাসীন দলের সদস্য এবং সদস্যদের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা সৃষ্ট উপদ্রব, সন্ত্রাস ও হত্যাকাণ্ডের কারণে মানুষের মধ্যে উৎকণ্ঠা অধিকমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে অশান্তি। এই উৎকণ্ঠা, এই অশান্তি বাড়িয়েছেন এমপি, মন্ত্রী, তাদের সন্তান, সন্তানদের বন্ধু বান্ধব এবং ঘনিষ্ঠজনেরা। সরকারি জমি, হাট-বাজার, জনগণের জমি, বাড়িঘর দখল এবং সন্ত্রাস ও

www.pathagar.com

হত্যাসহ বিভিন্ন ধরনের লোমহর্ষক অপরাধের সঙ্গে এদের জড়িত থাকার খবর পত্র-পত্রিকায় প্রায়শই লক্ষ্য করা যায়। এই প্রবন্ধ লিখবার সময়টিতেও একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা হাতে এসেছে, যার কভারে লেখা রয়েছে-'চারিদিকে সন্ত্রাস! চারিদিকে সন্ত্রাস!' সন্ত্রাস বিষয়ে এই পত্রিকা একটি জরিপ চালিয়েছে এবং এ বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ এবং তথ্য সমগ্র দেশ থেকে সংগ্রহ করেছে। পত্রিকায় বলা হয়েছে যে, আমরা লক্ষ্য করছি অধিকাংশ সন্ত্রাসী রয়েছে বর্তমান সরকারের ছত্রছায়ায়। তাই আমরা মনে করি সন্ত্রাস কমানোর জন্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাহায্য চেয়ে কোন লাভ হবে না। অনেকের অভিযোগ আছে তাকে ঘিরে। .... সাধারণ মানুষ তাহলে শান্তির জন্যে কার কাছে যাবে? এ প্রশ্নের উত্তর প্রধানমন্ত্রীর কাছেও পাওয়া যাবে না। কারণ তার প্রতিও কিছু লোক তাঁর অসংযত আচরণের জন্যে অসন্তুষ্ট। আর এক সংখ্যার পত্রিকায় 'অবিরাম সন্ত্রাস ও মাস্তানির বছর' শিরোনামের রিপোর্টে বর্তমান সরকারের আমলে সন্ত্রাস যে দেশকে সকল দিক থেকে গ্রাস করে ফেলছে সেকথা স্পষ্ট করেই উল্লেখ করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের চার বছরের শাসন সম্পর্কে কলামিষ্ট আব্দুল গফফার চৌধুরী লিখেছেন, 'গত চার বছরে সন্ত্রাস বেড়েছে দশগুনের মতো।' দৈনিক ইত্তেফাক লিখেছে- বিএনপি সরকারের চার বছরের তুলনায় আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে হত্যাকাণ্ড বেড়েছে ২৮০৫ টি, নারী নির্যাতন বেড়েছে ১৮৭৮০টি, শিশু নির্যাতন বেড়েছে ১৭৯৩টি, ধর্ষণ বেড়েছে ৬৪১৪টি, যানবাহন চুরির ঘটনা বেড়েছে ৩৩৯৮টি, দস্যুতা বেড়েছে ২৩৫৪টি। এমনিভাবে সকল বিষয়ে অপরাধ সংঘটনের সংখ্যাধিক্যের কথা তুলে ধরা হয়েছে (যায় যায় দিন, ২৬ ডিসেম্বর ২০০০)।

দেশের মানুষ সব সময়ই শাসক এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের সৃষ্ট সন্ত্রাস এবং তাদের হত্যাকাণ্ডের কারণে সন্ত্রস্ত অবস্থায় বসবাস করছে। তবে এর মাত্রা যে ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে তার দৃষ্টান্ত ইত্তেফাকের রিপোর্টে রয়েছে। সন্ত্রাস এবং হত্যাকাণ্ড, বাড়বার কারণ তারা সব সময়ই আখের গোছাতে এবং নিজেদের ক্ষমতার মসনদ ঠিক রাখতেই পুরো সময় ব্যয় করছে। একদল ক্ষমতায় বসলেই সেই দলকে বিতাড়িত করতে অন্যদলগুলো জোটবদ্ধ হয়ে মাঠে নেমেছে। আর ক্ষমতাসীন দল সব সময়ই বিরোধী দলকে শত্রু ভেবে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাপরায়ণ আচরণ করেছে। ফলে দলগুলো সন্ত্রাসীদের সহযোগিতায় পরস্পরের বিরুদ্ধে বছরব্যাপি সংগ্রামে ব্যস্ত থেকেছে। এমনিভাবে প্রত্যেক দলকেই তাদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে সব সময়ই ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। ক্ষমতাসীন দল নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে এবং রাজনৈতিক অঙ্গন দখলে রাখতে সব সময় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদেরকে ব্যবহার করেছে। এখনও করছে। ফলে ক্ষমতাসীনদের দলীয় সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে তাদের পক্ষে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না । অথচ সমগ্র দেশের মানুষ সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ। এই যখন বাস্তব পরিস্থিতি তখন মানুষ, বিশেষ করে দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মানুষ সন্ত্রাসীদের হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করবার কৌশল নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে। নাটোরে 'বাঁশি-লাঠি' সংগঠন গঠনের মাধ্যমে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় শতভাগ সফল হয়েছেন বলেও জানা গেছে।

www.pathagar.com

গত ৩০ জানুয়ারি ঢাকায় ফিরবার জন্যে নাটোর শহরের একটি বাসের কাউন্টারে আমি টিকিট কেটে অপেক্ষা করছিলাম। তখন দুপুর। ১২ টা বেজে মিনিট কয়েক হবে। এমন সময় হঠাৎ একটি বাঁশি বেজে উঠলো। এরপর একের পর এক অনেক বাঁশি বেজে উঠলো এবং বিরামহীন বেজেই চললো। মুহূর্তেই যেন বাঁশির সমুদ্রে পরিণত হলো রাজপথ। অর্থাৎ একটি বাঁশি বেজে ওঠার সাথে সাথে রাস্তার উভয় পাশের দোকান থেকে অগণিত মানুষ বাঁশি বাজাতে বাজাতে লাঠি হাতে রাস্তায় নেমে ছুটে চললো যেখান থেকে প্রথম বাঁশিটি বাজানো হয়েছিল সেখানে। হঠাৎ এমন একটি নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা হওয়ায় আমি বিস্মিত হইনি। কারণ নাটোরের 'বাঁশি-লাঠি' বিষয়ক কর্মকাণ্ডের কথা আমার পূর্ব থেকেই জানা ছিল। গত রমজান মাসে শিল্পকলা একডেমী আয়োজিত ভ্রাম্যমাণ চারুকলা প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করতে গেলে সে সময় নাটোরের সাংবাদিকবৃন্দ সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্যে রাতে যখন সার্কিট হাউসে মিলিত হন তখন তারা এ বিষয়ে আমাকে অবহিত করেছিলেন। নাটোরের পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার এক পর্যায়ে বলেছিলেন যে, নাটোর শহরকে চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাস মুক্ত করবার লক্ষ্যে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় একজোট হয়ে প্রতিটি দোকানে বাঁশি এবং লাঠি রাখবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কোথাও কোন দোকান কিংবা প্রতিষ্ঠানে চাঁদাবাজ কিংবা সন্ত্রাসী হানা দিলে সেই দোকান থেকে কিংবা প্রতিষ্ঠান থেকে বাঁশি বাজিয়ে দিলে অন্যান্য দোকান থেকে সকলে বাঁশি বাজাতে বাজাতে লাঠি হাতে আক্রান্ত দোকান কিংবা প্রতিষ্ঠানের দিকে ছুটে যাবে এবং আক্রান্ত দোকান কিংবা প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করবে। দলমত নির্বিশেষে সকলে সকলকে সাহায্যের আদর্শকে সামনে রেখেই ব্যবসায়ীরা গড়ে তুলেছেন 'বাঁশি-লাঠি' সংগঠন।

আমার সৌভাগ্যই বলতে হয়, কারণ বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হবার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সংগঠনের সৈনিকেরা বিপদগ্রস্তকে কিভাবে সাহায্য করে থাকেন তা প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পেয়েছি। এবং সাক্ষাৎকারে বর্ণিত বিষয়গুলো অক্ষরে অক্ষরে পালিত হতে দেখেছি। ঐ দিনের পরিস্থিতি শান্ত হলে প্রকৃত অর্থে কি ঘটেছিল জানতে চাইলে টিকিট কাউন্টারের একজন জানালেন যে, পাশেই এক বাড়িতে পারিবারিক কলহের কারণে দু'ভাইয়ের এক ভাই বাঁশি বাজিয়ে দিলে সবাই সেদিকে ছুটে যায়। কিন্তু গিয়ে দেখে সেখানে কোন চাঁদাবাজ বা সন্ত্রাসীর আক্রমণ হয়নি। এরূপ ক্ষেত্রে কি হবে এই প্রশ্ন করলে তিনি বলেন যে, সন্ধ্যায় বিচার বসবে। বিচারে যে দোষী প্রমাণিত হবে তকে আড়াই হাজার টাকা জরিমানা করা হবে। তিনি আরও বলেন যে, সন্ত্রাসী কিংবা চাঁদাবাজদের কেউ কখনো যদি 'বাঁশি-লাঠি' সংগঠনের সদস্যদের লাঠির আঘাতে অসতর্কতাবশতঃ আহত কিংবা নিহত হয় তাহলে তাদের সঙ্গে অর্থাৎ প্রতিপক্ষের সঙ্গে আইনী লড়াইয়ের খরচ মেটানোর লক্ষ্যে সকল দোকান এবং প্রতিষ্ঠানের অর্থে একটি ফাণ্ডও গড়ে তোলা হয়েছে। তার কাছেই জানা গেল 'বাঁশি-লাঠি' সংগঠনের তৎপরতার কারণে নাটোর চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসমুক্ত হয়েছে।

www.pathagar.com

সন্ত্রাস এবং চাঁদাবাজী বন্ধ হলেও নাটোরে নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছে। নাটোর শহর ও শহরতলী এলাকায় প্রতি মাসে তিন কোটি টাকার মাদকদ্রব্য কেনাবেচা হচ্ছে। হেরোইন, ফেনসিডিল, গাঁজা, চুয়ানি এবং বাংলা মদের প্রতি নাটোরের মানুষ ব্যাপকভাবে আসক্ত হয়ে পড়ছে। ফলে বাঁশি-লাঠি সংগঠনের সদস্যবৃন্দ 'মাদক নির্মূল' তথা মদ, গাঁজা ফেনসিডিলসহ যাবতীয় মাদক সেবন বন্ধের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে সমগ্র শহরে বাঁশি-লাঠি সংগঠনের সদস্যবৃন্দ মহড়াও দিয়েছেন। সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজ দমনের পাশাপাশি মাদক বিক্রয় এবং মাদক সেবনকারীদের দমনের ক্ষেত্রেও সফল হবেন বলে তারা দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

নাটোর শহরের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সন্ত্রাস, চাঁদাবাজ এবং মাদকমুক্ত করবার এ প্রয়াসকে অভিনন্দিত করতেই হয়, কারণ সমগ্র দেশ যখন সন্ত্রাস, চাঁদাবাজ আর মাদকদ্রব্যে ছেয়ে গেছে, অত্যাচারে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে এবং এদের কর্মকাণ্ড, এদের অত্যাচার যখন সমাজ জীবনকে কলুষিত করছে, মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপনকে প্রতিনিয়ত বিপর্যস্ত করছে, সরকার এবং সরকারের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভাগগুলো যখন চরম ব্যর্থতার পরিছয় দিচ্ছে এবং নির্বিকার ভূমিকা পালন করছে, তখন এই উদ্যোগ গ্রহণ করা শহরবাসীর জন্যে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এই উদ্যোগ গ্রহণ করায় নাটোর শহরের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের জীবনে সুখ-শান্তি এবং স্বস্তি ফিরে এসেছে।

মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বীরভূম এবং বর্ধমানসহ অর্ধবঙ্গ, যে নাটোরের অধীন ছিল, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে নাটোরের যে রাণী রাজভাণ্ডার খুলে দিয়ে অগণিত মানুষের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন, গরীব, দুঃস্থ, বিধবা এবং শিক্ষার্থীদের অকাতরে যিনি সহায্য সহযোগিতা দিয়েছিলেন, অসুস্থ প্রজাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চিকিৎসকদেরকে চিকিৎসা প্রদানে এবং বনের পশুপাখির জন্যে খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন, সেই অন্নপূর্ণা রাণী ভবানীর নাটোর এবং নাটোরবাসীর এই অনুকরণীয় মহৎ উদ্যোগ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে অত্যাচারিত, নিপীড়িত এবং বঞ্চিত মানুষদেরকেও অনুপ্রাণিত করেছে। ফলে খোদ ঢাকা শহরের পশ্চিম কাফরুলের ব্যবসায়ীরাও নাটোরের 'বাঁশি-লাঠি' সংগঠনের অনুকরণে সমিতি গঠন করেছে এবং ইতিমধ্যে কার্যক্রমও শুরু করেছে বলে পত্র-পত্রিকায় খবর পরিবেশন করা হয়েছে। এই প্রবন্ধ যখন শেষ করছি তখন পত্রিকার খবরেই জানতে পারলাম সাভারেও একইভাবে 'বাঁশি-লাঠি' সংগঠন গঠন করা হয়েছে। সমগ্র দেশের মানুষ আজ'বাঁশি-লাঠি'সংগঠন গঠনের কথা ভাবতে শুরু করেছেন। কাঁচা গোল্লা, বনলতা সেন এবং রাণীভবানী খ্যাত নাটোরের 'বাঁশি-লাঠি সংগঠন সমগ্র দেশবাসীর মধ্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, যে চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছে এবং ইতিমধ্যেই যেভাবে বিভিন্ন স্থানে সংগঠন গঠনের তৎপরতা শুরু হয়েছে, জনগনের হৃদয়ে জাগানো সেই আলোড়ন, সেই উন্মেষ এবং তৎপরতা তথা বাঁশি-লাঠির উত্থান যেনো অন্ধকারে আশার আলো। জনগণের এই ভাবনা, জনগণের এই চেতনাকে আমি আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। কারণ আমার বিশ্বাস শুধু ব্যবসায়ীদের মধ্যেই এই উদ্যোগ সীমাবদ্ধ থাকবেনা। বাঁশি-

www.pathagar.com

লাঠি সংগঠন সমগ্র দেশে সকল স্তরেই গঠিত হবে এবং সমগ্র দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে। আর যেদিন বাঁশি-লাঠি সংগঠনের সাহসী সদস্যবৃন্দ এই দুরূহ কাজটি করতে সক্ষম হবেন সেদিন অযোগ্য, সন্ত্রাসী, স্বৈরাচারী সরকার এবং সরকারের মসনদ রক্ষাকারী পুলিশ বাহিনীর দিনও শেষ হবে। সেদিন বাঁশি-লাঠি সংগঠনের সৎ, সাহসী এবং শান্তিকামী সৈনিকদের সদস্যের সমন্বয়েই গঠিত হবে জাতীয় সরকার। যাদের সুশাসন এবং বুদ্ধিদীপ্ত কর্মপদ্ধতির মধ্যদিয়ে শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের বাংলা হবে প্রকৃত সোনার বাংলা। ১৯-৩-২০০১।

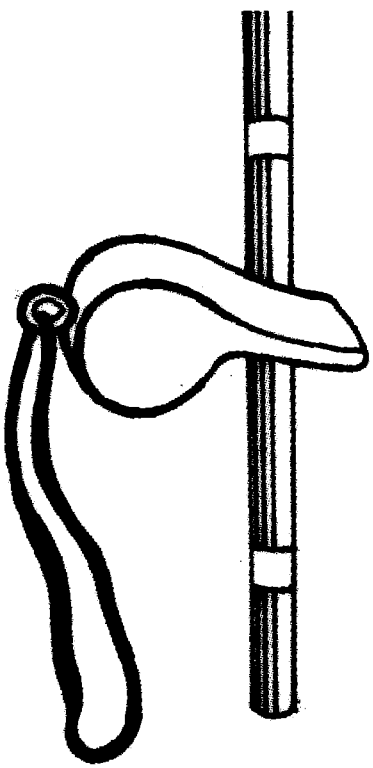

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়ক সরকারঃ নির্বাচন পরিচালনার জন্য নয়, দেশ পরিচালনার জন্য হোক

বিগত কিছুদিন থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে সমগ্র দেশে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে চলেছে অবিরাম ধারায়। যেনো এর আর শেষ নেই। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে বিরোধী দলসমূহ সংসদ বর্জনসহ ব্যাপক ধ্বংসত্মক আন্দোলনে লিপ্ত রয়েছে। তাদের দাবির প্রতি সরকারি সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে দেশের শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষকে অশান্ত করে তুলেছে। লাগাতার হরতাল ও অবরোধের মাধ্যমে তাদের গৃহবন্দী করেছে। নির্বিচারে নির্দ্বিধায় জাতীয় সম্পদ ধ্বংস করে চলেছে। ব্যাপক ভাংচুরের মাধ্যমে জনমনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। বিরোধী জোটের ভাষায় এসবই হচ্ছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। বিরোধী দলীয় জোট বলছে- দেশের সর্বস্তরের মানুষ তাদের এই দাবির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছে। বিরাট বিরাট জনসমাবেশের ব্যবস্থা করে, সমাবেশে বিভিন্ন কৌশলে লোক উপস্থিত করে তাদেরকে দেখিয়েই তারা একথা বলছে। পক্ষান্তরে ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকার বলছে- নব্বুইয়ের সকল রাজনৈতিক দল মিলে সর্বস্তরের স্বতঃস্ফূর্ত জনগণের সমর্থনে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই গণতন্ত্রের প্রতি অযৌক্তিক আন্দোলনের মাধ্যমে অশ্রদ্ধা দেখানো প্রকৃত অর্থে দেশের গণতন্ত্রপ্রিয় সকল নাগরিকের প্রতিই অশ্রদ্ধা দেখানোর সামিল। বিরোধী জোট সরকারের এই যুক্তির বিরুদ্ধে পাল্টা যুক্তি দেখিয়ে বলছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নেতৃত্বে নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও তারা স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারকেও হার মানিয়েছে। আওয়ামী লীগ নেত্রী অহরহই বলছেন- বিএনপি সরকার লুটপাটের সরকার। বলছেন- এ সরকার ভোট চোর সরকার। এমনি ভাবেই চলছে সরকার এবং বিরোধী জোটের বিবৃতি এবং পাল্টা বিবৃতি। এই বিবৃতি এবং পাল্টা বিবৃতির কারণে দেশের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কিন্তু এবিষয়ে কারও কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। যার যার অবস্থান বরং আরও সুদৃঢ় করে চলেছেন। সমাধানের কোন লক্ষণ নেই। ঠিক এমনি পরিবেশে, এমনি একটি নাজুক মুহূর্তে দুনেত্রীর বিরোধ মেটাতে ত্রাতারূপী বিদেশী দেবদূতের আগমন ঘটেছে বাংলাদেশে। এই দেবদূতরূপী কমনওয়েলথ প্রতিনিধি নিনিয়ান তাঁর শান্তির পাখা বিস্তার করেছেন দুর্যোগপূর্ণ বাংলার আকাশে। পাখার কোমল পরশে গুমোট আবহাওয়া দূরীভূত হবে এই

www.pathagar.com

অভিলাষে। কিন্তু ইতিমধ্যেই শান্তির দেবদূতের আগমনে বিভিন্ন মহল থেকে ব্যক্ত হয়েছে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। দুই নেত্রীকে ধিক্কার জানিয়ে বলা হয়েছে বিদেশী দেবদূতের মধ্যস্থতা একটি স্বাধীন জাতির জন্য লজ্জাজনক। জাতি এর দায়ভার বহন করবেনা ইত্যাদি। যে দেশের নেতা-নেত্রী নিজেদের সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতার পরিচয় দেন, সমাধানের জন্য বিদেশী মোড়লদের ডেকে এনে দেশ শাসনে নিজেদের অযোগ্যতা প্রমাণ করেন সেদেশের জনগণের জন্য তা লজ্জাস্করই বটে। তবে এতটা উন্নাসিক হবার মত বিষয় বোধহয় নয়। কারণ যে দেশ বিদেশী প্রভুদের সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া অচল, যে দেশের মানুষ বিদেশী বেনিয়াদের দেয়া ভিক্ষের টাকায় প্রতিপালিত হয়, সেদেশের মানুষের অতটা উন্নাসিক হবার যুক্তি নেই। বিভিন্ন দেশের এনজিও নামের বিভিন্ন সংস্থা ও বিদেশের ভিক্ষের টাকায় উদরপূর্তিতে অভ্যস্ত যে দেশের মানুষ কর্মবিমুখ ও বিকলাঙ্গপ্রায়, সে দেশের মানুষের এত বেশী মান-মর্যাদাবোধ থাকাটা স্বাভাবিক নয়। আর স্বাভাবিক নয় বলেই আত্মমর্যাদাহীন জনগোষ্ঠীর দেশে যে কোন উছিলায় বিদেশী অনুপ্রবেশ নির্বিঘ্ন হয়। আত্মসচেতন এবং আত্মবলে বলীয়ান হতে না পারলে এইভাবেই আত্মসম্মান এবং জাতীয় সম্মানকে বলি দিতে হয়।

বর্তমানে সমগ্র জাতির যে নাজুক অবস্থা তাতে এই জাতীয় মর্যাদার বলিদানকেও হয়তোবা মেনে নেয়া যায়, যদি যে কারণে বলিদান তার প্রকৃত সমাধান হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচেছ-সমাধান হবে কি? অনুমান করা যায় এর সহজ এবং সংক্ষিপ্ত উত্তর হবেনা। কমনওয়েলথ মহাসচিবের বিশেষ দূত ও তাঁর সহযোগীদের আগমনে অনেকেই দিবাস্বপ্ন দেখতে পারেন। ভাবতে পারেন দেশে এই বুঝি শান্তির বন্যা বইতে শুরু করলো। বাঙালি জাতির আর কোন সমস্যা থাকবে না। শুধুই শান্তি আর উন্নতি। শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি। দিবাস্বপ্ন হলেও অনেকেই দেখছেন এই স্বপ্ন। দরজা-জানালা ও ফাঁক-ফোকর বন্ধ করে যারা রুদ্ধদ্বার বৈঠক করছেন তারা দেখছেন। তাদের দলীয় সমর্থকরা দেখছেন। তাদের স্তাবকেরাতো রীতিমত ডুগডুগি বাজিয়ে এই স্বপ্নের কথা প্রচার করছেন। শুধু তাই নয় এক ডিগ্রী বাড়িয়ে এও প্রচার করছেন যদি তাদের এই স্বপ্ন সার্থক না হয় তাহলে তা ক্ষমতাসীন সরকারের কারণেই হবে না। এক্ষেত্রে যত দোষ হবে তার সবটাই ঐ নন্দঘোষের। দোষ নন্দঘোষেরই হোক বা অন্য যে কারই হোক সমস্যার যে সমাধান হবে না সেইটিই মোদ্দা কথা। আর যদি কোন অলৌকিক কারণে সমাধান হয়ও, অর্থাৎ সকলে মিলে যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনে সম্মতও হয় তাহলে তাতে জাতির কি লাভ? কেউ কি বলতে পারেন এইরূপ ঐকমত্যের মাধ্যমে জাতি কিভাবে লাভবান হবে? জাতীয় জীবনে কোন অলৌকি শক্তিবলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে? সুখ, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতার প্রতিষ্ঠা কি তত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হলেই হবে? এই সব পশ্নের উত্তরেও নির্দ্বিধায় বলা যায় 'না'। হবে না। হবে না এই জন্য যে, তত্ত্ব বধায়ক সরকারের অধীনে অত্যন্ত সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে দেশে একটি সার্থক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও বলা হয়েছে- নির্বাচনে সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে। বলা হয়েছে- বিএনপি সরকার এই নির্বাচনে

www.pathagar.com

সুক্ষ্ম কারচুপির মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছে। ক্ষমতায় এসে লুটপাটের সরকারে পরিণত হয়েছে। এই সরকার স্বৈরাচার এরশাদ সরকারকেও হার মানিয়েছে। বলা হয়েছে- ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকার ভোট চোর সরকার। এমনি আরও অনেক বিশেষণে বিশেষিত করছেন বর্তমান সরকারকে। আওয়ামী লীগের এই সুরের সাথে কণ্ঠ মিলিয়েছে জাতীয় পার্টি এবং জামায়াত। ফলে ত্রিকণ্ঠের মিলিত সুর উচ্চ কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে। যদিও এই ত্রিকণ্ঠী কোরাসের সুরে কোন শ্রুতিমধুর ঐক্য নেই। আছে স্ব স্ব দলের স্বার্থোদ্ধারের গোপন বাসনা। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীদের হৃদয়ে লালিত এই গোপন বাসনাই আমাদের জাতীয় জীবনে মূল সমস্যা। বিরোধী ত্রিদলীয় জোটের আন্দোলনই প্রমাণ করছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের মাধ্যমে কোন দল ক্ষমতাসীন হলেই সে দলের নেতা-নেত্রী, কর্মী ও সমর্থকরা সৎ প্রমাণিত হয় না। প্রমাণিত হয় না যে তারা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যোগ্যতর দল। তাহলে? তাহলে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্বাচনের ফলাফল নিষ্ফল প্রমাণিত হচ্ছে তার জন্য এত লম্ফঝম্প কেন? কেন স্তাবক বুদ্ধিজীবীরা পর্যন্ত কোমরে গামছা বেঁধে এই নিষ্ফল লম্পঝম্পে শরিক হয়েছেন? এই আন্দোলনে শরিক কেউ কি বলতে পারবেন যে, আর একবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হলেই দেশের সকল রাজনৈতিক দল ও দলের সদস্যবৃন্দ রাতারাতি নির্লোভ ও সৎ হয়ে যাবে? দেশ স্বর্গে পরিণত হবে। দেশের মানুষ স্বর্গসুখ অনুভব করবে। বলতে পারবেন আন্দোলনরত যে কোন দল ক্ষমতায় বসলে অন্যসব বিরোধী দল কর্তৃক এককভাবে সেই ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ উত্থাপিত হবে না? সেই দলকে উৎখাতের জন্য একই কৌশলে আন্দোলন হবে না? যদি তা বলতে না পারেন তাহলে কেন এই আন্দোলন? কেন এই আন্দোলনের প্রতি নির্লজ্জ সমর্থন?

বাংলাদেশের নির্দলীয় খেটেখাওয়া সাধারণ মানুষ এই নিষ্ফল আস্ফালনের আন্দোলন সম্পর্কে মোটেও উৎসাহী নয়। কারণ আন্দোলনরত ক্ষমতাহীন তিন দল এবং ক্ষমতাসীন দল সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণরূপে সচেতন। এ দেশের মানুষ আওয়ামী লীগের শাসন দেখেছে। জাতীয় পার্টির শাসনও দেখেছে। দেখেছে এবং দেখছে বিএনপির শাসন। বাকি রয়েছে জামায়াতের শাসন। তবে কার্যকলাপ, হুমকি-ধমকি ও বক্তব্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে জামায়াতের যে প্রকৃত স্বরূপ জনসমক্ষে উন্মোচিত হয়েছে তাতে জনগণ তাদের শাসনের স্বাদ পেতে খুব একটা আগ্রহী নয়। সুতরাং এ পরীক্ষিত এবং ব্যর্থ প্রমাণিত দলগুলোরপ্রতি মানুষের কোন প্রকার উৎসাহ থাকাটা স্বাভাবিক নয়। এই সমস্ত দল নীতি ও আদর্শহীন, নীতি ও আদর্শচ্যুত দল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। যে সমস্ত দলের দলীয় স্বার্থ রক্ষার্থে লাঠিয়াল বাহিনীর প্রয়োজন হয় এবং তাদের সৃষ্ট সন্ত্রাসের প্রয়োজন হয় সে সমস্ত দল সুস্থ দল নয়। যে সমস্ত দল দলীয় স্বার্থে নিঃসঙ্কোচে দলীয় সমর্থক, ছাত্র, যুবকদের হাতে অবৈধ অর্থ ও আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দেয়, চাঁদাবাজিসহ অন্যান্য অসৎ কাজে সহায়তা করে তারা শান্তিপ্রিয় দল নয়। যে সমস্ত দল এইরূপ লাঠিয়াল , অর্থ ও আগ্নেয়াস্ত্রসমৃদ্ধ চাঁদাবাজ অসৎ সমর্থকদের জাতির ভবিষ্যত নেতা বলে আখ্যায়িত করে এবং ভবিষ্যতে জাতির

www.pathagar.com

হাল ধরতে উৎসাহিত করে তারা দেশের কল্যাণমূলক দল নয়। এরূপ রাজনৈতিক কোন দলের দ্বারা যে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না তা বলাই বাহুল্য। যারা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা চাঁদা তুলে অবৈধ পথে উপার্জনের মধ্যমে রাজনৈতিক জীবন শুরু করে তারা ক্ষমতায় গেলে লক্ষ কোটি টাকয় সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। তারা গোটা দেশকেই আত্মসাত করতে উদ্যত হয়। এ দেশের শাসন ব্যবস্থা সাধারণ কম্বল চুরির মধ্য দিয়ে শুরু হলেও বর্তমান আকাঙ্ক্ষা সেখানেই সীমাবদ্ধ নেই। বর্তমানে পুরো ব্যাংকসুদ্ধ লোপাটের ঘটনা ঘটছে। ভবিষ্যতে পুরো দশেটাই যে হজম করে ফেলবে না তার নিশ্চয়তা কি?

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বর্তমানে গোটা দেশের শাসন ব্যবস্থার সর্বত্রই ঘুনে ধরেছে। ভেতরে ভেতরে কুরে কুরে খেয়ে জাতির পুরো কাঠামোকে দুর্বল করে ফেলেছে। রাজউকের তত্ত্বাবধানে নির্মিত হেলেপড়া, ধসে পড়া বহুতল বিশিষ্ট ভবনই এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই বহুতল ভবনের মতই ঘুণে খাওয়া গোটা জাতির জাতীয় কাঠামো যে কোন মুহূর্তেই ধসে পড়তে পারে। আর একবার যদি ধসে পড়ে তাহলে কারও পক্ষেই এই জাতিকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। গোটা জাতির অবস্থা হবে ঐ হেলেপড়া ধসেপড়া নড়বড়ে ইমারত বা অট্টালিকার মত। অবস্থা হবে দরজা জানালা, ইট, লোহা, খুলে নেওয়া ইমারতের ধ্বংসস্তূপের মত। এহেনো সম্ভাবনাময় জাতির জন্য এই মুহূর্তে প্রয়োজন এমন একটি সরকার যে সরকারের সদস্যবৃন্দ হবেন আক্ষরিক অর্থেই সৎ, বিদ্যা-বুদ্ধিতে তীক্ষ্ণ, ব্যক্তিজীবনে নির্লোভ, নিরপেক্ষ এবং অতি অবশ্যই নির্দলীয়। যাদের থাকবে না কোন ছাত্রফ্রন্ট, থাকবে না কোন যুবফ্রন্ট। থাকবে না কোন অস্ত্রধারী সন্ত্রাসবাদী ও লাঠিয়াল বাহিনী। থাকবে না দালাল বাহিনী। যার ফলে সহজেই তাদের পক্ষে দূর করা সম্ভব হবে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অসঙ্গতি। পুনর্গঠিত করা সম্ভব হবে ঘুণে ধরা দুর্বল রাষ্ট্রীয় কাঠামোগুলি। প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে জাতীয় আদর্শ ও ন্যায় নীতি। যে নীতি ও আদর্শের পথে পরিচালিত হবে রাজনৈতিক দল। যে নীতি ও আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হবে সকলের আকাঙ্ক্ষিত সুন্দর, সুস্থ, আদর্শবাদী রাজনৈতিক সরকার। এমন একটি সরকার প্রতিষ্ঠায় যে সরকার সহয়তা দিতে পারে উপরে উল্লিখিত সেই সরকারের রূপরেখা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাঠামোতেই নিহীত আছে। যে তত্বাবধায়ক সরকার সবচেয়ে কঠিনতম এবং সমস্যাবহুল নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম, সে সরকার যে দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রেও সক্ষম হবে তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং নির্বাচন পরিচালনার জন্য নয় দেশ পরিচালনার জন্য অন্তত আগামী কয়েকটি টার্ম এর জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে এই সুযোগ করে দেওয়া উচিত। দেশের স্বার্থেই তা করা উচিত। কারণ এদেশের হাড্ডিসার মানুষ তাদেরকে নিয়ে, তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আর কোন দল কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হোক তা চায় না। কারণ তাতে তাদের হাড্ডি ক'খানার অস্তিত্ব বিপন্ন হবার সম্ভাবনাই অধিক। তারা চান এদেশের হাড় জিরজিরে মানুষগুলো শিল্পী এস. এম. সুলতানের পেশীবহুল বলিষ্ঠ মানুষে পরিণত হোক। তারা চান বাংলাদেশ প্রকৃত অর্থেই জয়নুল ও সুলতানের স্বপ্ন সোনার বাংলায় রূপান্তরিত হোক।

www.pathagar.com

এই মুহূর্তে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শান্তির দূত সমন্বয়ে চলছে পঞ্চমুখী আলোচনানুষ্ঠান। দূতের অভিপ্রায় অজ্ঞাত থাকলেও প্রকৃত অর্থে সকলেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি আস্থাশীল। এবং শ্রদ্ধাশীলও বটে। যদি তাই হয়, যদি সাধারণ মানুষের উন্নয়নই স্বপ্ন হয়, তাহলে সকলে মিলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনকেই চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করুন। তবে এই অনুমোদন নির্বাচন পরিচালনার জন্য নয়, দেশ পরিচালনার জন্য করুন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন পরিচালনার জন্য নয়, দেশ পরিচালনার জন্য হোক। ২৫-১০-১৯৯৪।

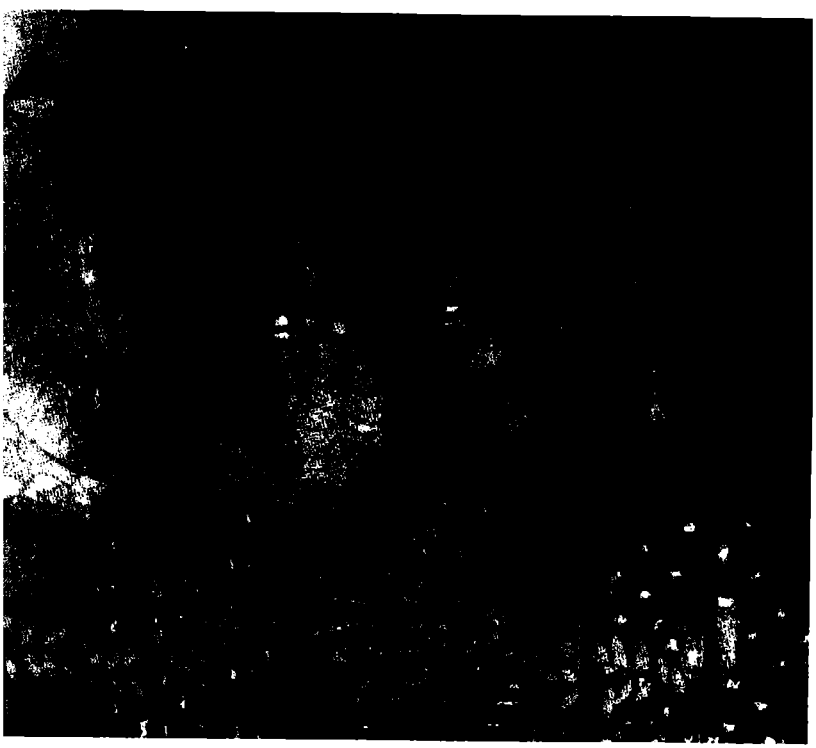

www.pathagar.com

এই শয়তানদের বিচার হবে কি?

ভূতপ্রেতদের অস্তিত্বের কথা শিল্প-সাহিত্যে থাকলেও বাস্তবে নেই বলেই অনেকের অভিমত। তবে শয়তান যে আছে সেকথা ধর্মেই স্বীকার করা হয়েছে। ইসলাম, খ্রীষ্টান এবং ইহুদি শাস্ত্রমতে আল্লাদ্রোহী দেবদূত বা ফেরেশতাকেই শয়তান বলা হয়েছে। যেমন ইবলিস। কিন্তু এই ইবলিস শয়তান ছিল না। আল্লার আজ্ঞাবহ জ্যোতির্ময় সত্তার অধিকারী ফেরেশতাই ছিল । কিন্তু পরবর্তীতে মাটির তৈরি আদমকে অহংকারবশত অসম্মান করবার অপরাধে তথা আল্লাহর আজ্ঞাদ্রোহিতার অপরাধে ফেরেশতা ইবলিস শয়তানে পরিণত হয়। এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য ধর্ম বিষয়ে জ্ঞানদান নয়। উদ্দেশ্য শয়তানের স্বরূপ নির্ণয়। এখানে শয়তান সম্পর্কে যে চিত্রটি চিত্রিত হয়েছে তাতে বিশেষ কতগুলো বিষয়কে সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করা যায়। যেমন-১. যার দ্বারা সৃষ্ট, যিনি সর্ববিষয়ে কর্তৃত্বের অধিকারী তাকে অমান্য করা। ২. অহংকারবশে নিজেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা। ৩. পরশ্রীকাতরতা। ৪. ধ্বংসাত্মক কাজে আত্মনিয়োগ করা এবং অন্যকেও ধ্বংসের পথে টেনে আনা। ৫. মানুষকে প্রলুব্ধ করে নিজের দলভূক্ত করা এবং এর মধ্য দিয়ে তাদেরকে নরকে নিক্ষেপ করবার সর্বব্যবস্থা নিশ্চিত করা। এই চিহ্নিত বিষয়সমূহই শয়তানের কাজ। এখানে লক্ষণীয় যে, উল্লিখিত পাঁচটি বিষয়ের একটিও সত্বগুণসম্পন্ন নয়।

শয়তানের প্রধান দায়িত্বই হচ্ছে মানুষকে সত্ত্বগুণসম্পন্ন হতে না দেয়া। অর্থাৎ মানুষকে নানাভাবে অসৎ কাজে প্রলুব্ধ করার মধ্য দিয়ে বিপথে পরিচালিত করা। সহজে সম্ভব না হলে ছলে, বলে, কৌশলে হলেও কাজটি সম্পন্ন করা। এই কাজ করবার শক্তি শয়তানের রয়েছে। অর্থাৎ মানুষকে বিপথগামী করবার ক্ষেত্রে শয়তানের রয়েছে অসীম ক্ষমতা। সামান্য অসতর্কতার কারণে একজন সহজ, সরল, সৎ মানুষ মুহূর্তেই শয়তানের খপ্পরে পড়ে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। ধ্বংস হচ্ছেও। কারণ শয়তানদের সহজে চিহ্নিত করা যায় না। তারা ভদ্রবেশে, বন্ধু সেজে, সমাজপতির বেশে, সাহায্য ও সমাজ উন্নয়নের নামে, ব্যবসা-বাণিজ্যের নামে, কখনও কখনও পীর এবং দানবীর সেজে এবং এমনি আরও শতেকরূপে আভির্ভূত হয়ে কাজ করে থাকে বলে তাদের আসল চেহারাটি, তাদের প্রকৃত রূপটি ধরা পড়ে না। কিন্তু যখন ধরা পড়ে তখন আর করবার কিছুই থাকেনা। এমনিভাবে. আমাদের সমাজের ভাল মানুষরূপী শয়তানদের কারসাজিতে ধ্বংস হয়ে চলেছে সমাজ, সংস্কৃতি ও সমাজের অগণিত সরলপ্রাণ নর-নারী। আজকের আলোচনা পূর্বে উল্লিখিত ৪ নম্বর বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। কারণ সম্প্রতি একটি দৈনিকের শেষ পৃষ্ঠার

www.pathagar.com

ভেতরের অংশে এমনি একটি বিষয়ের খবর পরিবেশিত হয়েছে। বলা যায়, বড় অনাদরে এবং গুরুত্বহীনভাবেই পরিবেশিত হয়েছে খবরটি। কিন্তু খবরটি মোটেও গুরুত্বহীন নয়। বরং অত্যন্ত ভয়ংকর খবর। যে খবরটি আরও ব্যাপক প্রচারের দাবি রাখে। কারণ একশ্রেণীর মানুষের ব্যবসার নামে ফেঁদে বসা শয়তানের আখড়া সম্পর্কে দেশের সকল স্তরের মানুষ বিশেষ করে তরুণী ও যুবতীদের ভালভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। খবরটি কিশোরগঞ্জের হলেও এমন ঘটনা দেশের আর কোথাও যে ঘটতে পারে না বা ঘটছে না তা হলফ করে বলা যায় না। 'ফটো স্টুডিওতে ৭১ জন ছাত্রী ও কিশোরীর শ্লীলতাহানী'। এই ছিল খবরের শিরোনাম। যার মর্মার্থ হলো- কিশোরগঞ্জের একটি ফটো স্টুডিওর অভ্যন্তরে প্রয়োজন এবং সখের বশে ফটো তুলে যাওয়া ৭১ জন স্কুল-কলেজের ছাত্রীসহ কিশোরী ও যুবতীর শ্লীলতাহানী ঘটানো হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে করিমগঞ্জ থানা সদরের খান স্টুটিওতে। ফটো তুলতে যাওয়া তরুণী-যুবতীদের ভোগ করতে স্টুডিওর লোকজন শয়তানের প্রলুব্ধকরণের যাবতীয় কৌশল প্রয়োগ করে তাদেরকে ভোগ করেছে। ফুসলিয়ে না পারলে বলপ্রয়োগ করেছে। বলপ্রয়োগে সম্ভব না হলে ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছে। ফান্টা বা মিরিণ্ডার সাথে অতিরিক্ত ঘুমের বড়ি খাইয়ে অচেতন বা অর্ধচেতন অবস্থায় তাদের শ্লীলতাহানী করেছে। শুধু তাই নয়, শ্লীলতাহানীকরণ অবস্থায় তাদের নগ্ন ছবি তুলে রেখেছে এবং সেই ছবি দিয়ে স্টুডিওর ব্যক্তিবর্গ প্রয়োজনমত ব্ল্যাকমেইলের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে ঐ ৭১ জন ছাত্রী, তরুণী ও যুবতীকে ব্যবহার করে তাদের কুৎসিত বাসনাকে পূর্ণ করেছে। চির বিনম্র ও সলজ্জ স্বভাবজনিত কারণে, মানসম্ভ্রম খোয়ানোর ভয়ে এবং কলংকের বোঝা এড়িয়ে চলতে নির্যাতিত মেয়েরা মানুষরূপী শয়তানদের অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করেছে। সহ্য করেছে অব্যক্ত বেদনার কথা। নিরুপায় হয়ে দাবি মিটিয়েছে তাদের। কিন্তু শয়তানদের কর্ণকুহরে মেয়েদের নিঃশব্দ আর্তচিৎতকার প্রবেশ করেনি। তারা অনুভব করেনি তরুণীদের হৃদয়ের গভীর থেকে উত্থিত অব্যক্ত বেদনার আহাজারি। শয়তানের যথার্থ কর্মই করেছে তারা। নির্বিঘ্নে চলছিল তাদের এই কর্ম। কিন্তু বাদ সেধেছে করিমগঞ্জ গ্রামের সাহসী জিলু মিঞা। তার শ্যালিকা উক্ত স্টুডিওতে ছবি তুলতে গেলে ফটোগ্রাফার তার অন্যান্য সহযোগীদের সহযোগিতায় জোরপূর্বক তার শ্লীলতাহানী করে এবং যথানিয়মে তার নগ্ন ছবিও তোলে। জিলু মিঞা এ বিষয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে উক্ত ফটোগ্রাফারের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পাশবিক নির্যাতনের ৭১ টি নেগেটিভ পজেটিভ উদ্ধার করে এবং এ বিষয়ের সাথে জড়িত থাকার দায়ে একজনকে গ্রেফতার করে। বিষয়টি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় এলাকার সর্বস্তরের মানুষ আক্রোশে ফেটে পড়ে এবং এর বিচার বিভাগীয় তদন্তসহ দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি দাবি করে।

উপরে চিত্রিত শয়তানদের অপকর্মের চিত্রের প্রেক্ষিতে কি পাঠক হৃদয়ে আলো ঝলমলে রাজধানী ঢাকা শহরের উপর মহলের অভিজাত শ্রেণীর ভিন্ন পেশায় নিয়োজিত এক ব্যবসায়ী, ফেরেস্তাতুল্য চেহারা সুরতের অধিকরী ধনাঢ্য ব্যক্তির চিত্রটি ভেসে উঠছেনা? নিশ্চয়ই উঠছে। সবার না হলে কারও কারও হৃদয়ে সেই হৃদয়বিদারক ঘটনার চিত্র ভেসে

www.pathagar.com

উঠবেই। জানা যায়, একাত্তুরে স্বাধীনতা যুদ্ধে তার ন্যক্কারজনক ভূমিকার কারণে মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা ধৃত হলে সে সময় দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রভাবশালী মহলের হস্তক্ষেপে সে যাত্রা তিনি রক্ষা পেয়ে যান। কিন্তু ঐ যে কথায় বলে, যে একবার শয়তান সে সব সময়ই শয়তান। প্রথমবার তার অপকর্মের অপরাধ থেকে নিস্কৃতি পেয়েই পুনরায় পূর্ণদ্যোমে অপকর্মে লিপ্ত হন এবং তারপর অপকর্মের জাল বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিস্তৃত করেন। এর মধ্যে নারী কেলেংকারী অন্যতম। চাকরি ও অর্থের প্রলোভনসহ নানাভাবে তিনি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীসহ বিভিন্ন স্তরের যুবতীদের প্রলুব্ধ করে একের পর এক তাদের সর্বস্ব লুটে নিতে থাকেন। একপর্যায়ে স্টুডিও শয়তানদের মত তার শয়তানিও ফাঁস হয়ে যায়। পত্রপত্রিকায় সচিত্র প্রতিবেদনসহ তার বিরুদ্ধে নানাবিধ অভিযোগ উঠতে থাকে। অবস্থা বেগতিক দেখে শেষাবধি দেশ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন তিনি।

রাজধানী ঢাকা থেকে এবার দেশের গ্রাম-গঞ্জের প্রত্যন্ত এলাকার দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। সেসব অঞ্চলেও একই দৃশ্য। বরং আরও করুণ ও মর্মান্তিক দৃশ্য। শহরে শিক্ষিত অভিজাত মেয়েরা নির্যাতনের শিকার হলেও বেঁচে যায় এজন্য যে তাদের নিয়ে কেউ বড় বেশি মাথা ঘামায় না। ফলে তাদের নির্যাতন ও লাঞ্ছনার খবরগুলো (ব্যতিক্রম ছাড়া) গোপনই থেকে যায়। কিন্তু গ্রামের সাধারণ ঘটনাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে, দুর্নাম রটিয়ে ভিন্নরূপ দেয়া হয়। নির্যাতিত মেয়ে হলে তো তাকে এবং তার গোটা পরিবারকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হয়। একশ্রেণীর অজ্ঞ ও অশিক্ষিত ফতোয়াবাজদের দেয়া ফতোয়ার কারণে প্রকাশ্যে দেয়া শাস্তি কারও কারও জন্যে মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফতোয়াবাজ এবং তার অনুসারীরা অভিযুক্ত মেয়েকে ভূত-প্রেত বা শয়তানের সঙ্গী হিসেবে কঠোর শাস্তি প্রদান করে থাকে। অথচ অন্যায় ফতোয়ার কারণে যে মেয়েটি আত্মবলী দেয় সেই মেয়েটিকে কলংকিত করবার জন্যে পুরুষরূপী যে শয়তানটি প্রকৃত অর্থে দায়ী তাকে রাখা হয় ধরাছোঁয়ার বাইরে। আর এমনিভাবেই শয়তানদের প্রভাব প্রতিপত্তি দিন দিন বাড়তেই থাকে এবং তারা সেই সুযোগে সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মকে এমনিভাবেই কলূষিত এবং ধ্বংস করে চলে।

এক সময় প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধমতে বিশ্বাসী প্রোটেস্টান্ট এবং ক্যাথলিকদের মধ্যে ধর্মগত দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়। তখন প্রোটেস্টান্টদেরকে ডায়নীর মায়া ডাকিনীবিদ্যা দ্বারা প্রভাবিত মনে করা হতো। এজন্যে প্রোটেস্টান্টদের বিরুদ্ধে ধর্মগত অপরাধ তদন্তের জন্যে রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের দ্বারা বিচার সভা গঠিত হয়েছিল। বিচারে বহু প্রোটেস্টান্ট এবং ইহুদিকে ফাঁসি দেয়া হয়। ১৫২০ সালে অংকিত একটি চিত্রে লক্ষ্য করা যায় যে, বিচার সভা কর্তৃক কেবল সন্দেহের বশে একটি মেয়েকে গাছের ডালে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেয়া হয়েছে। বিচারের রায়ে বলা হয়েছে- দৈত্য, পিশাচদের সঙ্গে বসবাসই যখন তার ইচ্ছে তখন তাদের কাছেই পাঠিয়ে দেয়া হোক। ১৪৭৫, ১৪৯৩ এবং ১৫২০ সালে অংকিত মৃত্যু এবং শয়তানের দ্বারা প্রলুব্ধকরণের দৃশ্য সংবলিত কাঠখোদাই চিত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত শিল্পী ডুরার এবং হ্যান্স হলবেইন দি ইয়ংগার-এর চিত্র সর্বাধিক

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ এবং বিখ্যাত। শয়তান, ভূত-প্রেত ও ডাকিনী-যোগিনীদের প্রলুব্ধকরণ এবং ধর্মযাজকদের দেয়া মৃত্যুদণ্ডের চিত্রগুলো তখনকার ঘটনাবলীকে যুগ যুগ ধরে মানব সভ্যতাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। সে যুগের ধর্মযাজকদের অন্যায় রায় (ফতোয়া) প্রদান এবং আমাদের আজকের সমাজের তথাকথিত ফতোয়াবাজদের ফতোয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আমাদের শিল্পী সমাজ এবং সংবাদপত্র সেকালের মত আমাদের সমাজের এই সমস্ত বিষয়গুলোকে নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরতে পারে। যাতে অন্যায়কারী শয়তানদের কার্যকলাপ জনসম্মুখে প্রকাশিত হয়। ১৪-৫-১৯৯৫।

মৃত্যু কর্তৃক বৃদ্ধকে প্রলুব্ধ করণ

www.pathagar.com

শুদ্ধ-সচেতন পাঠক এবং বাংলাবাজার পত্রিকা

বাংলাবাজার পত্রিকায় ১৬/৯/১৯৯৩ তারিখে প্রথম আমার একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। তখন থেকেই আমি বাংলাবাজার পত্রিকায় লিখে আসছি। উপ-সম্পাদকীয় এবং সাহিত্য উভয় পাতাতেই লিখে থাকি। দীর্ঘদিনের সম্পর্কের কারণে স্বাভাবিকভাবেই বাংলাবাজার পত্রিকার সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এই সম্পর্কের কারণেই হয়তো পত্রিকার বিপদের দিনে, পত্রিকার দুর্দিনে ব্যথিত হয়েছি। সাহসী ভূমিকার কারণে পত্রিকার উপর বহুবার বিপদ নেমে এসেছে। যখনই পত্রিকা বিপদগ্রস্ত হয়েছে, কিংবা বিপদের কারণে পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়েছে তখনই পত্রিকার পাঠক সমাজ ব্যথিত হয়েছেন। হয়েছেন উদ্বিগ্ন। সর্বশেষ গত ঈদুল ফিতরের বন্ধের পরের কয়েকদিন যখন পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায় তখন পত্রিকার পাঠক সমাজ আবারও উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিলেন। এবার অমাকে কোন কোন স্থানে কয়েকজন পাঠকের মুখোমুখী হতে হয়েছে। কেউ বলেছেন, আপনি অনেকদিন ধরে খুব কম লিখছেন। কিন্তু কেন? কেউ বলেছেন, বাংলাবাজার পত্রিকা কি একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল? আমি এ প্রশ্নের উত্ত দিতে পারিনি। কারণ আমি নিজেই জানতাম না হঠাৎ কেন পত্রিকা ছাপা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমার কম লিখবার কারণ ব্যাখ্যা করলে পাঠকদের একজন বলে উঠলেন-সত্যনিষ্ঠ এবং শুদ্ধ পত্রিকা হিসেবে পাঠক সমাজে বাংলাবাজার পত্রিকা স্থান করে নিয়েছে। দেশে শুদ্ধ পত্রিকার বড় অভাব। এই অভাবের দিনে শুদ্ধ এবং সচেতন পাঠকবৃন্দ বাংলাবাজার পত্রিকার উপর অনেক বেশি নির্ভর করতেন। তাও যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে শুদ্ধ সচেতন পাঠকদের জন্যে সামনে যে দুর্দিন সে কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। এবার আমি নিজে পাল্টা প্রশ্ন করে জানতে চাইলাম বাংলাবাজার পত্রিকা সম্পর্কে তার এই অভিমতের হেতু কি? তিনি বললেন যে, বর্তমান সময়ে পত্রিকা প্রকাশ করা একটি লাভজনক ব্যবসা। অর্থ বিত্ত বানাবার একটি হাতিয়ার ছাড়া আর কিছু নয়। বেশিরভাগ পত্রিকার মালিক এই দৃষ্টিকোণ থেকেই পত্রিকা প্রকাশ করেন। তারা সত্যনিষ্ঠতা এবং ন্যায়নীতির ধার ধারেন না এবং এইসব পত্রিকা বেছে বেছে এমন সব লেখক নির্বাচন করে যাদের দিয়ে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য হাসিল করা যাবে। আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনি নিশ্চয়ই জানেন এখন ব্যবসায় উন্নতি করতে হলে রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে ক্ষমতাসীন দলের ছত্রছায়ায় থাকতে হয় এবং ক্ষমতাসীনদের

www.pathagar.com

ভজন, পূজন করে খুশি রাখতে হয়। সুতরাং সেসব পত্রিকায় কোন লেখক লিখেছেন, কিংবা লেখার শিরোনাম কি তা জানলে কি লিখেছেন সে বিষয়ে জানবার জন্যে প্রবন্ধ পড়বার আর প্রয়োজন পরে না। না পড়েই বলে দেয়া যায় ঐ প্রবন্ধে লেখক কি কি বলেছেন কিংবা মন্তব্য করেছেন। কারণ যিনি যে রাজনৈতিক দলের পক্ষে ভজন করেন তার ভজনের রূপ কেমন তা জানা হয়ে যায়। কিংবা তিনি যদি তার বিরোধী পক্ষ সম্পর্কে বিষোদগার করেন তাহলেও তার রূপ কি হবে তাও জানা হয়ে যায়। আমি নিজেও পাঠকের অভিমতের সঙ্গে একমত পোষণ করলাম যদিও তা প্রকাশ করলাম না। একমত পোষণ করলাম কারণ আমি নিজেওতো পাঠকই ছিলাম। পত্রিকা পড়তে পড়তে যখন বুঝলাম বিভিন্ন বিষয়ে আমার অভিমতগুলো মন খুলে বাংলাবাজার পত্রিকাতেই বলা যায়, ঠিক তখনই লিখতে শুরু করলাম। আমি যেভাবে লিখি এবং যে বিষয় নিয়ে লিখি সে বিষয়ের লেখা কিংবা প্রবন্ধ রাজনৈতিক মতাদর্শের কোন পত্রিকার পক্ষে ছাপা সম্ভব নয়। সুতরাং বাংলাবাজার পত্রিকার বিপদ হলে কিংবা পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলে আর সবার মত আমিও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। পত্রিকা বন্ধের কারণ জানা না থাকার ফলে এবার আরও অধিক মাত্রায় উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম। আর এজন্যেই 'শুকর আলহামদুলিল্লাহ, র-এর চক্রান্ত ব্যর্থ'- আটকলামব্যাপী উজ্জ্বল লাল রঙে ছাপানো খবরের এই শিরোনাম সকলের মত আমাকেও চমকে দিয়েছিল।

ঈদুল ফিতরের বন্ধের পরে দিন কয়েক ধর্ম, বর্ণ ও রাজনৈতিক দল নিরপেক্ষ সকলের প্রিয় বাংলাবাজার পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। এ বিষয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংবাদ লক্ষ্য করা গেছে। পত্রিকার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষ থেকে বাংলাবাজার পত্রিকা প্রকাশের দাবি করতেও দেখা গেছে, কিন্তু প্রকৃত অর্থে কি কারণে বাংলাবাজার পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তা পাঠক সমাজ জানতে পারেনি। প্রকাশনা বন্ধের কারণ জানা গেল ১৩ জানুয়ারি ২০০১ তারিখের কুয়াশাচ্ছন্ন কাক ডাকা শীতের সকালে। এদিন সকালে হাঁটতে বেরিয়েছি। কুয়াশাচ্ছন্ন হালকা আলোয় পথে নামা নর-নারীদের দেখে শিল্পীর আঁকা চিত্রের কাথা মনে পড়ে গেল। কুয়াশায় ঢাকা অস্পষ্ট চিত্রসম দৃশ্যাবলী হৃদয়কে আন্দোলিত করলো। দূর থেকে উড়ে আসা একটি কাক কা-কা শব্দ করে মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলে গেল। কাকের এ শব্দও সেদিন আর কর্কশ মনে হলো না। এই কাক এবং কাকের শব্দ জয়নুলের চিত্রমালার কথাও স্মরণ করিয়ে দিল। স্মরণ করিয়ে দিল যে, গ্রীক এবং রোমানদের মতে কাক দৈববার্তাবাহী পাখি। কেন এ সকল বিষয় হৃদয়কে আন্দোলিত করছে সে কথা ভাবছি আর রাজধানীর নীলক্ষেতের ফুটপাত ধরে হাঁটছি। পুটপাতে বিছানো কয়েকটি পত্রিকা দেখে হঠাৎ থেমে গেলাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুটপাতে বিছানো পত্রিকাগুলোর শিরোনাম দেখলিাম। বেশ কয়েকজনের হাতেও পত্রিকা দেখলাম। তারা আগ্রহ নিয়ে সেগুলো পড়ছেন। সবেমাত্র দোকানী পত্রিকাগুলো এনেছেন। তখনও সবগুলো সাজাতে পারেননি। কয়েকটি মাত্র সাজানো। বাকিগুলো স্তূপাকারেই পড়ে রয়েছে। হঠাৎ একজন বাংলাবাজার পত্রিকার কথা জিজ্ঞেস করলেন। দোকানী

www.pathagar.com

বললেন, আজ থেকে বাংলাবাজার পত্রিকার প্রকাশনা আবার শুরু হয়েছে। যিনি জিজ্ঞেস করলেন তিনি একাধিক কপি নিয়ে গেলেন। পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে জেনে এবং একজনকে একাধিক কপি সংগ্রহ করতে দেখে মনে হলো বৈদবার্তাবাহী কাক হয়তো কা কা শব্দে পত্রিকা প্রকাশের বার্তাই আমাকে জানিয়েছিল, কিন্তু আমি তার সে বার্তার বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। পত্রিকা দেখে বিষয়টি অনুমান করলাম এবং পুলকিত হলাম। কাল-বিলম্ব না করে এক কপি আমিও সংগ্রহ করলাম। পত্রিকা হাতে নিয়েই কেন বন্ধ হয়েছিল সে বিষয়ে কোন খবর আছে কিনা তা খুঁজতে সচেষ্ট হলাম কিন্তু আমাকে আর কষ্ট করে খুঁজতে হলো না। কারণ খুঁজবার পূর্বেই আট কলামব্যাপী লাল রঙে ছাপা বিশাল শিরোনাম আমার দৃষ্টিকে স্তব্ধ করে দিল। শিরোনাম দেখে যে আমি চমকে গিয়েছিলাম সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র-এর এজেন্টরা বাংলাবাজার পত্রিকাকে নিয়ে ষড়যন্ত্রে মেতেছে! বিষয়টি চমকাবার মতই বটে।

বাংলাবাজার পত্রিকার বিরুদ্ধে র-এর এজেন্টদের কেন এত আক্রোশ সে কথাও রাখঢাক না করে স্পষ্ট করেই খবরে তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করায় খোন্দকার মোশতাককে ভারত সরকারের পক্ষে অভিনন্দন জানানো অবস্থায় ভারতীয় হাই কমিশনারের হাস্যোজ্জ্বল ছবি ছাপানোসহ বিভিন্ন কারণে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনে কর্তব্যরত র-এর এজেন্টরা বাংলাবাজার পত্রিকার কণ্ঠরোধ করতে তৎপর হয়ে ওঠে। এই তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করায় তৎকালীন ভারতীয় সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ মহাখুশি হয়েছিলেন। খোন্দাকার মোশতাককে অভিনন্দন জানানো অবস্থায় ভারতীয় হাই কমিশনার সমর সেনের যে হাস্যোজ্জ্বল ছবি বাংলাবাজার পত্রিকায় ছাপা হয়েছে (১৩/০১/২০০১তারিখের পত্রিকা দ্রষ্টব্য) সেই ছবিই তার প্রমাণ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যার পিছনে তৎকালীন ভারত সরকারের যে পরিকল্পনা কাজ করেছে সে বিষয়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা নানাভাবে তথ্য পরিবেশন করেছে। ২৫/২/৯৬ বাংলাবাজার পত্রিকায় উপ-সম্পাদকীয় কলামে 'ধ্বংসের রাজনীতি এবং কপট বুদ্ধিজীবী' শিরোনামের একটি প্রবন্ধে আমিও লিখেছিলাম। লিখেছিলাম বাংলাদেশকে প্রকৃত অর্থে বঙ্গবন্ধু একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে, স্বাধীন অস্তিত্বের সঙ্গে পরিচালিত করতে চাইলেও ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নীতি নির্ধারক এবং শক্তিশালী আমলা গোষ্ঠী চেয়েছিলেন বাংলাদেশ সর্বক্ষেত্রে ভারতের অনুগামী হোক। ভারতের মুখাপেক্ষি হোক। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাদের সে আকাঙ্ক্ষা পুরণ করেননি বরং তিনি দিল্লীর পরামর্শ ছাড়াই সে সময় লাহোর ইসলামি সম্মেলনে যোগদান করেন। তাছাড়া যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত রমনার মন্দিরটি পুনঃনির্মাণ সংক্রান্ত ইন্দিরা গন্ধীর আবেদনও তিনি অগ্রাহ্য করেছিলেন। দিল্লির অখুশির কারণে তখন ভারতের পররাষ্ট্র সচিব টি এন কল এবং গোয়েন্দা সংস্থা র-এর পরিচালক রমানাথ কাও মিলে মুজিবের বিরুদ্ধে একটি ব্লু-প্রিন্ট প্রস্তুত করেন, যা ইন্দিরা গান্ধীকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। সুতরাং এসকল তথ্য যদি বাংলাবাজার পত্রিকা বার বার

www.pathagar.com

বঙ্গবন্ধুপ্রেমী মানুষদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে ভারত বিরোধী প্রতিবেদন প্রকাশ করে তাহলে তো কাটা ঘায়ে নুনেরে ছিটা দেবার কাজটিই করা হয়। আর তা করলে যাদের সর্বশরীরে দগদগে ঘা তারাতো জ্বালা যন্ত্রণার কারণে উন্মাদের মত আচরণ করবেই। এটাকে খুব একা অস্বাভাবিক আচরণ বলা যায় না। অস্বাভাবিক আচরণ এবং আশঙ্কাজনক ভূমিকা পালন করেছেন এদেশেরই সন্তানেরা। তারা র-এর এজেন্টদের নিকট নিজেদেরকে বিক্রি করেছেন। নিজেদের দেশপ্রেম এবং সততাকে বন্ধক রেখেছেন। আর এর মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আদর্শকে অপমানিত করেছেন। এতসব করেও চক্রান্তকারীরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সত্য প্রকাশে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বাংলাবাজার পত্রিকার ক্ষতি করতে সক্ষম হয়নি। ১৩ জানুয়ারি ২০০১ থেকে পত্রিকার পুনঃপ্রকাশ শুরু হয়েছে। ফলে আনন্দিত এবং শংকামুক্ত হয়েছেন বাংলাবাজার পত্রিকার অগণিত পাঠক। আমি নিজেও খুশি। কারণ লেখার সুবাদে পত্রিকার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের আত্মীয়তা। পরমাত্মীয় বাংলাবাজার পত্রিকাকে রাহুমুক্ত করতে, পুনঃপ্রকাশ করতে পত্রিকার শ্রদ্ধেয় সম্পাদক, সাহসী সাংবাদিক, কর্মকর্তা কর্মচারীসহ যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। ২৪-৩-২০০১।

www.pathagar.com

গণতন্ত্রের নামাবলি গায়ে

বলা হয় হরতাল করা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু যে হরতাল উচ্ছৃংখল পরিবেশের জন্ম দেয়, প্রতিপক্ষের মাঝে বৈরীভাব সৃষ্টি করে, দেশের সম্পদ বিনষ্ট করে, মানুষের মান-সম্ভ্রম লুণ্ঠন করে, জান-মালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে, সন্ত্রাসের জন্ম দেয়, সর্বোপরি রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নে ও শান্তির ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে সেই হরতাল কি করে গণতান্ত্রিক হয় ? এ প্রশ্ন আজ আমার মত অনেকেরই। কিন্তু এর উত্তর মেলে না। কারণ যাদের উত্তর দেবার কথা তারা নিরব ভূমিকা পালন করেন। তারা প্রয়োজনে হরতাল করেন হরতালকে গণতান্ত্রিক অধিকার বলেন আবার প্রয়োজন ফুরোলেই হরতালের বিরোধিতা করেন। তৎকালনি বৃহৎ বিরোধী দল আওয়ামী লীগের দীর্ঘ হরতালের রাজনীতির পর মাস কয়েকের ব্যবধানে সম্প্রতি বর্তমানের সর্ববৃহৎ বিরোধী বিএনপি দল নতুন করে হরতালের উদ্বোধন করেছে। আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক ভারতকে করিডোর প্রদান, ভারত থেকে বিদ্যুৎ এনে বাংলাদেশের সুইচ ভারতের হাতে তুলে দেয়া, উপ-আঞ্চলিক জোট গঠন, পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে ষড়যন্ত্র, নির্লজ্জ দলীয়করণ, বিএনপির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা দায়ের এবং নির্যাতন করা ও দুঃশাসনের প্রতিবাদে গত ২৩ মার্চ ৯৭ বিএনপি অর্ধদিবস হরতাল পালন করে, কিন্তু বিএনপির এই হরতাল পালনকে এক সময়ের সর্বাধিক হরতাল পালনকারী এবং বর্তমানের ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার এবং সে দলের স্তাবক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় পছন্দ করেনি। ফলে দলের নেতা-নেত্রী, কর্মী এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় হরতালের বিরূপ সমালোচনায় আত্মনিয়োগ করেন। কারণ, তারাই সবচেয়ে ভাল করে জানেন যে, হরতালের রাজনীতি ক্ষমতাসীনদেরকে এক মুহূর্তের জন্যে শান্তি দেয়া না। যে লোভনীয় সিংহাসনের জন্যে প্রাণপাত সেই সিংহাসনেও সুস্থিরভাবে বসতে দেয়না। হরতালের বিরুদ্ধে সমালোচনার এটিই যে যৌক্তিক কারণ তা আওয়ামী বুদ্ধিজীবী কে এম সোবহান-এর ২ এপ্রিল '৯৭ তারিখে একটি দৈনিকে লিখিত 'ইস্যুহীন সন্ত্রাসী হরতাল' নামের প্রবন্ধে সুস্পষ্ট। হরতালের সুস্পষ্ট ইস্যু থাকা সত্ত্বেও তিনি বিএনপির হরতালকে ইস্যুহীন হরতাল প্রমাণের ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি এ হরতালকে সন্ত্রাসী হরতালরূপে চিত্রিত করেছেন। হরতাল যে ইস্যুহীন ছিল না সে বিষয়ে প্রবন্ধের শুরুতেই উল্লেখ করেছি, এবং সে ক্ষেত্রে হরতালকে ইস্যুহীন প্রমাণের প্রচেষ্টা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। তবে হরতাল যে সন্ত্রাসী কিংবা সন্ত্রাসবাদী ছিল একথা তিনি যথার্থই বলেছেন। হরতাল যেহেতু রাজনীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, বিশেষ করে

www.pathagar.com

বাংলাদেশের রাজনীতিতে, সেহেতু হরতাল সন্ত্রাসী হবেই। কারণ আমরা জানি রাজনীতির সঙ্গে সন্ত্রাস কিংবা সন্ত্রাসবাদের একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। রাজনৈতিক কারণে কিংবা রাজনীতির প্রয়োজনে যে ভয়-ভীতি কিংবা মহাশংকা সৃষ্টি করা হয় তার নাম সন্ত্রাসবাদ। আরও স্পষ্ট করে বললে সন্ত্রাস কিংবা সন্ত্রাসবাদ হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের জন্যে হত্যা, অত্যাচার ইত্যাদি কার্য অনুষ্টান অর্থাৎ রাজনৈতিক দলের অন্যান্য নীতির মতোই সন্ত্রাসবাদও একটি নীতি। যে নীতি উন্নত দেশগুলোর জন্যে অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হলেও উন্নয়নশীল, অনুন্নত, দরিদ্র এবং অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, কিংবা স্বল্প শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর দেশে অপরিহার্য বিবেচিত হয়। কারণ শান্তিপূর্ণ স্বাভাবিক নিয়মের পরিবর্তে এ সকল দেশের রাজনৈতিক দলগুলো সন্ত্রাসের সাহায্যেই ক্ষমতায় যায়। যারা সন্ত্রাসের সাহায্যে ক্ষমতায় যায় তাদেরকে সন্ত্রাসবাদী আক্ষায়িত করা হয়। অর্থাৎ রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের উদ্দেশ্যে হত্যাকাণ্ড সংঘটনের পক্ষপাতি যারা তারাই সন্ত্রাসবাদী। অভিধানগুলোতে সন্ত্রাস, সন্ত্রাসবাদ এবং সন্ত্রাসবাদী সম্পর্কে এভাবেই ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানসহ আন্যান্য নেতা-কর্মীর নির্মম হত্যাকাণ্ডের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ যে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির দেশ তা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির দেশে হরতাল পালনের ক্ষেত্রে যে সন্ত্রাসী কিংবা সন্ত্রাসবাদী, কর্মকাণ্ড ঘটবে তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং বিএনপির ২৩ তারিখের হরতালে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, অনেকে আহত হয়েছে, গার্মেন্টস কারখানা আক্রান্ত হয়েছে বলে প্রবন্ধকার যে উল্লেখ করেছেন তা শুধু বিএনপির হরতালেই ঘটেনি অতীতে আওয়ামী লীগের হরতালসহ প্রায় সকল হরতালেই ঘটেছে। অথচ তখন বিজ্ঞ প্রবন্ধকার জনাব কে এম সোবহান সে সকল ঘটনার নিন্দা করেছেন বলে জানা যায় না। বরং বিএনপি সরকারের আমলে দীর্ঘ সময়ব্যাপী হরতাল, অবরোধ এবং ভাংচুরের মাধ্যমে তৎকালীন বিরোধী দল আওয়ামী লীগ যখন দেশকে, দেশের মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল, বিদেশী বিনিয়োগকারীরা যখনই দেশে এসেছে কিংবা আসতে চেয়েছে ঠিক তখনই সন্ত্রাসী হরতাল দিয়েছে, দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করেছে, দেশ বিদেশের সংবাদ মাধ্যমগুলো যখন আওয়ামী লীগের সেই সন্ত্রাসী হরতালের কঠোর সমালোচনা করেছে তখন প্রবন্ধকার বলেছেন 'সরকারের সমালোচনা নেই, আছে হরতাল অবরোধের। শুধু তাই নয় সেই ধ্বংসাত্মক সন্ত্রাসী হরতালকে সমর্থন জানাতে গিয়ে তিনি বৃটেন এবং জার্মানির রেল শ্রমিক ও মেটাল শ্রমিকদের হরতালের উদাহরণ পর্যন্ত টেনে এনেছেন- (বাংলাবাজার পত্রিকা, ১৬/৯/৯৪)। সুতরাং যিনি বিএনপির হরতালকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হরতাল ডেকে জনজীবনে এবং জাতীয় জীবনে দুর্ভোগ টেনে আনলে তা রাজনীতিকে অস্থিতিশীল করে রাখে এবং জাতির অর্থনীতিতে স্থবিরতা আনে বা ধস নামায়।' যিনি আওয়ামী লীগের হরতালকে সমর্থন জানাতে বিএনপি সরকরের সমালোচনা নেই, হরতালের আছে বলে প্রবন্ধ লিখেন, সেই একই ব্যক্তি যখন আবার আওয়ামী সরকারের সমালোচনার পরিবর্তে বিএনপির হরতালের সমালোচনা করে প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখেন তখন বুঝতে অসুবিধে

www.pathagar.com

হয় না যে তার উদ্দেশ্য মহৎ নয়। কিংবা তার প্রবন্ধ-নিবন্ধ সর্বজনগ্রাহ্য কিংবা নিরপেক্ষ নয়। অহিংস কিংবা পক্ষপাত শূন্য নয়।

কথায় বলে সব কিছুরই নির্দিষ্ট একটি মাত্রা আছে। কোন কিছু মাত্রার মধ্যে থাকলে তার গ্রহণযোগ্যতাও থাকে। কিন্তু মাত্রার বাইরে চলে গেলে গ্রহণযোগ্যতা হারায়। অষুধেরও মাত্রা আছে। মাত্রা মেনে অষুধ খেলে রুগীর রোগ নিরাময় হয়। অথচ সেই একই অষুধ মাত্রাতিরিক্ত সেবন করলে রুগীর জীবন সংশয় দেখা দেয়। হরতাল গণতান্ত্রিক অধিকার হলেও তার সহনীয় মাত্রা থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বাংলাদেশে হরতালের যেমন মাত্রা নেই, তেমনি মাত্রা নেই রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদেরও। সুতরাং হরতালের ইস্যু খোঁজা অবান্তর। হরতালের ইস্যু থাকলেই সমর্থন করতে হবে এমন কোন কথা নেই। গণতান্ত্রিক অধিকারের যত যুক্তিই থাকুক না কেন, যে হরতাল দেশের মানুষের দুর্ভোগ বাড়ায়, দেশের অর্থনীতিকে দুর্বল করে, দেশকে অস্থিতিশীল করে সেই হরতালকে সমর্থন করা যায় না। রাজনীতিবিদ এবং তাদের স্তাবকেরা নিজেদের সুবিধার্থে তাকে যেরূপেই আখ্যায়িত করুক না কেন। বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশের হরতাল কালচার মৃত্যুর শামিল, কিন্তু তথাপি হরতাল হয়। মৃতপ্রায় মানুষের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মতো হরতালকে চাপিয়ে দেয়া হয়। হয়তো ভবিষ্যতেও দেয়া হবে। কারণ ক্ষমতাসীন দলকে ক্ষমতাহীন করে ক্ষমতায় যাবার অন্যতম প্রক্রিয়া হিসেবে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো হরতালকে অনিবার্য এবং অব্যর্থ প্রমাণিত করেছে। সুতরাং বিএনপিও ক্ষমতায় যেতে যে হরতালের পথ বেছে নেবে সেটাইতো স্বাভাবিক। তা কেউ সমর্থন করুক বা নাই করুক। কিন্তু তথাপি সচেতন মানুষদের সকল রাজনৈতিক দলের হরতালকে নিরুৎসাহিত করতে এগিয়ে আসা উচিত।

এক সময় ছিল যখন বাঙালির সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড সমর্থনযোগ্য ছিল। সে সময় দেশপ্রেমিক মানুষ, জাতীয়তাবাদী মানুষ বাঙালির সন্ত্রাসকে সমর্থন যুগিয়েছে। সমর্থন যুগিয়েছে, বাঙালি জাতির নিজেদের মর্যাদা ও অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে। সেই থেকে বাঙালি জাতিগতভাবেই সংগ্রামী, সন্ত্রাসবাদী। বাঙালি জাতির উৎসের সন্ধান করলেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় এবং আর্যদের সংশ্রিণে, পুণ্ড্র, গৌড়, রাঢ়, সমুদ্র, ব্রজ, তাম্রলিপি, সমতট প্রভৃতি অঞ্চলের সমন্বয়ে সৃষ্ট বাঙালি জাতি এবং বাংলাভাষার জন্মলগ্ন থেকেই যখন পাল ও সেন বংশের সহায়তায় সংস্কৃতসেবী ব্রাহ্মন্যবাদীগোষ্ঠী বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, বাঙালিদের নিগৃহীত করতে থাকে, শাসন শোষণের সুবিধার্থে বাঙালিদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথার প্রচলন করে এমনকি ভোগ বিলাসের প্রয়োজনে নিম্নবর্ণের যুবতীদের সঙ্গে তাদের অবৈধ যৌন মিলনকে বৈধ এবং নিম্নবর্ণের যুবতীদের জন্যে তা পুণ্যের কাজ বলে প্রচার করে ঠিক তখন থেকেই অত্যাচারিত নিগৃহীত, অপমানিত বাঙালি জাতি স্বভাবিক কারণেই ক্ষুব্ধ ও সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে। সেই থেকে বাঙালির সন্ত্রাসবাদেরও শুরু। স্বরাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এই সন্ত্রাসবাদের প্রয়োজন হয়েছে। এবং তৎকালে স্বাধীনতাকামী মানুষ এবং বঙ্গের গভর্নরের দ্বারা সমর্থিতও হয়েছে। গভর্নর ঢাকায় পুলিশ প্যারেডে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তাতে বলা

www.pathagar.com

হয়েছে, সন্ত্রাসবাদীরা দেশের শাসনপ্রণালী পরিবর্তন এবং শাসক পরিবর্তন দ্বারা দেশকে স্বধীন দেশ সকলের মতো করবার নিমিত্তে সন্ত্রাসী কার্য করে থাকে। এই অনুমান যদি ঠিক হয় তাহলে সরকারি অভিযান পরিচালকদেরকে উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় নির্দেশ করতে হবে (প্রবাসী, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, ১৩৪১)। বৃটিশ ভারতেই শুধু নয় সন্ত্রাসবাদ সমর্থন পেয়েছিল '৫২এবং '৭১ সালেও। সমর্থন পেয়েছিল বাঙালির প্রিয় ভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার প্রয়োজনে। সমর্থন পেয়েছিল বাঙালির নিজস্ব আবাসভূমি বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে। কিন্তু, স্বাধীনতার পর সন্ত্রাসবাদী বাঙালি সন্ত্রাসবাদের সার্বজনীন আদর্শিক রূপকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়নি। ফলে সন্ত্রাস দেশের সর্বত্র বিস্তার লাভ করে। এখন সন্ত্রাস হয় দলীয় স্বার্থে, সন্ত্রাস হয় গোষ্ঠী স্বার্থে, সন্ত্রাস হয় জমি-জমা ও অন্যের সম্পদ দখলের জন্যে, সন্ত্রাস হয় হল দখলের জন্যে, সন্ত্রাস হয় পরীক্ষা পিছানোর জন্যে, পরীক্ষায় নকল করবার অধিকার আদায়ের জন্যে, সন্ত্রাস হয় পরীক্ষায় পাস করিয়ে দেবার জন্যে, পরীক্ষায় অধিক নম্বর আদায়ের জন্যে। এখন সন্ত্রাসবাদীরা অসহায় মানুষকে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে যায় না, বরং সুযোগ পেলে সর্বস্ব লুটে নেয়। অফিসগামী বাবার বয়সী মানুষকে শ্রদ্ধা করে না বরং পরনের পোশাক খুলে দিগম্বর করে। নারীর ইজ্জত রক্ষায় এগিয়ে যায় না বরং আনন্দ-উল্লাসের নামে তাদের লাঞ্ছিত করে।

সুতরাং আদর্শহীন যে সন্ত্রাস সমাজ ও সমাজের মানুষের জন্যে হুমকি সৃষ্টি করে, যে সন্ত্রাস হরতাল নামক গণতন্ত্রের নামাবলী গায়ে চড়িয়ে জনজীবনকে বিপন্ন করে, যে সন্ত্রাস শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষা জীবনকে ধ্বংস করে, সেই সন্ত্রাস রাজনীতি, হরতাল কিংবা অন্য যে নামেই হোক না কেন তাকে কোন যুক্তিতেই সমর্থন করা যায় না। বিষয়টি সকলে অনুধাবন করলে দেশের মঙ্গল, দেশের মানুষের মঙ্গল । মঙ্গল সমগ্র জাতির। ২৫-৪-১৯৯৭।

www.pathagar.com

যানজটের যন্ত্রণা

যানজটের যন্ত্রণা এড়াবার উদ্দেশ্যে ঈদের পরের দিন অর্থাৎ ১০ফেব্রুয়ারি '৯৭ নাটোরে গ্রামের বাড়ি গিয়েছিলাম। গিয়েছিলাম গুরুদাসপুর থানার চাঁচকৈড় নাজিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে। ঈদের পূর্বে ঘরমুখো মানুষের প্রচণ্ড চাপ ও অসহনীয় যানজট সংক্রান্ত পত্রপত্রিকার প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে ঈদের পরদিন নির্বিঘ্নে যাবার জন্যে শ্রেষ্ঠ সময় মনে করেছিলাম। মনে করেছিলাম সেদিন যান এবং যাত্রীর কোন ভিড় থাকবেনা । কিন্তু আরিচা ঘাটের যান এবং যাত্রীর সংখ্যা আমার ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করলো। কারণ যান এবং যাত্রীতে ফেরি পরিপূর্ণ হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, বেশ কিছু গাড়ি স্থানাভাবে উঠতে ব্যর্থ হলো। তবে কিছু সময় পূর্বে যাবার সুবাদে আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো। আমি আমার যানটি নিয়ে ফেরিতে উঠতে সক্ষম হলাম এবং নগরবাড়ি ঘাটের ৩/৪ কিলোমিটার ইট বিছানো ভাঙ্গা ও এবড়োথেবড়ো ধুলায় আচ্ছন্ন রাস্তা পেরিয়ে মোটামুটি নির্বিঘ্নেই বাড়ি পোঁছতে সক্ষম হলাম। তবে ফিরতি পথে ঢাকায় ফেরা সহজ হলো না। কারণ অসহনীয় যানজটের সম্মুখীন হতে হলো।

১২ ফেব্রুয়ারি চাঁচকৈড় নাজিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে আংশগ্রহণ শেষে একদিন বাড়িতে অবস্থানের পর ১৪ ফেব্রুয়ারি সকাল আটটায় ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে সুন্দর চওড়া ও মসৃণ রাস্তা অতিক্রম করে সহজেই নগর বাড়ির পিচঢালা রাস্তা থেকে ৩/৪ কিলোমিটার ভাঙ্গা এবড়োথেবড়ো পথ অতিক্রম করে ঘাটের দিকে এগুতেই খাকি পোশাক পরিহিত স্বেচ্ছাসেবকের বাধার সম্মুখীন হতে হলো এবং তার নির্দেশে পূর্ব থেকে অপেক্ষমাণ বাস, ট্রাক ও অন্যান্য যানের দীর্ঘ লাইনের পেছনে আমার যানটিকে দাঁড় করাতে হলো। পারাপারের ক্ষেত্রে ঘাটে অভূতপূর্ব নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। ভাবলাম সংগ্রহ করা সিরিয়াল নম্বর অনুসারে ফেরিতে গাড়ি উঠাবার জন্যেই হয়তো এমন সুব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘাটে গাড়ি বা যান পারাপারের ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হওয়ায় আওয়ামী লীগ সরকারকে মনে মনে অসংখ্যবার ধন্যবাদ দিলাম। শুধু তাই নয় অপেক্ষমাণ সকলের ধৈর্য, শৃঙ্খলা এবং দীর্ঘ গাড়িবহরের যে চিত্র লক্ষ্য করলাম সেই চিত্রের মধ্য দিয়ে জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যতও যেনো প্রত্যক্ষ করলাম। এবং এমনি একটি সুশৃঙ্খল জাতির কথা কল্পনা করে গর্বও অনুভব করলাম। সুন্দর, সুশৃঙ্খল ভবিষ্যত জাতির জন্যে গর্বানুভব করতে করতে কয়েক ঘন্টা সময় অতিবাহিত হয়ে গেল এবং আমার গাড়ির পেছনেও গাড়ির বহর দীর্ঘ

www.pathagar.com

থেকে দীর্ঘতর হলো। কিন্তু এরপরেও সামনে এগুবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না । অন্যপক্ষে ঘাটে তিন তিনটি ফেরি অপেক্ষমাণ দেখা গেলেও সেগুলো থেকে কোন যান কিংবা যাত্রী নামতেও দেখা গেল না। সব মিলে মহা রহস্যময় অপেক্ষা মনে হলো। আরও কিছু সময় অতিবাহিত হলে একজনকে অপেক্ষার কারণ জিজ্ঞেস করে জানা গেল অপেক্ষমাণ তিনটি ফেরির একটিতে বাঙলাদেশ সরকারের একজন মন্ত্রী অবস্থান করছেন। তিনি সর্বাগ্রে নেমে যাবেন এবং তার যাবার পর ফেরিতে অপেক্ষমাণ যাত্রী এবং যানবাহন যাবে। তারও পরে আমাদের যানবাহন সামনে এগুবার অনুমতি পাবে। এবার দীর্ঘ অপেক্ষার রহস্য ভেদ হলো। তবে রহস্য ভেদ হলেও শিগগিরই অপেক্ষার শেষ হবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। আরও কিছু সময় অতিবাহিত হলে রাস্তার ধূলায় পানি ছিটাতে ছিটাতে ঘাটের দিক থেকে একটি গড়িকে আসতে দেখা গেল। দীর্ঘ ৩/৪ কিলোমিটার রাস্তায় পানি ছিটাতে ছিটাতে গাড়িটি এক সময় আমাকে অতিক্রম করে পিচঢালা পথের দিকে অগ্রসর হলো। এবং সেই পানি ছিটানো গাড়ির পিছনে পিছনে ধূলাহীন ভেজা রাস্তা ধরে পুলিশ পরিবেষ্টিত কতগুলো গাড়িকে চলে যেতে দেখা গেল।

রাজকীয় পরিবেশে গাড়িগুলোর চলে যাওয়া নির্বিঘ্ন করবার লক্ষ্যে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি করা এবং ধুলা নিবারণের ব্যবস্থা দেখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কথা মনে পড়ে গেল। কারণ তিনি বলেছিলেন- তার যাতায়াতের সময় যেনো রাস্তার স্বাভাবিক যান চলাচল বন্ধ করে যানজটের সৃষ্টি করা না হয়। বলেছিলেন- শাসক হিসেবে নয় জনগণের সেবক হিসেবে আমরা কাজ করতে চাই। প্রধানমন্ত্রীর সুন্দর ব্যতিক্রমধর্মী এই বক্তব্য দুটির সঙ্গে সেদিনের বাস্তব অবস্থার মিল খুঁজছিলাম আর ভাবছিলাম যে, দেশের জ্ঞানী-গুণী ও মহৎ ব্যক্তিবর্গসহ অগণিত মানুষ যে রাস্তা দিয়ে প্রতিনিয়ত যাতায়াত করছেন সেই মানুষদের সেবক, রাস্তায় যিনি পানি না ঢেলে যেতে পারেন না, যিনি শিশু কিশোর, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাসহ অগণিত মানুষের দুর্দশা বাড়িয়ে সামন্ত প্রভুর মত চলে গেলেন তিনি জনসেবকই বটে!

যার জন্যে এত অপেক্ষা, এত ত্যাগ, এত তিতিক্ষা, তার চলে যাওয়া এবং এরও পরে অন্যান্য যান ও যাত্রী সাধারণের চলে যাবার মধ্যদিয়ে অপেক্ষার অবসান হলেও শুরু হলো নতুন সমস্যার পালা। শুরু হলো সুশৃঙ্খল দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলোর দৌড় প্রতিযোগিতা। আর এরই মধ্য দিয়ে ভবিষ্যত সুশৃঙ্খল জাতি সম্পর্কিত আমার কল্পিত সুন্দর চিত্রটি কদাকার সুৎসিত চিত্রে পরিণত হলো। কারণ কোথাও আর ধৈর্য, সহিষ্ণু, নিয়ম-শৃঙ্খলার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট রইল না। ধূর্ত ও অসহিষ্ণু গাড়ি মালিকদের নিয়ম-শৃঙ্খলা বিবর্জিত উন্মত্ত দৌড় প্রতিযোগিতার কারণে ঘাটের সর্বত্র এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। ঘাটে ঢুকবার মুহূর্তে সংগৃহীত সিরিয়াল নম্বর অর্থহীন প্রমাণিত হলো এবং অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টিকারীদের বিজয় নিশ্চিত হলো। কারণ তারা ফেরিতে উঠতে সক্ষম হলো। আর নিয়ম-শৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাসেবকদের গৃহীত ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে গিয়ে আমরা ক'জন বার বার ব্যর্থ হলাম। এক ঘাট থেকে আরেক ঘটে ছুটাছুটি করেও ফেরিতে ওঠা সম্ভব হলো না। তবে বারকয়েক ব্যর্থ হবার পর বেলা দুটো নাগাদ চতুর্থবারে সাফল্য

www.pathagar.com

অর্জন করলাম। যারা ফেরিতে উঠতে সক্ষম হলাম টিকিট কাউন্টারে তাদের প্রত্যেকের নিকট থেকে স্বাভাবিক মূল্যের চেয়ে দশ টাকা অতিরিক্ত রেখে টিকিট প্রদান করলেও এ বিষয়ে কারো মাঝে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল না, বরং দশ টাকার বিনিময়ে ঘরে ফেরার বিষয়টি নিশ্চিত হলো বলে সকলে আনন্দিতই হলো। কিন্তু ঐ আনন্দ কিংবা আনন্দানুভূতি বেশিক্ষণ স্থায়ী । হলো না। ঘন্টা আড়াইয়ের ব্যবধানে আনন্দ নিরানন্দে পর্যবসিত হলো। নগরবাড়ি ঘাটের অপেক্ষমাণ গাড়িগুলো নিয়ে পর পর কয়েকটি ফেরি আরিচা ঘাটে পৌছানোর কারণে বিশাল গাড়ি বহর ঢকা-আরিচা রোডেও জটের সৃষ্টি করলো। রাস্তা মেরামতের লক্ষ্যে মূল রাস্তার অর্ধাংশ কেটে ফেলার কারণে পাশাপাশি গাড়ি চলা বন্ধ হওয়ায় ঢাকা থেকে আরিচা এবং আরিচা থেকে ঢাকাগামী যানগুলো কাটা রাস্তার উভয় প্রান্তে অবর্ণনীয় জটলার সৃষ্টি করলো। ফলে ঠাঁয় থেমে থাকা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর রইলো না। আবারও শুরু হলো ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষার পালা। যাত্রীদের অনেকেই রাস্তায় নামলো। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে কেউ কেউ ঝোপ-ঝাড় কিংবা শস্য ক্ষেতে নেমে গেল। লজ্জা শরম ত্যাগ করে মেয়ে যাত্রীদেরকেও কাজটি সারতে হলো। এমনি পরিবেশে ক্রমান্বয়ে সন্ধ্যা গড়িয়ে মাঠ-ঘাট-রাস্তা ও লোকালয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকার নেমে এলো। রাস্তার উভয় পাশে গভীর খাদ। তারপর সমতল ভূমি। কোথাও কোথাও গাছপালা পরিবেষ্টিত গ্রাম্য কুটির । সর্বত্রই গভীর অন্ধকার। গাড়িগুলো থেমে থাকায় সকল গাড়ির হেডলাইটও বন্ধ। কোথাও কোন আলোর চিহ্নমাত্র নেই। চারিদিকে ঝিঁঝি পোকার ডাক আর যাত্রীদের ফিসফাস শব্দ। এছাড়া পরিবেশ প্রায় নিস্তব্ধ। এমনি পরিবেশে হঠাৎ অলোর ঝলকানি। সামনে থেকে পর পর অনেকগুলো বাস, ট্রাক নিরবতা ভঙ্গ করে গর্জন করতে করতে আরিচার দিকে চলে গেল। সামান্য বিরতির পর আরও কিছু বাস, ট্রাক একই দিকে চলে গেল। এরপর আবারও সামান্য বিরতি। তারপর রাত ন'টার দিকে হঠাৎ আমাদের লাইনের গাড়িগুলো সামনে এগুতে শুরু করলো। কিন্তু কিছু পথ গ্রসর হবার পর আবারও থেমে গেল। কিছু চলা, কিছু থামা, এমনিভাবে একসময় ঘড়ির কাঁটা দশটা পেরিয়ে গেল। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই জট পেরিয়ে রাত সাড়ে দশটা নাগাদ অগণিত যান এবং যাত্রীদের পিছনে রেখে বাসায় পৌছাতে সক্ষম হলাম।

পত্রপত্রিকায় যানজট সম্পর্কে বহু খবর পড়েছি। যানজটে নিপতিত মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের কথা লোকমুখে শুনেছি, কিন্তু নিজে কখনও যানজটে পড়িনি। যানজট দেখিনী। এবারই প্রথম যানজটে পড়লাম, যানজট দেখলাম এবং যানজটের যন্ত্রণা ভোগ করলাম। শুধু তাই নয়, যানজটের কারণগুলোর কিছু কিছু বাস্তবে প্রত্যক্ষ করলাম। ১৫-৩-১৯৯৭।

www.pathagar.com

লেখকের আত্মগ্লানি

জীব জগতে বোধ করি মানুষই অধিকমাত্রায় চিন্তাশীল, স্পর্শকাতর এবং অনুভূতিপ্রবণ। সেই মানুষটি যদি একজন লেখক, দার্শনিক কিংবা শিল্পী হন তাহলে তো কথাই নেই। তিনি ভাব সাগরে ডুব দিয়ে সমাজের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড কোলাহল উপেক্ষা করে অবলীলায় দিন কাবার করতে পারেন। এমনকি কাবার করতে পারেন দিন রাত দু-ই। একজন শিল্পী যখন শিল্প গড়েন তখন তাকে যে শুধু দর্শনীয় করে তুলেন তাই নয়, তাকে সমাজের এবং সময়ের দর্পণরূপে জনসম্মুখে তুলে ধরেন। তিনি যখন ভয়ংকর নর কঙ্কালের দিকে দৃষ্টি দেন তখন তাতে শুধু হাড়-হাড্ডিই দেখেন না। তিনি সেই কঙ্কালের মাঝে সুন্দর একজন নর কিংবা নারীর অবয়ব কল্পনা করেন। সেই সাথে তাদের জীবনের ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনা ও সামাজিক অবস্থানসহ বিভিন্নভাবে কল্পনার স্বর্গরাজ্যে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেন। একজন লেখকের কল্পনার রাজ্যও শিল্পীর মতই বিস্তৃত। তিনি সেই রাজ্যের সর্বত্রই বিচরণ করেন। আমাদের বাস্তব সমাজের কঠিন ও রূঢ় বাস্তবতাকে তাই তিনি তার নিজের মত করে কল্পনায় কিংবা বাস্তবতার আলোকে ভাবতে শেখেন। সমাজের বিভিন্নদিকগুলোকে তিনি নানাভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে সাধারণ্যে তুলে ধরেন। সমাজের অসঙ্গতির কারণে কখনও কখনও তিনি ব্যতিথ এবং ক্ষুব্ধ হন। যে কারণে কোন কোন সময় তিনি সমাজের বিরুদ্ধে সমাজের প্রচলিত অসঙ্গতির বিরুদ্ধে ঘৃণা কিংবা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এই ঘৃণা কিংবা ক্ষোভ প্রকাশের পদ্ধতিও এক এক জনের ক্ষেত্রে এক এক রকম। কেউ সমাজের হর্তা-কর্তা, বিধাতা কিংবা প্রতিপক্ষকে সরাসরি আক্রমণের মধ্যদিয়ে তা প্রকাশ করেন। কেউবা আবার নিজেকেই ধিক্কার দিয়ে, নিজেকে তুচ্ছ করবার মধ্যদিয়ে কাজটি করেন। যেমনটি করেছেন আমাদের সমাজের, আমাদের পরিবারের অতি আপনজন অত্যন্ত ভাব-প্রবণ বলিষ্ঠ ও স্পষ্টবাদী লেখক আহমদ ছফা।

ইংরেজি নববর্ষের পহেলা জানুয়ারি '৯৬ তারিখে ঢাকায় যে গ্রন্থমেলার উদ্বোধন হয় সেই মেলার উদ্বোধনী মণ্ডপের দর্শক-শ্রোতাদের জন্যে আসনের সামগ্রিক স্তর বিন্যাস তাঁকে দারুণভাবে আহত করে। আমাদের সমাজে হিন্দু সম্প্রদায়ের মত বর্ণ বৈষম্য বা উচ্চ বর্ণ-নিম্ন বর্ণের বিভেদ না থাকলেও গ্রন্থমেলার মণ্ডপে বসবার আয়োজনের ক্ষেত্রে সেই উঁচু-নিচু জাত-পাতের বিভাজন করা হয়েছিল বলে তাঁর মনে হয়েছে। কারণ যাদের লেখা গ্রন্থ নিয়ে মেলার আয়োজন সেই লেখকদের জন্যে রাখা হয়েছিল টুটা-ফাটা আসনগুলো। অথচ আমলা এবং মন্ত্রী মহোদয়দের জন্যে ছিল নয়নমোহন রাজকীয় ব্যবস্থা।

www.pathagar.com

সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই মণ্ডপের বর্ণ বৈষম্য ব্যবস্থা পীড়াদায়ক হওয়ায় উদ্বোধনের তোয়াক্কা না করে তিনি বাড়ি ফিরে গেছেন। যাবার পথে রাস্তায় যানজটে আটকে যাওয়া বেবিতে বসে এ বিষয়ে ভাবতে গিয়ে বলেছেন- 'ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখলাম আমি একজন হারামজাদা লেখক। নারায়ণগঞ্জের টানবাজারের বাসিন্দাদেরও সমাজে একটা অবস্থান আছে। আমাকে এইভাবেই আমার নামে করা অনুষ্ঠান থেকে সব সময় বুকের ব্যথা বুকে চেপে ফিরে এসে ঘরে বসে জখমি সিংহের মত থাবা চাটতে হবে' (বাংলাবাজার পত্রিকা, ৫/১/৯৬)। লেখকের এ খেদোক্তি বা আত্মগ্লানি সকলেই সমভাবে উপলব্ধি করবেন একথা বলা যায় না। কারণ আমাদের দেশে, আমাদের সমাজে উচ্ছিষ্টভোগী এক শ্রেণীর মানুষ আছেন যারা টুটা-ফাটা আসন কেন আমলা কিংবা মন্ত্রীদের পদতলে ধুলোয় বসবার সুযোগ পেলেও আনন্দে আত্মহারা হন। শুধু তাই নয়, অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফিরে স্ত্রী এবং আত্মীয়-স্বজনদেরকে গর্বের সাথে সে কথা শুনিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকেন। মনে মনে কায়-মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থণা করেন কোন আসনে নয় চিরকাল মন্ত্রী কিংবা আমলাদের পদতলেই যেনো স্থান হয়। মহানুভব ঈশ্বর কারও আশা অপূর্ণ রাখেন না বিধায় তাদের সে প্রার্থণা পূরণ হয়। ফলে মন্ত্রী, আমলা এবং উপরওয়ালাদের আশীর্বাদে দুর্বল লেখক, কখনও কখনও আবার অলেখকও বড় লেখকের সম্মানে সমাদৃত হন। ভুলে ভরা বই লিখেও কেউ কেউ প্রশংসিত হন এবং জাতিকে ভুল শিক্ষা দানের প্রশংসনীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সংস্কৃতি মন্ত্রাণালয়সহ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে মহা সমাদরে আদৃতত্ত হন। যার যা দায়িত্ব নয় তিনি সে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। অনেকে আবার রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছও হন। সুতরাং সব সম্ভবের এই অভাগা দেশে আহমদ ছফার আত্ম-ক্রন্দন কিংবা আত্মগ্লানির প্রকাশ অরণ্যেরোদন বই আর কিছু নয়। কারণ আহমদ ছফা মণ্ডপের অবহেলিত টুটা-ফাটা আসন ঘৃণাভরে ছেড়ে আসলেও অনেক লেখকই যে সেগুলোতে জেঁকে বসেছেন তা বলাবাহুল্য। মূল বৈষম্যটাই এখানে।

বৈষম্যহীন সমাজ গড়বার স্বপ্নদ্রষ্টা যারা সেই শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী সমাজ রাজনৈতিক মত পার্থক্য ও পারস্পরিক কলহের কারণে প্রায় সকলেই আজ বন্ধুহারা, স্বজনহারা। ছোট-বড়, উচু-নিচু, কুলীন-অকুলীন, স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ, বাঙালি-বাংলাদেশী এমনি নানাবিধ প্রশ্নে পারস্পরিক সংঘাতে বিধ্বস্ত তারা। শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী মহলে এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে চলছে একই খেলা। স্বার্থের প্রয়োজনে গলাগলি, জড়াজড়ি এমনকি পায়ে ধরাধরি। আবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই গলায় পড়ছে দড়ি। প্রয়োজন ফুরোলেই রাজাকার, খুনি। প্রয়োজন পড়লেই পেয়ার মহব্বত, জানের জানি। অন্তরে এক বাইরে আর এক। রীতিমত মুনাফেকিজম। প্রত্যেকেই দোষৈকদর্শী যেনো। নাহলে আমাদের গুণী লেখক হুমায়ুন আজাদ আর একজন মানি কবি আল মাহমুদকে কেন অমার্জিত ভাষায় আক্রমণ করবেন? কেন বলবেন-'সে জায়নামাজে বসে পর স্ত্রী সঙ্গমের স্বপ্ন দেখে।' কেনইবা আল মাহমুদ হুমায়ুন আজাদকে বলবেন-'আমি লোকটাকে একটা নোংরা লোক মনে করি। হুমায়ুন আজাদ যেসব গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে আপনাদের

www.pathagar.com

ধারণা অধিকাংশ হলো চৌর্যবৃত্তি' (বাংলাবাজার পত্রিকা, যথাক্রমে ৩/১২/৯৫ এবং ২৪/১২/৯৫)। কেনইবা তারা আমিত্বের বড়াইয়ে অবতীর্ণ হবেন; কেন সৈয়দ আলী আহসান অন্যদের দ্বারা আক্রান্ত হবেন? কেনইবা সৈয়দ হক, শামসুর রাহমান, কবীর চৌধুরী, মোস্তফা নূরুল ইসলাম পাকিস্তানের পক্ষের বলে সৈয়দ আলী আহসান কর্তৃক বিশেষভাবে বিষেষিত হবেন, চিহ্নিত হবেন? (বাংলাবাজার পত্রিকা, ৫/১/৯৬)। পারস্পরিক আক্রমণ ও অসন্তোষের কার্যকারণ সম্বন্ধ থাকা অস্বাভাবিক নয় কিন্তু তারতো একটি সহনীয় ও মার্জিত মাত্রা থাকা প্রয়োজন। যারা সুন্দর সম্পর্কের বিষয়টিকে অসুন্দর ও অসহনীয় পর্যায়ে রাখতে ভালবাসেন তারা প্রকৃত অর্থে নিজেদের এবং জাতির অমঙ্গল প্রত্যাশী। এ প্রচেষ্টা সুন্দর সৌহার্দ্য ও ঐক্য বিনাশী, তথা শোষণহীন, বৈষম্যহীন, সুন্দর ও স্বার্থক সমাজ গড়বার পরিপন্থী। যা আমাদের কারও কাম্য নয়। আমরা সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় গড়া শোষণহীন, বৈষম্যহীন, সুন্দর, সতেজ সমাজের প্রত্যাশী।

পরিশেষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সভার আয়োজকদের ভেবে দেখতে বলি-যাদেরকে নিয়ে অনুষ্ঠান, যাদের অবদানে ধন্য অনুষ্ঠান, যাদেরকে উদ্দেশ্য করে আমলা, মন্ত্রী, কিংবা প্রধানমন্ত্রী গর্বভরে জাতির উদ্দেশ্যে সপ্রশংস বক্তব্য রাখেন, যাদের জন্য জাতি গর্বিত বলে অভিমত প্রকাশ করেন, সেই সকল সম্মানীত ব্যক্তিবর্গের জন্য আমলা এবং মন্ত্রীদের সারিতে বসবার ব্যবস্থা করলে আমলা, মন্ত্রীদের মানহানি হয়, নাকি অনুষ্ঠানেরই সার্বিক মর্যাদা বাড়ে? মনে রাখা প্রয়োজন যে, শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী এবং লেখকদের অবজ্ঞা করে কোন জাতি বড় হতে পারে না। কারণ তাঁরাই জাতির গর্ব। তাঁরাই জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা। তাঁরাই জাতির অলংকার। ১৩-১-১৯৯৬।

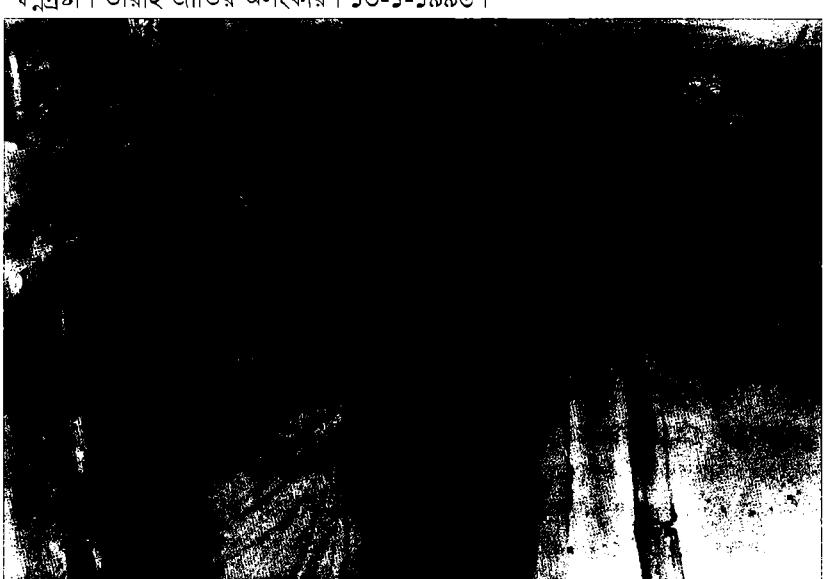

www.pathagar.com

বাংলাদেশের রাজনীতি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং একজন অধ্যাপকের অভিমত

সন্ত্রাস, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, মাস্তানি, লুটতরাজ এবং হত্যাকাণ্ডজনিত কারণে সৃষ্ট আইন শৃঙ্খলার আশঙ্কাজনক অবনতির এক চরম মুহূর্তে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সাধারণ নির্বাচন পরিচালনার লক্ষ্যে দেশের শাসনভার গ্রহণের পর থেকে কঠিন সমস্যার মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এমন নাজুক পরিস্থিতির মোকাবেলা পূর্বে অন্য কোন তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে করতে হয়নি। কারণ বর্তমানে শিক্ষা-সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং রাজনীতিসহ দেশের সর্বক্ষেত্রে নজিরবিহীন অরাজকতা বিরাজ করছে। সমগ্র দেশ আজ ছোট বড় অসংখ্য সন্ত্রাসী গ্রুপ দ্বারা নির্যাতিত। এ সকল সন্ত্রাসী গ্রুপ বিগত আওয়ামী সরকারের আমলে এতই শক্তিশালী এবং আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত হয়েছে যে, তাদেরকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে দমন করা সম্ভব হচ্ছে না। আওয়ামী সরকারের আমলে এদের কর্মকাণ্ড দেখে মনে হয়েছে যে, সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো যেনো ঢাকার কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে এক একটি প্রাদেশিক সরকারের ভূমিকা পালন করছে। এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ-নির্দেশ এবং পরামর্শেই তারা পরিচালিত হচ্ছে। তা নাহলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের স্বঘোষিত প্রাদেশিকসরকার প্রধানরূপী গডফাদাররা প্রকাশ্যে শক্তি প্রদর্শন এবং তাদের দুষ্কর্মের বিস্তার ঘটিয়ে মহাদাপটে রাজা মহারাজার মত অবস্থান করতে সক্ষম হতো না। দেশের পত্র-পত্রিকায় তাদের অন্যায় অপকর্ম জুলুম এবং সন্ত্রাসের ইতিহাস এবং সচিত্র প্রতিবেদন বিরামহীনভাবে প্রকাশ করা সত্ত্বেও তারা রাজা-মহারাজা, কিংবা জমিদারদের মত শাসন-শোষণ অব্যাহত রেখে শানশওকতের সাথে অবস্থান করতে পারতো না। সন্ত্রাসীদের কেউ কখনো ধরা পড়লে সরকারের শীর্ষ মহল থেকে সাফাই গাইতে দেখা যেতো না। রাজনৈতিক দলের মিটিং-মিছিল থেকে প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে মানুষ হত্যা করে কেউ পার পেতে পারতো না। জমি, বাড়ি-দোকান, হাট-বাজার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দখলকারী সন্ত্রাসীরা ক্ষমতাসীন দলের আশ্রয়-প্রশ্রয় লাভে সমর্থ হতো না। অবৈধ আস্ত্রধারীরা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের চোখের সামনে বীরদর্পে ঘোরাফেরা করতে সাহস পেতো না। সর্বোপরি প্রশাসনসহ দেশের সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি স্থায়ী আসন গেড়ে বসতে পারতো না, এবং বিশ্ব দরবারে প্রথম স্থান অধিকারী দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে দেশবাসীর মুখে কালিমা লেপনও করতে পারতো না।

www.pathagar.com

যে দেশ বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয় সে দেশের আইন-শৃঙ্খলাজনিত অবস্থা যে কতটা ভয়াবহ হতে পারে সে কথা ব্যাখ্যা করে বুঝানোর প্রয়োজন পড়ে না। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি প্রধানসহ রাজনৈতিক দলগুলোর বিভিন্ন নেতানেত্রী এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং বিশেষ বিশেষ শিক্ষকবৃন্দও যখন নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন এবং নিরাপত্তা দানের জন্যে আবেদন নিবেদন করেন তখন দেশের অরাজকতা এবং ভয়াবহতার রূপ এমনিতেই প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই ভয়াবহতা প্রমাণে যুক্তি-তর্ক-প্রমাণ উপস্থাপনের কোন প্রয়োজন হয় না। সুতরাং এমন একটি ভয়াবহ পরিস্থিতিতে নির্বাচন পরিচালনার লক্ষ্যে দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্যে দুঃসাহসী কাজ বলেই মনে করি। এই দুঃসাহসী কাজের জন্যে সর্বমহল থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে যেখানে প্রশংসা বাক্য উচ্চারিত হবার কথা সেখানে উচ্চারিত হচ্ছে নিন্দাবাক্য। এই নিন্দা বাক্যের সিংহভাগই উচ্চারিত হচ্ছে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে। এইটি আওয়ামী লীগের স্বভাব। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হসিনা '৯৬-এর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধেও নানা অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। বলেছিলেন-'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এমন সদস্য আছেন যারা বিগত আন্দোলনের সাথে ছিলেন না বরং বিএনপিকে টিকিয়ে রাখতে সহযোগিতা করেছেন' (বাংলাবাজার পত্রিকা ৫-৪-৯৬)।

এবার বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে শুধু নিরপেক্ষতার অভিযোগ নয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সম্মানিত সদস্যবৃন্দের যে কেউ কেউ রাজাকার সে কথা জোরেশোরে প্রচার এবং প্রমাণের চেষ্টা করছেন আওয়ামী লীগের নেতা-নেত্রীগণ। দিন কয়েক পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে-জনাকয়েক আওয়ামী ঘরাণার অধ্যাপক এই বিষয়েই আলোচনা করছিলেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সম্মানিত কোনো কোনো সদস্য আওয়ামী লীগ কর্তৃক রাজাকার ঘোষিত হওয়ায় অধ্যাপকবৃন্দ মহা খুশি। আমি গিয়ে যখন তাদের খুশির কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলাম তখন একজন আমার হাতে একটি পত্রিকা ধরিয়ে দিয়ে একটি বিশেষ খবরের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। আমি খবরটি পড়ে দেখলাম। খবরের একস্থানে আওয়ামী লীগের এক নেতার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, উক্ত নেতা বলেছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের পিতা ছিলেন মুসলিম লীগের সদস্য। সুতরাং তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান রাজাকার। খবরটি পড়ে আমি বললাম যে, যদি রাজাকার প্রমাণের এটাই সূত্র হয় তাহলে তো আওয়ামী লীগ রাজাকার। কারণ আওয়ামী লীগ তো পূর্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ ছিল। একথা বলার পর আওয়ামী অধ্যাপকদের চেহারা ফেটে চুপসে যাওয়া বেলুনের মত হলো।

কুৎসা রটানোর ক্ষেত্রে সবাইকে টেক্কা দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. হুমায়ুন আজাদ। তিনি একটি পত্রিকায় সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন 'গত দুটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চেয়ে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিকৃষ্টতম।' এখানেই শেষ নয়, তিনি ৪র্থ তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী করে বলেছেন যে, '৪র্থ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় বসেই ঘুষ খাওয়া শুরু করবে'। প্রকৃত অর্থে তিনি কাউকে

www.pathagar.com

মানুষই মনে করেননি। রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে বলেছেন, আমাদের রাজনীতিবিদরা দুর্বৃত্ত। তারা ছিনতাই করে, তারা কালো টাকা উপার্জন করে। তারা গুণ্ডা, সন্ত্রাসী, মাস্তান, খুনি লালন করে। তারা অসৎ। তারা শয়তান। তারা ইবলিশ।

ধর্মের প্রতি এবং ধর্ম পালনকারীদের প্রতিও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তিনি। তিনি দুই নেত্রীর উদ্দেশে বলেছেন-' তারা হজে যাচ্ছে। ওমরাহ করছে। মাজার জিয়ারত করছে। তারা যতবার আল্লাহর নাম করে ততবার জনগণের নাম উচ্চারণ করে না'। ড. হুমায়ুন আজাদ বেগম খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতে গিয়ে তাদেরকে রাস্তার পাশের কলতলার পানি সংগ্রহকারী কলহপ্রিয় মহিলাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কটাক্ষ করেছেন বিচার বিভাগএবং সম্মানিত বিচারকদের সম্পর্কেও।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ষকদের সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে ড. হুমায়ুন আজাদ বলেছেন, ধর্ষণকারী একজন দাগী অপরাধী। তার বিচার হতে হবে দ্রুত। নারীকে ধর্ষণ করা মানে তার জীবনকে দুঃস্বপ্নে ভরে দেয়া। ধর্ষণ সত্যি মর্মান্তিক ঘটনা। আবার শিক্ষকদের বেলায় বলেছেন-'বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরির শর্ত এমন নয় যে, তিনি বিবাহ বহির্ভূত কিছু করবেন না। একজন শিক্ষকের বান্ধবী থাকতেই পারে।' তার এ বক্তব্যে স্পস্ট যে, একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বান্ধবীর সম্মতিক্রমে (বিবাহের সম্পর্ক না থাকলেও) অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে তাতে দোষের কিছু নেই। সম্ভবত এই মানসিকতার প্রেক্ষিতেই ড. হুমায়ুন আজাদ 'সব কিছু ভেঙ্গে পরে' নামক তার গ্রন্থে বিবাহ বহির্ভূত অবৈধ সম্পর্ককে উৎসাহিত করেছেন। আর এর মধ্যদিয়েই তিনি সুশীল সমাজে পাপাচারকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ড. হুমায়ুন আজাদ কি মনে করেন না যে, তার 'সব কিছু ভেঙ্গে পরে' গ্রন্থের মাধ্যমে যেভাবে অবৈধ সম্পর্কের প্রতি বালক থেকে সর্ব বয়সের পুরুষদেরকে আকৃষ্ট করা হয়েছে তা সবার মাঝে ধর্ষণাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করবার সামিল? যদি জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ষক ছাত্ররা বলে যে, ড. হুমায়ুন আজাদের গ্রন্থ পড়েই অবৈধ (বিবাহবিহির্ভূত) সম্পর্কের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এবং উত্তেজনার বশে বান্ধবী না পাওয়ার কারণেই তারা ধর্ষণের পথ বেছে নিয়েছে। তাহলে ড. হুমায়ুন আজাদ কি উত্তর দেবেন?

ড. হুমায়ুন আজাদ রাজনীতিবিদদের শয়তান বলেছেন। কিন্তু তিনি কি জানেন শয়তানের কাজ কি? আমার জানামতে শয়তানের কাজ হচ্ছে- ১. যার দ্বারা সৃষ্ট, যিনি সর্ববিষয়ে কর্তৃত্বের অধিকারী তাকে এবং তার আদেশ-নির্দেশকে অমান্য করা। ২. অহংকারবশে নিজেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা। ৩. পরশ্রীকাতরতা, ৪. ধ্বংসাত্মক কাজে আত্মনিয়োগ করা এবং অন্যকেও ধ্বংসের পথে টেনে নামানো। ৫. মানুষকে প্রলুব্ধ করে নিজের দলভূক্ত করা এবং এর মধ্যদিয়ে তাদেরকে নরকে নিক্ষেপ করবার সর্বব্যবস্থা নিশ্চিত করা। লক্ষ্যণীয় যে এসকল কর্মের মধ্যে কোনটিই শত্বগুণসম্পন্ন নয়। কিন্তু রাজনীতিবিদদের মুষ্টিমেয় কিছু দুষ্ট, বিপথগামী ও সন্ত্রাসী বাদ দিলে বাদবাকি সবার মধ্যেই সত্ত্বগুণের সন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং রাজনীতিবিদ হলেই শয়তান হবে ড.

www.pathagar.com

হুমায়ুন আজাদের এ যুক্তি যথাযথ নয়। বরং শয়তানের কর্মকাণ্ডের অনেক খোরাক রয়েছে 'সবকিছু ভেঙ্গে পরে' নামক গ্রন্থের অভ্যন্তরে।

বর্তমানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কেও হুমায়ুন আজাদ যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাও সঠিক নয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সদস্যবৃন্দ তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্যে যা করা যুক্তিযুক্ত মনে করবেন তা করবেন। তাদের সেই কর্মকাণ্ড কারও পছন্দ না হলেই যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিকৃষ্ট হবে সেই যুক্তি ধোপে টেকে না। কারণ গৃহীত পদক্ষেপের প্রেক্ষিতে দেশী বিদেশী বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির দারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশংসিত হয়েছে। তা ছাড়া সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ কোন ব্যক্তি বা দলের নীতি আদর্শ কিংবা বক্তব্য বা দাবির সাথে মিলে গেলেই যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সেই ব্যক্তি বা দলের পক্ষে কাজ করছেন বলে মনে করতে হবে তারও কোন সঙ্গত কারণ নেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ কারো চেয়ে কম বুঝেন না। তারা বুঝেন যে, সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্যে আইন-শৃঙ্খলার পূর্ণ বাস্তবায়ন অপরিহার্য। আইন শৃঙ্খলার উন্নতি না হলে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না। নির্বাচন সুষ্ঠু না হলে নির্বাচনের রায় কোন দলই মেনে নেবে না। দেশবাসীও মানবে না। আর সে ক্ষেত্রে ব্যর্থতার সকল দায়দায়িত্ব তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপরেই বর্তাবে। তখন কিন্তু ব্যর্থতার এই দায়ভারের সামান্য অংশ বহন করবার জন্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কট্টর সমালোচনারকারীদের পাওয়া যাবে না। সুতরাং কোন সমালোচনার প্রতি কর্ণপাত করলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চলবে না। নির্বাচন তো দেশের সাধারণ মানুষের জন্যে। সাধারণ ভোটারদের জন্যে। সুতরাং নির্বাচনের পূর্বে সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে সব চেয়ে খুশি হবে দেশের সাধারণ মানুষ। রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী কিংবা সকল সমর্থকদের খুশি করা যাবে না। কারণ দলের সিংহভাগ সদস্যদের মধ্যে নুন্যতম সততা এবং সহনশীলতাও নেই। থাকলে তারাই নির্বাচন করতে পারতেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রয়োজন হতো না। সুতরাং কোন রাজনৈতিক দল, দলের স্তাবক লেখক, বুদ্ধিজীবী কিংবা নেতা-নেত্রীদের চাপের নিকট নতি স্বীকার না করে দেশের জন্যে দেশবাসীর জন্যে ঠাণ্ডা মাথায়, সঠিকভাবে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে। সন্ত্রাসবিহীন, মুক্ত ও শান্ত পরিবেশে নির্বাচন করতে পারলে দেশের সকল শান্তিপ্রিয় মানুষের গভীর, ভালবাসায় স্নাত হবেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ। এর চেয়ে বড় পাওনা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্যে আর কি হতে পারে। যারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্মকাণ্ডে বাধার সৃষ্টি করে, জুজুর ভয় দেখিয়ে এবং রাজাকারের অপবাদ আরোপ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সম্মানিত সদস্যদেরকে মানসিকভাবে দুর্বল করার মধ্য দিয়ে ফায়দা লুটতে চান তারা অনুগ্রহ করে বলবেন কি-একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কতিপয় বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত ব্যক্তিবর্গ হানাদার পাক সেনাদের পক্ষে সাফাই গেয়ে বিবৃতি দেয়া সত্ত্বেও তারা রাজাকার না হয়ে যদি মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি হন তাহলে কোন যুক্তিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সম্মানিত সদস্যদের ওপর রাজাকারের অপবাদ আরোপ করতে চান? ১৫-৯-২০০১।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

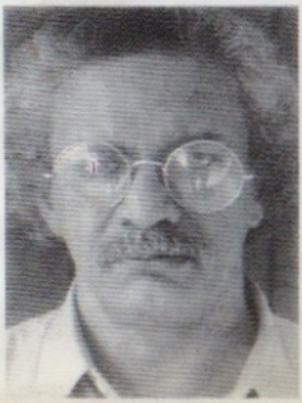

লেখক পরিচিতি

ড. আব্দুস সাত্তার

জন্মঃ ১ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮, সাংঃ চকবড়াই গ্রাম, পোঃ বড়াইগ্রাম, থানাঃ বড়াইগ্রাম, জেলাঃ নাটোর।

পিতা ঃ মরহুম মোঃ নাজির উদ্দিন সরকার,

মাতাঃ আনেছা বেগম।

শিক্ষা ঃ

এস. এস. সি. বড়াইগ্রাম হাইস্কুল; বি. এফ. এ. (ব্যাচেলর অব ফাইল আর্টস) প্রথম স্থান অধিকার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; এম. এফ. এ. (মাস্টার অব ফাইন আর্টস) প্রথম শ্রেণীতে প্রথম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; এম. এফ. এ. (মাস্টার অব ফাইন আর্টস) ডিস্টিংশনসহ, প্রাট ইনস্টিটিউট, নিউইয়র্ক, আমেরিকা (ফুলব্রাইট স্কলারশিপের অধিনে); ইংলিশ লিটারেচার, জর্জটাউন ইউনিভারসিটি, আমেরিকা; পোষ্টগ্রাজুয়েট ষ্টাডি, কলা ভবন, শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত; (ভারত সরকার প্রদত্ত স্কলারশিপের অধিনে); ষ্টোন কার্ভিং ক্যাম্প, চূনার, ভারত, পিএইচ-ডি. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পুরস্কারঃ

পারচেজ এ্যাওয়ার্ড-আমেরিকার পোর্টল্যাণ্ড আর্ট মিউজিয়াম, আন্তর্জাতিক প্রিন্ট প্রদর্শনী (১৯৯৭); ফার্স্ট সেশন প্রাইজ, ১ম মিশরিও আন্তর্জাতিক ত্রি বার্ষিক প্রিন্ট প্রদর্শনীতে পুরস্কার (১৯৯৩); পারচেজ এ্যাওয়ার্ড-আন্তর্জাতিক দ্বিবার্ষিক গ্রাফিক আর্ট প্রদর্শনী, যুগোস্লাভিয়া (১৯৮৯); পারচেজ এ্যাওয়ার্ড-আন্তর্জাতিক দ্বিবার্ষিক গ্রাফিক আর্ট প্রদর্শনী, যুগোস্লাভিয়া (১৯৮৫); পারচেজ এ্যাওয়ার্ড আন্তর্জাতিক দ্বিবার্ষিক গ্রাফিক আর্ট প্রদর্শনী, যুগোস্লাভিয়া (১৯৮১); গ্র্যাণ্ড এ্যাওয়ার্ড (স্বর্ণপদক) - ১ম পাকিস্তান দ্বিবার্ষিক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী (১৯৮১); গ্র্যাণ্ড এ্যাওয়ার্ড (স্বর্ণ পদক) এশিয়ান আর্ট বায়েনালে বাংলাদেশ (১৯৮১); সম্মান পুরস্কার-১১তম জাতীয় প্রদর্শনী ১৯৯৪; সম্মান পুরস্কার-১০ম জাতীয় প্রদর্শনী ১৯৯২; প্রিন্টে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার-জাতীয় নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনী-১৯৮১, ও শিল্পী কর্তৃক পুরস্কার প্রত্যাক্ষাণ; গ্র্যাণ্ড এ্যাওয়ার্ড (স্বর্ন পদক)-বর্ষায় জল রঙ প্রদর্শনী ১৯৮০; শ্রেষ্ঠ পুরস্কার (প্রিন্ট মেকিংয়ে) জাতীয় নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনী ১৯৭৬; চারুকলা ইনস্টিটিউটের বার্ষিক প্রদর্শনীগুলোতে ৩ বার বিভাগীয় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

সংগ্রহঃ

দেশ-বিদেশের যে সকল প্রতিষ্ঠান ড. আব্দুস সাত্তারের শিল্পকর্ম স্থায়ীভাবে প্রদর্শনের জন্য সংগ্রহ করেছে সেগুলো হলো- পোর্টল্যাণ্ড আর্ট মিউজিয়াম, আমেরিকা; মিউজিয়াম অব অবর্ন ইউনিভারসিটি, আমেরিকা; মিউজিয়াম অব কন্টেম্পোরারী আর্ট, যুগোস্লাভিয়া; ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারী, মালয়েশিয়া; দি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর পাবলিক এন্টারপ্রাইজেস ইন ডেভেলপিং কন্ট্রিস, যুগোস্লাভিয়া; মিউজিয়াম অব কন্টেম্পেরারী গ্রাফিক প্রিন্টস, মিশর; দি গ্যালারী অব যুগোস্লাভিয়া পোর্ট্রেইট, তুজলা, যুগোস্লোভিয়া ; ইউক্রেইন ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারী, ইউক্রেইন; মিউজে'ডে আর্ট কন্টেম্পোরেইন, স্কপজে; যুগোস্লাভিয়া ক্যাবিনেট অব গ্রাফিক আর্ট অব যুগোস্লাভ একাডেমী অব আর্ট এণ্ড সাইন্সেস, জাগ্রেব, যুগোস্লাভিয়া; ন্যাশনাল মিউজিয়াম অব বাংলাদেশ, ঢাকা; ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারী, ঢাকা; শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা, রাজশাহী ইউনিভারসিটি, রাজশাহী। এছাড়া দেশে এবং বিদেশে ব্যক্তিগত সংগ্রহ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে আরও বহু শিল্পকর্ম রয়েছে। ড. আব্দুস সাত্তার বর্তমানে চারুকলা ইনস্টিটিউট-এর প্রফেসর ।

প্রকাশিত গ্রন্থঃ

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন (১৯৮৮), শিল্পের উপকরণ ও ব্যবহার পদ্ধতি (১৯৮৯)।